জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের
শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

সপ্তম খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

রায়হান
আবু সাঈদ
রহমত মিয়া
জহিরুল
মামুন

দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা

জুলাই-২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

সম্পদ ও সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ প্রিয় বাংলাদেশ বিগত সাড়ে ১৫ বছরেরও বেশি সময় ফ্যাসিবাদী শাসনের নিপীড়নে জর্জরিত ছিল। দুঃসহ এই পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করে জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান। এ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। আন্দোলন স্তব্ধ করতে নির্বিচারে গুলি চালানোর আদেশ দেন ফ্যাসিস্ট সরকারের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই জেরে শত শত ছাত্র ও নানা পেশার মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১০ হাজারের বেশি মানুষ কোনো না কোনো অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে কোনো সরকারের এভাবে নির্বিচারে হত্যাকান্ড ঘটানোর দৃষ্টান্ত যেমন নজিরবিহীন, তেমনি ফ্যাসিবাদ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা যে সাহসী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এমন কোনো নজির বিশ্বে বিরল। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্র-জনতার এই অবিশ্বাস্য ত্যাগ ও কুরবানিগুলো তথ্য আকারে সংগ্রহে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

এই বাস্তবতায়, জুলাই-আগষ্ট মাসের গণঅভ্যুত্থানে দেশের বিভিন্ন জেলায় শাহাদত বরণকারী ভাই-বোনদের তথ্য নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র উদ্যোগে দশ খন্ডে "দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা" শীর্ষক এই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, প্রয়োজনীয় ডিজাইনসহ সম্পাদনা করেছেন এবং ছাপার কাজ সম্পন্ন করেছেন, তাদের সকলের পরিশ্রম ও সময়দান আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন।

সময়কে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে আমরা কিছুটা তাড়াহুড়ো করেই কাজটি করেছি। তাই মুদ্রণ সংক্রান্ত ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তী সংস্করণে আপনাদের পরামর্শ ও মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযোজিত হবে। এখানে আরো একটি সীমাবদ্ধতাও প্রসঙ্গত স্বীকার করা প্রয়োজন। আমরা যখন পুস্তকাকারে এই বইটি প্রকাশ করছি, তখনও জুলাই বিপ্লবের শহীদের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। যারা আহত ছিলেন তাদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করায় তারা আহতের তালিকা থেকে এখন শহীদের তালিকায় চলে আসছেন। এ তালিকা সামনের দিনে আরো দীর্ঘ হবে বলে আমাদের আশংকা। কেননা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশ কিছু আহতের অবস্থা এখনো আশংকাজনক। তাই আগামীতেও বইটির কলেবর ও তথ্য স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হতে পারে।

দেশকে ফ্যাসিবাদের কালো থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য; দেশের মানুষগুলোকে মুক্ত পরিবেশে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আল্লাহ তাদের দ্রুত সুস্থতা দান করুন। আমিন।

বাংলাদেশ
জামায়াতে ইসলামী

আমীরে জামায়াতের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ বিগত প্রায় দুই দশক ধরে আইনের শাসন, সুশাসন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সাথে প্রতারণা করে একটি সমঝোতার নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসে ২০০৮ সালে। এরপর থেকেই তারা পরিকল্পিতভাবে দেশকে বিরাজনীতিকরণ ও বিরোধীমতশূণ্য করার অপপ্রয়াস শুরু করে।

বিগত ১৫ বছরের আওয়ামী দুঃশাসনে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে অসহনীয় নির্যাতন করে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিচার বহির্ভুত হত্যাকান্ড, রিমান্ডের নামে অত্যাচার, ক্রসফায়ার, বিতর্কিত বিচারের মাধ্যমে বিরোধী নেতাদের হত্যা, গুম, খুন, আয়নাঘর, অপহরণ, বাক স্বাধীনতা হরণ, সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া, বিরোধী দলগুলোর অফিস অবরুদ্ধ করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের কোণঠাসা করা কিংবা আইন সংশোধন করে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে বিচারের মুখোমুখি করার মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি তৈরি করে রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি, আলেম-ওলামাসহ সমাজের শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর চরিত্রহনন, দেশকে একদলীয় কায়দায় শাসন, বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার, দেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস বা দুর্বল করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এই অন্যায্য কর্মকান্ডগুলো বাস্তবায়ন করেছে। এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য সব বিরোধী দল সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় জামায়াতের শীর্ষ ১১ নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে জোরপূর্বক ক্ষমতা ধরে রেখেছে। নিজেদের দুর্নীতি ও অনাচার আড়াল করার জন্য ক্ষমতা ধরে রাখার কোনো বিকল্পও তাদের সামনে ছিল না। আর সে কারণেই জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও তারা কার্পণ্য করেনি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেই বিডিআর বিদ্রোহের নামে দেশপ্রেমিক ৫৭ জন সেনা অফিসারকে হত্যা করেছিল। ট্রাইবুনালে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে রায়কে কেন্দ্র করে জনঅসন্তোষ দমাতে সারা দেশে গুলি করে একই দিনে দুশোরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের ওপর আওয়ামী সরকার গণহত্যা চালিয়েছিল। এর বাইরে পুরো ১৫ বছর জুড়ে নিয়মিতভাবেই দেশজুড়ে তাদের হত্যা, অপহরণ ও ক্রসফায়ার চলমান ছিল।

দেশের মানুষ আওয়ামী অনাচারের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বারবার। কিন্তু আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে জনগণের সেই স্বতঃস্ফুর্ত আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছে। এভাবেই সময়ের চাকার আবর্তনে ২০২৪

সাল আমাদের মাঝে উপনীত হয়। এ বছরের একদম ২০২৪-এর শুরুর দিকে আওয়ামী লীগ বিতর্কিত ডামি নির্বাচন সম্পন্ন করে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসে। তারা ধরেই নিয়েছিল স্বঘোষিত ভিশন অনুযায়ী ২০৪১ সাল পর্যন্ত এভাবেই তারা মসনদে থেকে যাবে।

কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। প্রাথমিক অবস্থায় সরকারি চাকুরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতেই শুরু হয়েছিল এ আন্দোলন। কিন্তু সরকার বরাবরের মতোই দমন পীড়নের মাধ্যমে এই আন্দোলনটিও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। তারা ছাত্রলীগের গুন্ডাদের দিয়ে ক্যাম্পাসগুলো থেকে আন্দোলনকারীদের বিতাড়িত করে। আর পুলিশ, র‍্যাব ও আইন শৃংখলা বাহিনী দিয়ে নির্বিচারে আন্দোলনরত ছাত্রজনতার ওপর গুলি বর্ষণ করে। এতে শতশত মানুষ নিহত হয় আর আহত হয় ২৫ হাজারের বেশি মানুষ। অঙ্গহানি হয় ১০ হাজারের বেশি মানুষের।

এত রক্ত, এত লাশ এই জনপদ কোনো আন্দোলনের ইতিহাসে আর দেখেনি। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে একটি সরকার যেভাবে গুলি করেছে, নির্যাতন করেছে, লাশ পুড়িয়ে আলামত গায়েব করেছে তেমনটা অনেক যুদ্ধাক্রান্ত দেশেও দেখা যায় না। শেখ হাসিনার সরাসরি হুকুমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো দলীয় কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নির্যাতন অব্যাহত রাখে এবং "দেখামাত্র গুলি" নীতি প্রয়োগ করতে থাকে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারদলীয় মিডিয়াগুলো এই অমানবিক কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি আড়াল করে যায়। সরকারের পোষ্য এ মিডিয়াগুলো বরং সরকারি বয়ানের আলোকে কথিত স্থাপনা ধ্বংসের ছবি ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে মায়াকান্না দেখায়। ফলে, এই জুলুম ও জুলুমের ভিকটিমদের দুর্বিষহ নির্যাতনের বিবরণীগুলো মূলধারার অনেক মিডিয়াতেই পাওয়া যায়নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই কেবল এই ফুটেজ ও বর্বরতার দৃশ্যগুলো মানুষ দেখার সুযোগ পেয়েছে। যদিও দফায় দফায় ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের মাধ্যমে সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপরও খড়গ চাপিয়ে দিয়েছিল।

এই বাস্তবতায় জুলাই বিপ্লবের শহীদ ও আহতদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা একটি সংকলন বের করার সিদ্ধান্ত নেই। যেহেতু এসব তথ্য ও ছবি অনেক গণমাধ্যমই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এড়িয়ে গিয়েছে, তাই আমাদেরকে পৃথক টিম ও দল তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রেরণ করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এরপরও সাংগঠনিক দিকনির্দেশনার আলোকে আমাদের নেতাকর্মীরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এবং কষ্ট সহ্য করে ৩৬ জুলাই'র আত্মত্যাগের ঘটনাগুলো পুস্তকবন্দী করার উদ্যোগ নিয়েছে। সমগ্র বিশ্বকে এই আওয়ামী সরকারের শেষ সময়ের এই হত্যাকান্ড ও জুলুম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে অবহিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে মুদ্রণ সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সময় ও সুযোগের অপর্যাপ্ততার কারণে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত করাও সম্ভব হয়নি। আশা করি, এই বইয়ের মধ্য দিয়ে সংকলিত বিষয়গুলো জানার পাশাপাশি শহীদ, আহত-পঙ্গু, নির্যাতিত ও কারারুদ্ধ ভাই-বোনদের এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলেই এগিয়ে আসবেন।

আল্লাহ আমাদের সমস্ত নেক আমল ও দোয়া কবুল করুন। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী ও জনতার কুরবানিকে আল্লাহ কবুল করুন। এত ত্যাগের বিনিময়ে যে দুঃশাসন বিদায় নিয়েছে, তা যেন আবার ভিন্ন কোনো মোড়কে ফিরে না আসে। সকলে একতাবদ্ধ থেকে যেন আমরা দেশ ও জাতিকে সব ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে পারি। এত ত্যাগের বিনিময়ে আসা 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' সফল ও স্বার্থক হোক। আমিন।

ডা. শফিকুর রহমান
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
	৭ম খন্ড (খুলনা বিভাগ)	
৪০৫	শহীদ ফয়সাল হোসেন	৭-৯
৪০৬	শহীদ মো: সাওয়ান্ত মেহতাব (প্রিয়)	১০-১২
৪০৭	শহীদ মো: রুহান ইসলাম	১৩-১৫
৪০৮	শহীদ মো: রাকিবুল হোসেন	১৬-১৯
৪০৯	শহীদ মো: সাব্বির হোসেন	২০-২২
৪১০	শহীদ মো: শাহরিয়া	২৩-২৫
৪১১	শহীদ মো: মাসুদ রানা মুকুল	২৬-২৮
৪১২	শহীদ মো: আশরাফুল ইসলাম	২৯-৩১
৪১৩	শহীদ মো: সুরুজ আলী বাবু	৩২-৩৪
৪১৪	শহীদ আব্দুল্লাহ আল মুস্তাকিন	৩৫-৩৭
৪১৫	শহীদ মো: ইউসুফ শেখ	৩৮-৪০
৪১৬	শহীদ মো: উসামা	৪১-৪৪
৪১৭	শহীদ মো: আলমগীর সেখ	৪৫-৪৭
৪১৮	শহীদ মো: সেলিম মণ্ডল	৪৮-৫০
৪১৯	শহীদ আব্দুস সালাম	৫১-৫৪
৪২০	শহীদ মাহিম হোসেন	৫৫-৫৮
৪২১	শহীদ মো: জামাল উদ্দীন শেখ	৫৯-৬১
৪২২	শহীদ মো: বাবলু ফরাজী	৬২-৬৫
৪২৩	শহীদ মো: ছাব্বির ইসলাম সাকিব	৬৬-৬৮
৪২৪	শহীদ বিপ্লব শেখ	৬৯ -৭১
৪২৫	শহীদ আলিফ আহমেদ সিয়াম	৭২-৭৫
৪২৬	শহীদ শাকিব রায়হান	৭৬-৭৯
৪২৭	শহীদ ইয়াসিন আলী শেখ	৮০-৮২
৪২৮	শহীদ মো: হামিদ শেখ	৮৩-৮৬
৪২৯	শহীদ নবী নুর মোড়ল	৮৭-৯০
৪৩০	শহীদ হাফেজ আনাজ বিল্লাহ	৯১-৯৩
৪৩১	শহীদ আলম সরদার	৯৪-৯৬
৪৩২	শহীদ আবুল বাশার আদম	৯৭-৯৯
৪৩৩	শহীদ মো: আসিফ হাসান	১০০-১০৩
৪৩৪	শহীদ মেহেদী হাসান রাব্বি	১০৪-১০৬
৪৩৫	শহীদ আল আমীন	১০৭-১০৯
৪৩৬	শহীদ মো: মারুফ হোসেন	১১০-১১৩
৪৩৭	শহীদ মো: আহাদ আলী	১১৪-১১৭
৪৩৮	শহীদ সুমন মিয়া	১১৮-১২১
৪৩৯	শহীদ রাজু আহমদ	১২২-১২৪
৪৪০	শহীদ মো: মুত্তাকিন বিল্লাহ	১২৫-১২৮
৪৪১	শহীদ ফরহাদ হোসেন	১২৯-১৩১

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
	(চট্টগ্রাম বিভাগ)	
৪৪২	শহীদ আউয়াল মিয়া	১৩২-১৩৪
৪৪৩	শহীদ ইমাম হাসান তায়িম ভূঁইয়া	১৩৫-১৩৭
৪৪৪	শহীদ আল মামুন আমানত	১৩৮-১৪০
৪৪৫	শহীদ মো: ফারুক	১৪১-১৪৩
৪৪৬	শহীদ মো: পারভেজ	১৪৪-১৪৬
৪৪৭	শহীদ মো: বাবু	১৪৭-১৪৯
৪৪৮	শহীদ মো: জিহাদ হাসান	১৫০-১৫৩
৪৪৯	শহীদ রিফাত হোসেন	১৫৪-১৫৬
৪৫০	শহীদ মো: সাগর	১৫৭-১৬০
৪৫১	শহীদ মো: হোসাইন	১৬১-১৬৩
৪৫২	শহীদ মহিন উদ্দীন	১৬৪-১৭১
৪৫৩	শহীদ মো: জাহিদ হোসেন রাব্বি	১৭২-১৭৫
৪৫৪	শহীদ মো: আব্দুর রাজ্জাক রুবেল	১৭৬-১৭৯
৪৫৫	শহীদ রবিন মিয়া	১৮০-১৮৩
৪৫৬	শহীদ মো: ফয়সাল সরকার	১৮৪-১৮৬
৪৫৭	শহীদ হামিদুর রহমান	১৮৭-১৯০
৪৫৮	শহীদ আল আমিন	১৯১-১৯৩
৪৫৯	শহীদ জামসেদুর রহমান	১৯৪-১৯৭
৪৬০	শহীদ হাফেজ মো: মাসুদুর রহমান	১৯৮-২০০
৪৬১	শহীদ সৈয়দ মুনতাসির রহমান আলিফ	২০১-২০৪
৪৬২	শহীদ মাসুম মিয়া	২০৫-২০৭
৪৬৩	শহীদ কাওসার মাহমুদ	২০৮-২১০
৪৬৪	শহীদ মো: ইউসুফ	২১১-২১৩
৪৬৫	শহীদ মো: জহিরুল ইসলাম	২১৪-২১৬
৪৬৬	শহীদ সোহাগ মিয়া	২১৭-২২০
৪৬৭	শহীদ হাসান হোসেন	২২১-২২৪
৪৬৮	শহীদ আজাদ সরকার	২২৫-২২৮
৪৬৯	শহীদ মো: ইমন গাজী	২২৯-২৩২
৪৭০	শহীদ আব্দুল কাদির	২৩৩-২৩৬
৪৭১	শহীদ মো: আবুল হোসেন মিজি	২৩৭-২৩৯
৪৭২	শহীদ নিশান খান	২৪০-২৪২
৪৭৩	শহীদ মো: সাজ্জাদ হোসাইন সাব্বির	২৪৩-২৪৫
৪৭৪	শহীদ আব্দুর রহমান গাজী	২৪৬-২৪৯
৪৭৫	শহীদ সিয়াম সরদার (জিহাদ)	২৫০-২৫২
৪৭৬	শহীদ রোহান আহমেদ খান	২৫৩-২৫৬

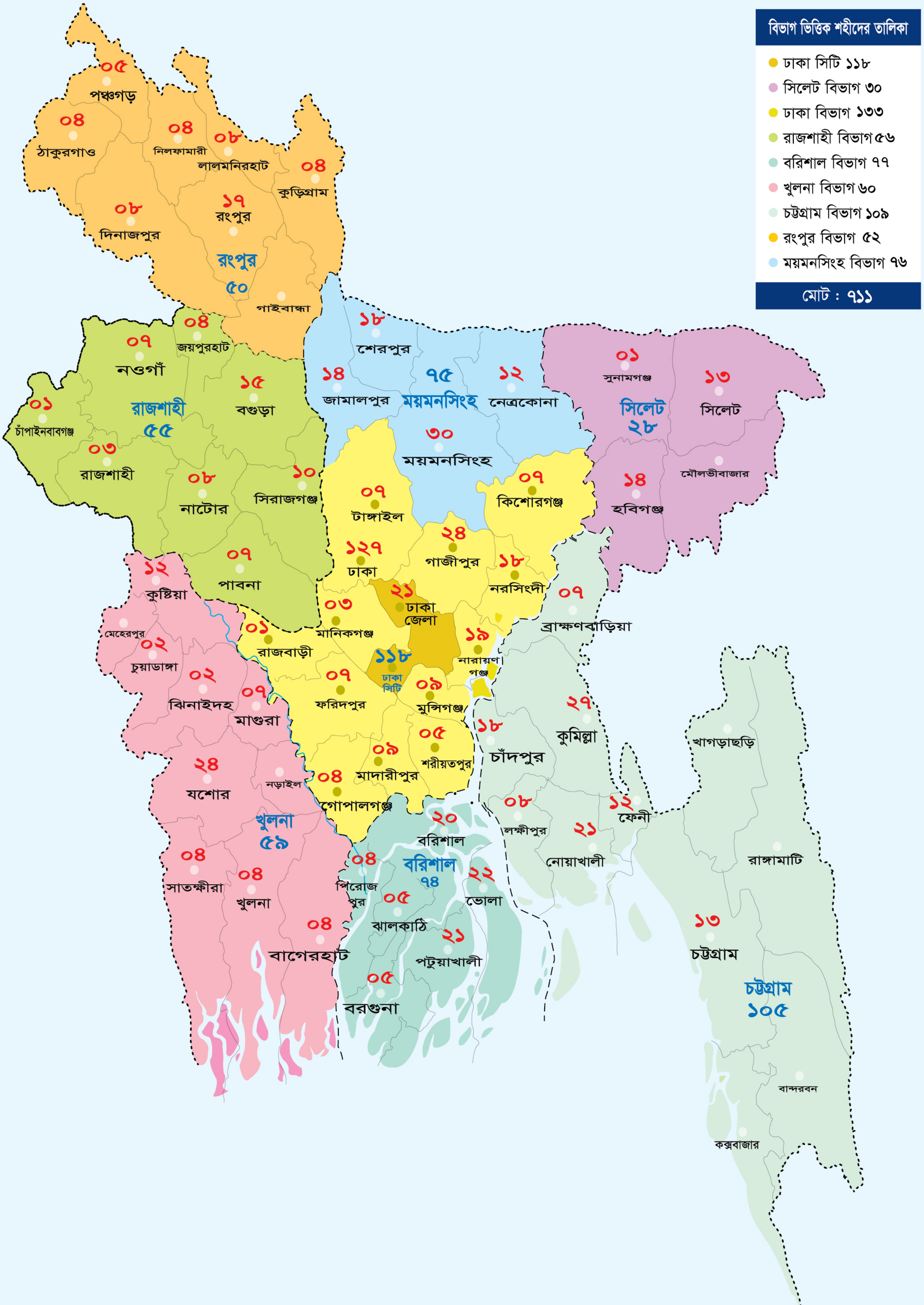
বিভাগ ভিত্তিক শহীদের তালিকা
ঢাকা সিটি ১১৮
সিলেট বিভাগ ৩০
ঢাকা বিভাগ ১৩৩
রাজশাহী বিভাগ ৫৬
বরিশাল বিভাগ ৭৭
খুলনা বিভাগ ৬০
চট্টগ্রাম বিভাগ ১০৯
রংপুর বিভাগ ৫২
ময়মনসিংহ বিভাগ ৭৬
মোট : ৭১১
০৫
পঞ্চগড়
০৪
ঠাকুরগাও
০৪
নিলফামারী
০৮
লালমনিরহাট
০৪
কুড়িগ্রাম
১৭
রংপুর
০৮
দিনাজপুর
রংপুর
৫০
গাইবান্ধা
০৪
জয়পুরহাট
০৭
নওগাঁ
১৫
বগুড়া
০১
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
রাজশাহী
৫৫
০৩
রাজশাহী
০৮
নাটোর
১০
সিরাজগঞ্জ
০৭
পাবনা
১৮
শেরপুর
১৪
জামালপুর
৭৫
ময়মনসিংহ
১২
নেত্রকোনা
৩০
ময়মনসিংহ
০১
সুনামগঞ্জ
১৩
সিলেট
সিলেট
২৮
১৪
হবিগঞ্জ
মৌলভীবাজার
০৭
টাঙ্গাইল
০৭
কিশোরগঞ্জ
২৪
গাজীপুর
১২৭
ঢাকা
১৮
নরসিংদী
২১
ঢাকা জেলা
০৩
মানিকগঞ্জ
০১
রাজবাড়ী
১৯
নারায়ণগঞ্জ
১১৮
ঢাকা সিটি
০৭
ফরিদপুর
০৯
মুন্সিগঞ্জ
০৫
শরীয়তপুর
০৯
মাদারীপুর
০৪
গোপালগঞ্জ
১২
কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
০২
চুয়াডাঙ্গা
০২
ঝিনাইদহ
০৭
মাগুরা
২৪
যশোর
নড়াইল
খুলনা
৫৯
০৪
সাতক্ষীরা
০৪
খুলনা
০৪
বাগেরহাট
২০
বরিশাল
০৪
পিরোজপুর
বরিশাল
৭৪
২২
ভোলা
০৫
ঝালকাঠি
২১
পটুয়াখালী
০৫
বরগুনা
০৭
ব্রাক্ষণবাড়িয়া
২৭
কুমিল্লা
১৮
চাঁদপুর
০৮
লক্ষীপুর
২১
নোয়াখালী
১২
ফেনী
খাগড়াছড়ি
রাঙ্গামাটি
১৩
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম
১০৫
বান্দরবন
কক্সবাজার

শহীদ ফয়সাল হোসেন

ক্রমিক: ৪০৫

আইডি: খুলনা বিভাগ ২১

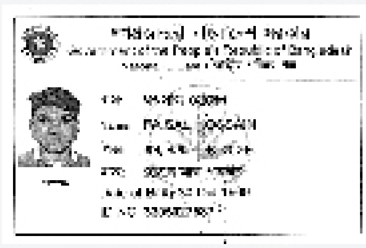

শহীদের পরিচয়

৩৬ জুলাই, নামটা প্রতীকী। বাংলার মানুষদের দীর্ঘশ্বাস থেকে মুক্তির দিন। স্বৈরাচারের পতনের দিন। স্বৈরাচারের পতনের এই খবর আনন্দের হওয়ার কথা ছিল। এই আনন্দঘন পরিবেশেও অনেকে তার জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন মুক্তির জন্য। মুক্তিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য। এমনি একজন বীর সাহসী হলেন ফয়সাল হোসেন।

শহীদ ফয়সাল হোসেন, ৩০ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে যশোর জেলার পুরাতন কসবা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম এম এম কবির হোসেন। এই শহীদের জন্মদাত্রী হলেন, হোসেন আরা পারভীন।

শহীদ ফয়সাল হোসেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এলএমএম ডিপার্টমেন্টে মাস্টার্সে শেষবর্ষে অধ্যয়নরত ছিলেন। তাঁর বাবার ঠিকাদারির ব্যবসা রয়েছে। সেটাই পরিবারের আয়ের উৎস। তাঁর বাকি দুইভাই এর একজন বিমানবাহিনীতে চাকুরী করেন, আরেকজন সপরিবারে যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন।

ঘটনার সামগ্রিক বিবরণ

শহীদ ফয়সাল হোসেন জুলাই এর শুরু থেকেই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন নিয়ম করে সকালের দিকে বের হয়ে যেতেন। ১ আগস্ট তিনি দুপুর ১২ টার দিকে বের হয়ে গিয়ে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে। আগস্টের ৩ তারিখের উত্তপ্ত সংগ্রামের মাঝেও বেলা ১১ টার দিকে আন্দোলনে বের হন ফয়সাল হোসেন। ৪ তারিখে নিউমার্কেট এলাকায় আরও কিছু বন্ধু সহ ৯ জন একত্রিত হন এবং সেদিন বাসায় ফেরার পর তাঁর মা তাঁকে আন্দোলনে অংশ নিতে বারণ করলে তিনি তাঁর মোবাইল ফোনে আন্দোলনে নিহত ও আহতদের ছবি দেখিয়ে মা'কে বুঝানোর চেষ্টা করেন। ৫ তারিখে তিনি বাসায় বসে টিভি দেখছিলেন। ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর তিনি বন্ধুদের সাথে বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। ঐ সময় যশোরের জাবির হোটেলে দুর্বৃত্তদের দেয়া অগ্নিসংযোগের কথা শুনে তিনি সেখানে বন্ধুদের সাথে উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করেন। বিকাল আনুমানিক ৩.৪৫ টায় ফয়সাল হোসেন আগুনের ঘেরাওয়ের মধ্যে পতিত হন। এর মধ্যে তিনি তাঁর বাবাকে কল দিয়ে বলেন, "বাবা আমি জাবের হোটেলে আটকা পড়েছি আমাকে বাঁচাও।" ফয়সালের বাবা অনতিবিলম্বে বিমান বাহিনীতে কর্মরত ছোট ছেলেকে একটি হেলিকপ্টার পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বলেন এবং নিজে জাবের হোটেলের সামনে গিয়ে উদ্ধার করার চেষ্টা করে। এমন সময় একটি হেলিকপ্টার আসলে তিনি আশা করেন যে এবার হয়তো ছেলেকে বাচানো সম্ভব হবে। কিন্তু হেলিকপ্টারটি দুই-তিন চক্কর দিয়ে জাবের হোটেলের উপর থেকে শুধু একজন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চলে যায়। উদ্ধারের চেষ্টাকালে ফয়সালের বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে ছাত্ররা তাঁকে সেবা করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। আগুনের মধ্য হতে বেরুতে পারেননি ফয়সাল। শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।

> পরবর্তীতে শহীদ ফয়সালের মরদেহ যশোর সদর হাসপাতালের মর্গ থেকে শনাক্ত করা হয় এবং বাসায় নিয়ে আসা হয়।

জুলাইয়ের এ বৈষম্যেবিরোধী ও পরবর্তীতে স্বৈরাচার হটানোর এ আন্দোলন সফল হয়েছে সকল পেশার মানুষদের অংশগ্রহণে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, বিজয়ের পরেও শহীদ ফয়সালের মতো যুবকেরা দেশরক্ষার কাজে, মানুষকে বাঁচানোর কাজে এতো নিমগ্ন ছিলেন যে, নিজের জীবনের নিরাপত্তার কথাই ভুলে গিয়েছিলেন। তাদের এই জীবনের আত্মত্যাগ জুলাই বিপ্লবে এনে দিয়েছে নতুনত্ব পাশাপাশি প্রেরণা যোগাচ্ছে ঐক্যবদ্ধভাবে হাতে হাত রেখে, দেশকে পুনর্গঠন করার।

ব্যক্তি ফয়সালের কৃতিত্ব

ফয়সাল হোসেন কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনি কোরিয়ান ভাষা শিখে স্কলারশিপের জন্য অপেক্ষমাণ ছিলেন। আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সাহসিকতার কারণে তিনি ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন। ফয়সালের বাবা এম এম কবির হোসেন ঠিকাদারী ব্যবসা করেন। ফয়সাল বার কাউন্সিলের পরীক্ষা প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং পরিবার তাঁকে নিয়ে গর্বিত ছিল।

পরিবারের অভিব্যক্তি

ছেলের স্মৃতি সামনে যখনই আসছে, তখনই কান্নায় ভেঙে পড়ছেন কবির হোসেন, শহীদ ফয়সালের গর্বিত বাবা। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, "আমার ছেলে অনেক ভালো ছিল। সে তার বোন নেই বলে সবসময় মায়ের কাজে সহায়তা করতো এবং মানুষের উপকারে সবসময় দৌড়ে যেতো। আমার সাথে বন্ধুর মতো সবকিছু শেয়ার করতো। তার সাহসিকতা এবং মানবিকতা আমাদের পরিবারে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

শহীদের স্মরণে করণীয়

আমাদের উচিৎ শহীদ ফয়সালদের ভুলে না যাওয়া, শোকার্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানো এবং শহীদ পরিবারকে আশ্বাস দেওয়া। শহীদের পিতা হারিয়েছেন এক ছেলে। কিন্তু ফেরত পেয়েছেন যুদ্ধজয়ী শতশত ছেলে। এই সকল গাজীরা পাশে থাকুক শোকসন্তপ্ত শহীদ পরিবারের। শহীদ ফয়সালরা আমাদের সম্পদ। তাঁদের শাহাদাতের আমানত আমাদেরকে ধারণ করতে হবে। যে স্বপ্ন নিয়ে তাঁরা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা আমাদের দায়িত্ব। তবেই আমাদের দেশ সত্যিকারের সোনার বাংলা হয়ে উঠবে।

একনজরে শহীদের পরিচিতি

শহীদের পূর্ণনাম	: ফয়সাল হোসেন
জন্ম তারিখ	: ৩০ অক্টোবর, ১৯৯৯
পেশা	: ছাত্র, এলএলএম (মাস্টার্স) শেষ বর্ষ, কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পুরাতন কসবা, ইউনিয়ন: রায়পাড়া, ঢাকা রোড, থানা: যশোর সদর, জেলা: যশোর
পিতার নাম	: এম এম কবির হোসেন
পিতার পেশা ও বয়স	: ঠিকাদারি ব্যবসায়, ৬৮
মাসিক আয়	: ১৫ ,০০০/-(প্রায়)
মায়ের নাম	: হোসনে আরা পারভিন
মায়ের পেশা ও বয়স	: গৃহিনী, ৫৩
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৫ (পাঁচ)
	: ভাই-১: এম এম ফাহাদ হোসেন (৩০), যুক্তরাজ্য প্রবাসী
	: ভাই-২: ফাহাদ হোসেন (২৩), বিমান বাহিনীতে চাকরিরত
ঘটনার স্থান	: জাবের হোটেল, যশোর
মৃত্যুর কারণ	: জাবের হোটেলে আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করেন
আহত ও নিহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট বিকেল ৪:০০ (প্রায়), জাবির হোটেল, যশোর

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য এককালীন ভাতার ব্যবস্থা করা।

শহীদ সাওয়ান্ত মেহতাব

ক্রমিক: ৪০৬
আইডি: খুলনা বিভাগ ০২২

শহীদের পরিচয়

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট, ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান এবং আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান বিশ্বে একটি বিরল উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই বিশাল গণজাগরণের প্রেক্ষাপটে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের স্বেচ্ছাচার এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের দীর্ঘদিনের অসন্তোষ এক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এই অভ্যুত্থানে স্কুল কলেজের ছাত্ররাও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল, যার মধ্যে শহীদ মো: সাওয়ান্ত মেহতাব প্রিয় অন্যতম।

প্রিয় যশোর সদরের মুজিব সড়কের বাসিন্দা ২০০৬ সালের ৫ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। সরকারি সিটি কলেজ, যশোরের বিজ্ঞান বিভাগের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পাওয়া এবং মানবিক কাজে অসংখ্য মানুষের সহায়তা করার জন্য তিনি সবার পরিচিত ছিলেন। প্রিয়'র বাবার নাম মোঃ শাকিল ওয়াহিদ। তিনি একজন হোমিও চিকিৎসক; যশোরের রেলগেট এলাকায় একটি হোমিওপ্যাথি ক্লিনিক পরিচালনা করেন। তার মা রেহেনা পারভিন গৃহিণী। পরিবার মোটামুটি স্বচ্ছল এবং প্রিয় সব সময় মানুষের সাহায্যার্থে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন।

শাহাদাতের ঘটনার বিবরণ

জুলাই মাস। স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের জুলুম-বৈষম্য চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। সর্বক্ষেত্রে আওয়ামী সিন্ডিকেট এতটাই প্রকট যে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। দুর্নীতি এতটাই চরমে পৌঁছে গেছে যে, একটা চাকুরীর হাহাকার যুবকের মৃত্যু যন্ত্রনার মতো। কোটা নামক বৈষম্য তরুণ-যুবার জন্য যেন ফ্যাসিবাদের মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

কোটার যৌক্তিক সংস্কার চেয়ে ছাত্রদের আন্দোলনে খুনি হাসিনা আওয়ামী ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দেয়। নারী শিক্ষার্থীদের গায়ে সহিংস আক্রমণ করে রক্তাক্ত করে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে। আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। বেপোরোয়া হয়ে উঠে আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী। দেশীয় ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ছাত্রদের খুন করতে নেমে পড়ে স্বৈরাচারী সরকার। পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহীনী এক হয়ে নির্মম দমন পীড়নের মাঝেও আন্দোলন আরো তীব্রতর হয়।

আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলাদেশে। তারই ধারাবাহিকতায় যশোর শহরজুড়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে সাধারণ জনতা রাজপথে নেমে পড়ে। খুনি ফ্যাসিস্ট হাসিনার ক্ষমা চেয়ে পদত্যাগের দাবিতে হাজার হাজার মানুষ রাজ পথে নেমে পড়ে। ৫ তারিখে স্বৈরাচারের পতনের পর বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেন শহীদ প্রিয়। জুলাই মাসজুড়ে সংঘটিত ছাত্র আন্দোলনে প্রিয় শুরু থেকেই সম্পৃক্ত ছিলেন। বাবার কাছ থেকে ৪০ টাকা নিয়ে তিনি বাসা থেকে বের হন। ৭ টায় ফিরে আসার কথা বলে।

প্রিয় তাঁর বিন্ধুদের সাথে বিজয় মিছিলে যোগ দেন এবং যশোর শহরে জাবির হোটেলে দুর্বৃত্তদের অগ্নিসংযোগের খবর পেয়ে বন্ধুদের নিয়ে প্রিয় সেখানে চলে যান।

জাবির হোটেলের সামনে এসে তিনি একটি বাচ্চাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে হোটেলের ভিতরে যেতে চান। ঘটনাস্থলে উপস্থিত তার জনৈক বন্ধু বলে, 'তুই ভিতরে যাইস না, ভিতরে অনেক ধোঁয়া।' তিনি বন্ধুর কথা না শুনে ভিতরে চলে যান এবং এক পর্যায়ে সেখানে আটকা পড়েন। এদিকে বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরও বাসায় না ফিরায় বাবা মা উদ্বিগ্ন হয়ে তাকে কল দেন কিন্তু ফোন বন্ধ পান। প্রিয় সব সময় প্রথম বা দ্বিতীয় রিং বাজতেই বাবা মায়ের ফোন রিসিভ করেন, কিন্তু এবারে রিসিভ না করায় তাঁরা আরও বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। প্রিয়র বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করেও তাঁরা প্রিয়'র কোনো খোঁজ না পেয়ে পরবর্তীতে বন্ধুদের সহায়তায় যশোর সদর হাসপাতালে প্রিয়র মরদেহ খুঁজে পান প্রিয়র বাবা মা। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি অসম্ভব ভালবাসা ছিল তাঁর এই আন্দোলন এবং জীবন উৎসর্গ করার প্রেরণা। মৃত্যুর মাত্র ১২ দিন আগে, প্রিয় তার বাবা-মাকে বলেছিল, "বাবা, আমি যদি শহীদ হয়ে যাই, আমাকে দাদার কবরের পাশে কবর দিও।" তার সে কথা অনুযায়ী প্রিয়কে স্থানীয় কারবালা কবরস্থানে তার দাদার কবরের পাশেই দাফন করা হয়েছে।

স্বজনদের অনুভূতি/অভিব্যক্তি

শহীদ প্রিয়র বাবা জনাব শাকিল ওয়াহিদ বলেন, "প্রিয় ছোটবেলা থেকে মানব হিতৈষী কাজে যুক্ত ছিল। মানুষকে রক্তদান করতো এবং অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছিল তার নিয়মিত কাজ। সে প্রায়ই আমার চেম্বারে রোগী নিয়ে আসতো। আমাকে বলতো ফ্রি চিকিৎসা করে দিতে। বিপদে আপদে সবসময় মানুষের সেবা করতো। মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে গরীবদের দান করতো। সে সবসময় মাকে বলতো, দেখো আমি এমন কিছু করে যাবো আমার নামে সড়ক হবে, ভবন হবে। আমাদের প্রিয় নিয়মিত নামাজ পড়তো। মুগ্ধ এবং আবু সাইদের কথা বলে সে কান্না করতো। বলতো, দেখো এত সুন্দর ভাইয়াটা শহীদ হয়ে গেছে। এত দুরন্ত ছেলেটা আমার খুব ভুলোমন ছিল। সে তার জুতার ফিতাটাও বাধতে পারতোনা। তার জুতার ফিতা বেঁধে দিতো আমার ছোট ছেলে। একদিন আমি প্রিয়কে জিজ্ঞাসা করলাম আন্দোলনে তার পোস্ট কি, সে বলে আমার পোস্ট লাগে না আমি বরং পোস্ট দিই।"

প্রিয় তার বাবা-মাকে বলতো-তোমাদের আরও ২ সন্তান আছে। ৭১ সালে তোমাদের মতো বাবা মা থাকলে দেশ আর স্বাধীন হতোনা। তার পছন্দের খাবার ছিল ডিম আর সাদাভাত। বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করতো এবং আলহামদুলিল্লাহ বলে শেষ করতো।

তার পছন্দের খাবার ছিল ডিম আর সাদাভাত।"

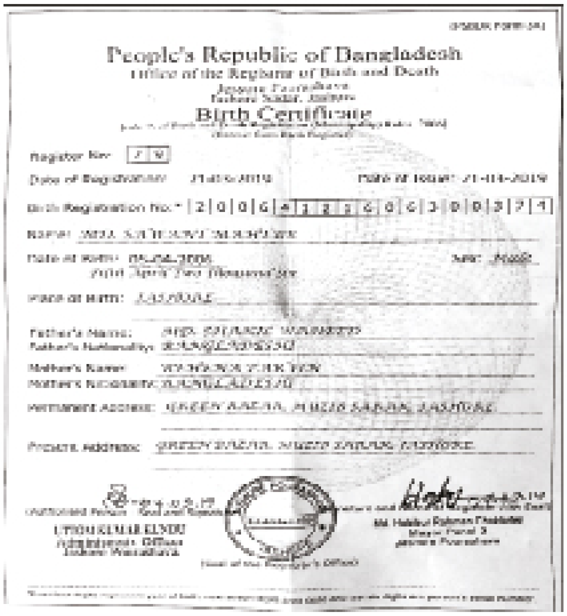

People's Republic of Bangladesh

Birth Certificate

Register No: 7 9

Date of Registration: 21-05-2019

Date of Issue: 21-05-2019

Birth Registration No.: 2006...

Date of Birth: 05-04-2006

Sex: Male

Place of Birth: JASHORE

Father's Nationality: BANGLADESHI

Mother's Nationality: BANGLADESHI

Permanent Address: GREEN BAZAR, MUJIB SARAK, JASHORE

Present Address: GREEN BAZAR, MUJIB SARAK, JASHORE

UTTAM KUMAR KUNDU

Administrative Officer

Jashore Pourashava

Seal of the Registrar's Office

একনজরে শহীদের পরিচয়

পূর্ণ নাম	: মো: সাওয়ান্ত মেহতাব
জন্ম তারিখ	: ০৫/০৪/২০০৬
পেশাগত পরিচয় ও প্রতিষ্ঠান	: ছাত্র, এইচএসসি পরীক্ষার্থী, সরকারি সিটি কলেজ, যশোর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: সাতমাইল, ইউনিয়ন: বাগয়াচড়া, থানা: শার্শা, জেলা: যশোর
সর্বশেষ ঠিকানা	: বাসা: গ্রীন বাজার, এলাকা: মুজিব সড়ক, থানা: যশোর সদর, জেলা: যশোর
পিতার নাম	: মো: শাকিল ওয়াহিদ
পিতার পেশা ও বয়স	: হোমিও চিকিৎসক, ৪০
মাসিক আয়	: ৩৫,০০০/- (প্রায়)
মাতার নাম	: রেহেনা পারভিন
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৩৭
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৫ (পাঁচ)
	ভাই-১: আসওয়াদ মনির (১৩), যশোর জিলা স্কুলে ক্লাস ৭ পড়ুয়া
	ভাই-২: দাইয়ান মাহদীন (১১), নব কিশলয় স্কুলে ক্লাস ৬ পড়ুয়া
ঘটনার স্থান	: জাবির হোটেল, চিত্রার মোড়, যশোর সিটি, যশোর
মৃত্যুর কারণ	: জাবির হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে শিশুকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিহত
আহত ও নিহত হওয়ার সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, জাবির হোটেল
শহীদের কবরস্থান	: কারবালা কবরস্থান, যশোর

(গুগল লোকেশন http://maps.app.goo.gl/17EXaA94NGi5qbFB9)

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য এককালীন ভাতার ব্যবস্থা করা।

শহীদ মোঃ রুহান ইসলাম

ক্রমিক: ৪০৭

আইডি: খুলনা বিভাগ ০২৩

শহীদের পরিচয়

২৪ এর বিপ্লব কোনো নির্দিষ্ট পেশার মানুষের আন্দোলন ছিল না। দল মত, জাতি, পেশা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ এতে শরিক হয়েছিল। শহীদ রুহান ইসলাম অল্প বয়সে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত এক যুবকের জীবনালেখ্য।

আমাদের আলোচ্য শহীদ হলেন খেটে খাওয়া শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষের মধ্য হতে শহীদের এক প্রোজ্জ্বল উপাখ্যান।

শহীদ মোঃ রুহান ইসলাম ২০০৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর যশোর জেলার সদর পৌরসভার ব্রাহ্মনপাড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই একজন কৌতূহলী এবং দায়িত্বশীল ছেলে হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার বাবা মোঃ মোখসেদুর রহমান এবং মা রিনা খাতুনের সংসারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আদরের। ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত রুহান ঢাকার গোপীবাগে অবস্থিত নুরানী মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষাতেও দক্ষতা অর্জন করেন।

মাদরাসা জীবন শেষ করার পর, রুহান যশোরে ফিরে আসেন এবং জাগরনী চক্র ফাউন্ডেশনের Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রোগ্রামে রেফ্রিজারেশন এবং এয়ার-কন্ডিশনিং (RAC) কোর্সে ভর্তি হন। সেখানে তিনি প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি সফল কর্মজীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। হাতে কলমে কাজ শিখে নিজে একটি এসি রিপেয়ারিং দোকান খোলার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল নিজস্ব ব্যবসার মাধ্যমে পরিবারকে আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রদান করা এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানো।

রুহানের পরিবার একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। তার বাবা মোখসেদুর রহমান একটি ছোট মুদি দোকান পরিচালনা করেন, যা তাদের পরিবারের মূল আয়ের উৎস। তবে বাবার কিডনি, লিভার এবং হার্টের জটিল রোগের কারণে পরিবারটি চরম আর্থিক সংকটে ছিল। তার বড় ভাই রাতুল মিজি উপশহর ডিগ্রি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এবং তিনিও পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব ভাগ করে নিচ্ছিলেন। তবুও, পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য রুহান ছিল আশার আলো।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

ইতিহাসের সকল ন্যারেটিভ ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে জুলাইর বিপ্লব। ফিনিক্স পাখির মতো বাঁধভেঙ্গা পিচ্ছিলপথে নেমে এসেছিল ছাত্রজনতা। এই বিপ্লবে যেমন উঁচুশ্রেণী, মধ্যশ্রেণী, ছাত্রদের সরাসরি অংশগ্রহণ ছিল, ঠিক তেমনি বিরাট একটা অংশ নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের আত্মত্যাগ ছিল। উঁচুশ্রেণী কিংবা শহুরে মধ্যশ্রেণীর সংগ্রামের কথা আলোচনা হলেও বিপ্লব থেকে আড়ালে পড়ে গেছে নিম্ন-মধ্যবিত্তের অকুতোভয় সংগ্রামের কথা। এ সংগ্রাম ছিল রিক্সাওয়ালা, মুদি দোকানদার সহ সকল পেশাজীবী মানুষের সংগ্রাম। এমন মানুষও এই আন্দোলনে শরীক হয়েছেন, যাদের পরিবার চালাতে নুন আনতে পান্তা ফুরায়। কারণ একটাই, দীর্ঘ সাড়ে-পনেরো বছরের ফ্যাসিবাদের জুলুম অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল । আর তাই ছাত্রজনতার এক দফার দাবিতে পুরো দেশ উত্তাল হয়ে উঠে। এ লড়াই বয়সও মানে নি। এখানে যেমন পনেরো বছরের যুবক ছিল , তেমনি ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ ও ছিল। বিপ্লবের এ বারুদ হৃদয়ে জেগে উঠেছিল যে একটি ছোট মুদির দোকান চালায়, আঠারো বছরের এক যুবক। নাম তার রোহান ইসলাম। বাবা লিভার সমস্যায় আক্রান্ত পুরো সংসারের দেখভাল ছিল শহীদ রোহানের উপর অর্পিত। এতো সমস্যায় জর্জরিত থাকার পড়েও দেশ রক্ষার্থে, মুক্তি ও বিপ্লবের প্রয়োজনে রাজপথে নেমে আসেন শহীদ রোহান ইসলাম।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার কোটা সংস্কার আন্দোলনের শুরু থেকেই শহীদ রোহান সক্রিয় ছিলেন। ৫ আগস্ট ছাত্র জনতা যশোরের রাজপথ দখলে নিয়ে স্বৈরাচার পতনের এক দফা দাবিতে শ্লোগানে মুখর হয়ে হয়ে উঠে। দুপুর ২ টায় কিছু দুর্বৃত্ত ছাত্র জনতার উপর হামলাকারী যশোরের ত্রাস আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য শাহীন চাকলাদারের প্রিন্টিং প্রেস ও জাবির হোটেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা হোটেলে আটকে পড়া লোকদের উদ্ধারের জন্য হোটেলের ভিতর ঢুকে পড়েন।

শহীদ রোহান তার বন্ধুদের সাথে চিত্রার মোড়ে জাবির হোটেলে উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করেন। রাত ৮টার দিকে রুহানের পরিবারের কাছে একটি ফোন আসে, যেখানে ফায়ার সার্ভিসের পরিচয় দিয়ে বলা হয়, "আপনার ভাইকে জাবির হোটেলের ৮ম তলা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।" রুহানের পরিবার দ্রুত হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারে, তাদের প্রিয় সন্তানকে তারা চিরতরে হারিয়েছে। তার নিথর দেহটি যখন পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তখন পুরো পরিবার শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়। রুহানকে স্থানীয় কারবালা গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের অভিব্যক্তি

রুহানের স্মৃতিকাতরতায় শহীদ রুহার সহায়তা করা।"

তিনি আরও বলেন, "রোহান ২০১৭ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ঢাকার গোপীবাগ জামে মসজিদ সংলগ্ন নুরানী মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। পরবর্তীতে বাড়িতে এসে সংস্থা এর একটি রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেনিং (জাগরণী চক্র) কোর্সে ভর্তি হয়ে কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি লালদিঘীয়া পাড় এলাকায় এসির দোকানে হাতে কলমে কাজ শিখেন এবং নিজে একটি এসি রিপেয়ারিং দোকান খোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর ভবিষ্যতে ব্যবসায়ী হওয়ার ইচ্ছে ছিল ।

শহীদের স্মৃতি ও আমাদের করণীয়

ছোট জীবন, অনেক স্বপ্ন। সে স্বপ্ন কুরবান করেছিলেন দেশের জন্য, নিজ জাতির জন্য।শহীদ রুহান যে বারুদ জ্বালিয়ে গেলেন বৈষম্যবিরোধী ও স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে, সে স্পিরিট আমদের ধরে রাখত হবে। শহীদ রুহানদের মতো সংগ্রামী বীরদের ত্যাগকে বাদ দিয়ে কোনোভাবেই এ বিপ্লবের ইতিহাস রচিত হতে পারে না। আমাদের উচিৎ শহীদ রুহানের মতো শহীদদের ত্যাগ ও তাঁদের জীবনদানকে জুলাই বিপ্লবের ইতিহাসে প্রতিটি পাতায় যথাযথ ভাবে তুলে ধরা। শহীদ রুহানের পরিবারের পাশে দাড়ানো আমাদের দায়িত্ব।

একনজরে শহীদের পরিচয়

পূর্ণনাম	: রুহান ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ২৯/১২/২০০৬
পেশাগত পরিচয়	: শিক্ষানবিশ, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন (RAISE) প্রোগ্রাম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ব্রাহ্মণপাড়া রোড, ইউনিয়ন: পৌরসভা, থানা: সদর, জেলা: যশোর
সর্বশেষ ঠিকানা	: ঐ
পিতার নাম	: মো: মোখসেদুর রহমান
পিতার পেশা ও বয়স	: মুদির ব্যবসায়, ৪৮ বছর
মাসিক আয়	: ১০,০০০/- প্রায়
মাতার নাম	: রিনা খাতুন
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৩৩ বছর
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৬ (ছয়জন)
বড় ভাইয়ের নাম	: রাতুল মিজি
বড় ভাইয়ের পেশা	: শিক্ষার্থী, ডিগ্রী ২য় বর্ষ, উপশহর ডিগ্রি কলেজ, যশোর
ঘটনার স্থান	: জাবের হোটেল, চিত্রার মোড়, যশোর
মৃত্যুর কারণ	: জাবের হোটেলে আক্রান্তদের উদ্ধারকালে পুড়ে মারা যান
আহত ও মৃত্যুর সময়	: ৫ আগস্ট, ২০২৪ বিকেল ৩:০০ টা থেকে ৮:০০ টার মধ্যে
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: কারবালা কবরস্থান, যশোর
কবরের গুগল লোকেশন	: https://maps.app.goo.gl/17EXaA94NGi5qbFB9

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য এককালীন ভাতার ব্যবস্থা করা।

২। বাবার মুদির দোকানে পুঁজি দিয়ে সহায়তা করা।

৩। বাবার চিকিৎসায় সহায়তা করা।

শহীদ মোঃ রাকিবুল হোসেন

ক্রমিক : ৪০৮

আইডি : খুলনা বিভাগ ০২৪

পরিচয়

এক প্রদীপ্ত ফুল শহীদ মো: রাকিবুল হোসেন। জুলাই বিপ্লবে প্রথম দিবসে এক ডজন রাবার বুলেট শরীরে বিদ্ধ হওয়ার পরেও আজাদির নেশায় পরের দিন ছাত্রজনতার বিপ্লবে শরিক হন শহীদ রাকবুল হাসান। আচমকা পিছনের দিক থেকে সরাসরি ঘাড়ে গুলি লেগে শাহাদাতের সুধা পান করেন রাকিবুল।

রাকিবুল হোসেন ১৯৯৫ সালের ১৩ অক্টোবর ঝিনাইদহ জেলার হরিশাকুন্ড এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিকী, যিনি বিমান বাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তার মায়ের নাম মোসা: হাফিজা সিদ্দিকী।

আবু বকর সিদ্দিকীর দুই ছেলের মধ্যে রাকিবুল ছিলেন ছোট। বাবার ইচ্ছা ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন। রাকিব ছোট থেকেই অনেক মেধাবী ছিলেন। বিএফ শাহিন কলেজ, যশোর থেকে ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি পান। তিনি ২০১১ সালে এসএসসিতে কাঞ্চননগর মডেল হাইস্কুল থেকে জিপিএ ৫.০০ পেয়ে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়। ঝিনাইদহের সুনামধন্য কে.সি কলেজ থেকে জিপিএ ৫.০০ পেয়ে এইচ এস সিতে উত্তীর্ণ হয়ে এম আই এসটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হন। সফলতার সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ১ জুলাই ২৪ তারিখে কাজে যোগদান করে। সর্বশেষ তিনি লন্ডনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান তাইসার রিচ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকেই রাকিবুল পরিবারে অর্থনৈতিক সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করতেন। বাবা মার সাথে একসাথে থাকবেন বলে রাকিবুল ঢাকায় বাসা নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। মহান আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল রাকিবুলের পরিকল্পনার ঊর্ধ্বে। আল্লাহ তার পছন্দের বান্দাকে শহীদ হিসাবে কবুল করে নিলেন।

ঘটনার বিবরণ

জুলাই ২০২৪, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কোটা আর মেধার প্রশ্নে, ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকার কোটাকে অগ্রাধিকার দেয়। অতঃপর মেধাবীদের রাজাকার সম্বোধন করলে মেধাবী ছাত্রসমাজ ফুঁসে উঠে।তাদের অস্তিত্বের প্রশ্নে, নিজেদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে, মেধাকে জীবন্ত রাখতে গঠিত হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের ধারা। জুলাই এর প্রথম সপ্তাহ হতে চলমান বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন ক্রমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র দেশে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের পাশাপাশি প্রতিবাদে শরিক হন কৃষক, শ্রমিক, হকার, চাকরিজীবীসহ আবালবৃদ্ধবনিতা সকল শ্রেনী পেশার মানুষ। তাঁদের অংশগ্রহণে আন্দোলন বেগবান হওয়ায় ছাত্রজনতার উপর নেমে আসে স্বৈরাচারের নির্যাতনের ঝড়। পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবির পাশাপাশি সরকার দলীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর যৌথ প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে ছাত্রজনতার উপর মুহুর্মুহু তাজা গুলি, টিয়ার শেল, রাবার বুলেট ইত্যাদি দিয়ে আক্রমণ শানানো হয়েছিল। বিপ্লবী জনতা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের প্রবল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ জোরদার করতে থাকে।

শহীদ রাকিবুল হোসেন ছোট থেকেই ন্যায়ের প্রতীক ছিলেন। যেকোনো অন্যায় মুখ বুঝে সহ্য করতেন না। ছাত্রদের যৌক্তিক দাবি শহীদ রাকিবুল হাসানের হৃদয়ে আলোড়ন তৈরী করে। ছাত্রদের উপর স্বৈরাচারের স্ট্রীমরোলার আঘাত করেছিল রাকিবুলের হৃদয় কুঠরীতে। তাই তিনি ছাত্রদের আন্দোলনে একাত্মতা পোষণ করলেন।

১৮ জুলাই বেলা এগারোটা থেকেই রাজধানী ঢাকার বেশ কিছু পয়েন্টে নিরস্ত্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপর রাষ্ট্রীয় গুন্ডাবাহিনী এবং শেখ হাসিনার লেলিয়া দেওয়া জানোয়ার রূপি ছাত্রলীগের গুন্ডারা অতর্কিত হামলা চালায়। পাষান পুলিশের গুলিতে স্পট ডেড হতে থাকে নিরীহ ছাত্ররা। অফিসে থাকাকালীন রাকিবুল হোসেন এই দৃশ্যগুলো ফেসবুকে দেখে ঠিক থাকতে পারেন নি। অবিরাম চোখে অশ্রুর ধারায় শপথ নিলেন অফিস শেষেই ছাত্রদের আন্দোলনে শরীক হবেন। তারই ধারাবাহিকতায় শহীদ রাকিব রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বর চত্তর এলাকায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সন্ধ্যায় যোগদান করেন।

গোধূলির সূর্যাস্তের পরপরই পুলিশ মুহুর্মুহু রাবার বুলেট ছুড়তে থাকে। শহীদ রাকিবুল এই বুলেটকে উপেক্ষা করে ছাত্রদের রক্ষা করতে ,তাদের নিরাপদ যায়গা খুঁজে দিতে সামনে এগিয়ে যান ।এক পর্যায়ে ডজনখানিক রাবার বুলেট শহীদ রাকিবুলের তলপেটে এসে লাগে। নিথর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন রাকিবুল। তবুও তিনি দমে যাননি। ছাত্রদের কিছু নিরাপদ যায়গায় রেখে তার নিজের বাসায় চলে যান।

১৯ জুলাই, শুক্রবার ।ছাত্রজনতার প্রতিরোধ সংগ্রামের দ্বিতীয় দিন। আকাশ যেনো এদিন রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। বাতাসে টিয়ারশেলের অসহনীয় বিষবাষ্প আর সাউন্ড গ্রেনেড ফাটিয়ে পুলিশ জনমনে আতংক ছড়িয়েছিল। এনদিন পুলিশ, বিজিবি, ছাত্রলীগ ছিল আরো ভয়ংকর ও সতর্করূপে।

তবুও মুক্তিকামী জনতা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের প্লাটফর্মের ছাত্ররা দলমত নির্বিশেষে জীবনের পরোয়া না করে রাজপথে চলে এসেছেন। বিবেকের প্রচন্ড আঘাতে ঠিক থাকতে পারেন নি রাকিবুল। হৃদয়টা ছটফট করছিল তার, কখন আবার আন্দোলনে যোগ দিবেন। শুক্রবার অফিস বন্ধ থাকায় আগের দিনে রাবার বুলেটবিদ্ধ শরীর নিয়ে শাহাদাতের জজবা নিয়ে সন্ধ্যার দিকে মিরপুর-১০ নং সেক্টরে মেট্রোরেল স্টেশনের পাশেই আন্দোলনে অংশ নেন। এ দিনও জুমার নামাজের পর থেকে পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরণ করে শতশত নিরীহ ছাত্র-জনতা। আনুমানিক রাত ৯.০০ দিকে সন্তান গুলিবিদ্ধ হয়েছে এমন খবর পেয়ে, রাকিবের সামনে দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে একজন মহিলা ঘটনাস্থলের দিকে যাচ্ছিলেন। পুলিশ, আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়া নিরিহ ছাত্রজনতাকে লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি করতে থাকে। তখন পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল। এমন পরিস্থিতে রাকিব মহিলার গতি রোধ করে আটকে দেন এবং তাকে সান্তনা দেয়ার চেষ্টা করেন। সান্তনা দিতে দিতেই হঠাৎ করে ১টি বুলেট রাকিবের পিঠের উপরের অংশে লেগে গলার নিচের অংশ

দিয়ে বের হয়ে যায়। কিন্তু বুঝে উঠার আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শহীদ রাকিবুলের নিষ্পাপ দেহ।

পাশেই আন্দোলনে অংশ নেওয়া তার বন্ধুরা তাকে উদ্ধার করতে গেলো। এমন শোকার্ত পরিবেশ ও অনেক ঝুঁকি। পুলিশ আর বিজিবির টহল তখনও চলছে। খোঁজ পেলেই ব্রাস ফায়ার অথবা গ্রেফতার। তবুও ঝুকি নিয়ে রাকিবুলের বন্ধুরা নিকটস্থ ডা. আজমল হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে সাথে সাথে মৃত ঘোষণা করেন। রাকিবের বন্ধুরা তার বাবার মোবাইল নাম্বারে ফোন করে তার ভাইয়ের নিকট মৃত্যুর সংবাদ দেয়। সে খবর শুনে শহীদ রাকিবুলের মা শোকার্ত হৃদয় নিয়ে প্রায় আধা পাগল হয়ে যান। গভীর এক ভূতড়ে রাত। রাস্তায় কোনো গাড়ি নেই। রক্তের ফিনকিতে উত্তাল শহর। অনেক খোজাখুজির পর অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেলো। রাকিবুলের বন্ধু পিয়াস ও ফয়সাল এ্যাম্বুলেন্সে করে লাশ পরদিন ভোরে ঝিনাইদাহ শহরের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেন। কিন্তু তখনও ঝুঁকি লাশ নিয়ে। জানাজা কে করাবে। কিভাবে কবরস্থ করাবে সে বিষয় নিয়ে। কারণ, হাসিনার নোংরা প্রশাসন ছিল সদা তৎপর। তাদের অনেক অনুনয় বিনয় করে কিছু সময় পাওয়া গেলে সকাল ৯ টায় ১ম জানাজা ঝিনাইদহ শহরে এবং গ্রামের বাড়ি বাসুদেবপুরে বেলা ১১.০০ টায় ২য় জানাজা শেষে বাসুদেবপুর কবরস্থানে শহীদ রাকিবুলকে কবরস্থ করা হয়।

প্রতিবেশী ও বন্ধুদের অভিব্যক্তি

শহীদ রাকিবুলকে নিয়ে এলাকাবাসীর ধারণা খুবই স্বচ্ছ ও ভালো ছিল। রাকিবুলের চাচা স্মৃতিচারণ করতে করতে বলেন, 'ওর মতো মেধাবী ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছেলে আমাদের গোটা গ্রামে খুবই কম আছে। রাকিবুলের বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছিল, আর এরমধ্যে কি যে হয়ে গেলো। রাকিবুলের মা ছিল ক্যান্সারে আক্রান্ত। ছেলের মৃত্যুর কথা শুনে পাগলের মতোই হয়ে গেলো। কান্নার স্রোতে ভাসিয়ে বলতে লাগলো, 'আরে খোকা তুই না বললি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বি। সত্যি সত্যিই ঘুমালিরে আমার খোকা।'

শাহাদাত স্রষ্টার দেওয়া গৌরবের সম্পদ। শহীদ মো: রাকিবুল হোসেন সেই মহান গৌরবের উত্তরাধিকারী।

রাকিবুল হোসেনের মতো অজস্র শহীদের রক্তের বিনিময়ে এ জুলাই বিপ্লবের লোমহর্ষক ঘটনা সবার হৃদয়ে দাগ লাগিয়ে যাক এবং নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে শহীদ রাকিবুলদের মতো লাখো তরুণ বৈষম্যবিরোধী নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করুক। তবেই শহীদ রাকিবুল হোসেনদের এ আত্মত্যাগ স্বার্থকতা লাভ করবে।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Jhenaidah Paurashava
Jhenaidah Sadar, Jhenaidah
মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate
Sex: Male
In Word: Nineteenth of July Two Thousand Twenty four
Name: Md Rakibul Hossain
Nationality: Bangladesh
Place of Death: Dhaka, Bangladesh
Cause of Death: BROUGHT DEAD

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card
নাম: মোঃ রাকিবুল হোসেন
Name: MD. RAKIBUL HOSSAIN
পিতা: মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
মাতা: মোছাঃ হাফিজা খাতুন
Date of Birth: 13 Oct 1995
NID No.: 780 258 4891

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: মো: রাকিবুল হোসেন
জন্ম তারিখ	: ১৩/১০/১৯৯৫
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মহিষাকুণ্ড, ইউনিয়ন: ৭ নং ওয়ার্ড, ঝিনাইদহ পৌরসভা, ঝিনাইদহ সদর
সর্বশেষ ঠিকানা	: বাসা: মহিষাকুণ্ড, চড়িয়ার বিল, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ
পিতার নাম	: মো: আবুবকর সিদ্দিকী (৬০)
পিতার পেশা	: বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (জেসিও)
পিতার মাসিক আয়	: ১৫,০০০/- (পেনশন)
মায়ের নাম	: মোসা: হাফিজা খাতুন (৪৮)
মায়ের পেশা	: গৃহিণী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৫ (পাঁচ)
বড় ভাইয়ের নাম	: মো: ইকবাল হোসাইন (পেশা: সিনিয়র অফিসার, সোনালী ব্যাংক)
ঘটনা/মৃত্যুর স্থান	: মিরপুর-১০, ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪, রাত ৯:৩০ মিনিট
নিহত হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪, রাত ৯:৩০ মিনিট
শহীদের কবরস্থান	: বাগুদেবপুর কবরস্থান, হরিণাকুণ্ড

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা

শহীদ মোঃ সাব্বির হোসেন

ক্রমিক : ৪০৯

আইডি : খুলনা বিভাগ ০২৫

পরিচয়

শহীদ সাব্বির হোসেন একজন নির্মাণ শ্রমিক। তার রক্ত উজ্জীবিত করেছে এই আন্দোলনকে এবং এনে দিয়েছে বিজয়। দরিদ্র পরিবারের সন্তান সাব্বির হোসেন পিতা-মাতার তিন সন্তানের মাঝে প্রথম। ১০ পারা কোরআনের হাফেজ। তার আগে পড়েছেন ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। সংসারের হাল ধরতে লেখাপড়া বাদ দেন। হেঁটে যান আয়ের পথে।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

জুলাই বিপ্লব ছিল সর্বস্তরের সকল নিপীড়িতের চূড়ান্ত সম্মিলিত বিক্ষুব্ধ বিস্ফোরণ। এই গণবিপ্লবের পথ দেখিয়েছেন দিয়েছেন আমাদের শহীদেরা। খোদা প্রদত্ত জানকে কোরবানি করে তারা সাম্য ও ইনসানিয়াত ভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার জিম্মাদারি আমাদের হাতে অর্পণ করে গেছেন। ৫ আগস্ট আমাদের বিজয় হয়েছে। এই বিজয় অর্জনে আছে বহু ত্যাগ তিতিক্ষা। প্রাণ গিয়েছে বহু বহুজনের।

দীর্ঘ ষোল বছরের ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন এবং কর্তৃত্ববাদী সরকারের কারণে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ ছিল ভিক্টিম, তারা ছিল বিক্ষুব্ধ। দল, মত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কমবেশি প্রত্যেক শ্রেণীপেশার মানুষ এ বাকশালী শাসনে নিপীড়িত-নির্যাতিত হয়েছে। ফ্যাসিস্ট কর্তৃক ভিক্টিম হওয়া থেকে বাদ যায়নি খোদ (জ্ঞাত/অজ্ঞাতসারে) ফ্যাসিবাদের ভিত্তি স্থাপনকারীরাও।

এই আন্দোলন শহীদ আবু সাঈদের রক্তের উপর দাঁড়ানো আন্দোলন, শহীদ মীর মুগ্ধের স্মৃতির উপর দাঁড়ানো আন্দোলন। যে রিকশাওয়ালা ভাই ক্রমাগত দুঃশাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে শহীদ হয়েছেন তার কুরবানির উপর দাঁড়ানো আন্দোলন। সহস্রাধিক শহীদ আমাদের পথ দেখিয়েছেন এক নতুন মঞ্জিলে-মাকসুদ এই আন্দোলনে যেমন অবদান ছিল সমাজের উঁচুতলার মানুষের, আবার আন্দোলনের ভ্যানগার্ড ছিল সমাজের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীরাও। ইংলিশ মিডিয়ামের টেক স্যাভি কিড থেকে শুরু করে কওমি-আলিয়ার তালেবে এলেম, শাহবাগ-ধানমন্ডি-মিরপুর-উত্তরা-সাভার থেকে শুরু করে বাংলার স্টালিনগ্রাদ হয়ে ওঠা যাত্রাবাড়ি, শহর-নগর, গ্রাম-গ্রামান্তরে এই বিপ্লব ছিল আপনার, আমার, সবার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনা থেকে বিপ্লবের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছিল প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় -স্কুল-কলেজে। এ আওয়াজ আরও উজ্জীবিত করেছিলো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। আর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন হয়ে উঠেছিল গণমানুষের কণ্ঠস্বর। এই বিপ্লব ছিল শ্রমিক, দিনমজুরের।

সাব্বির উত্তরায় থেকে কাজ করতেন। ১৮ জুলাই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনকারীরা তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। ইতোমধ্যে সরকার আন্দোলন দমন করতে খুন করে বহু তাজা নিষ্পাপ বনি আদম। ১৮ জুলাই মানুষ হত্যার প্রতিবাদ নেমে আসে রাস্তায়।

প্রতিটা ইনসান রাস্তায় নেমে এসেছিল, 'আমার ভাই মরলো কেন?' এই প্রশ্নের প্রতিউত্তরে যখন তাদের উপর হায়েনার মত হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া হয়েছে, তখনই আমাদের শহীদেরা দাঁড়িয়ে গেছেন লড়াইয়ের ভ্যানগার্ড হিসেবে।

উত্তরা-বিএনএস-আজমপুর ছাত্র-জনতার লড়াকু সম্মিলন। নিরীহ, নিরপরাধ ছাত্র জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের সশস্ত্র খুনে বাহিনী। এলাকা হয়ে পড়ে রণক্ষেত্র।

সাব্বির দুপুরের খাবার খেয়ে ওষুধ কিনতে বের হন। সংঘর্ষে আটকা পড়েন।আনুমানিক ৩ টায় পুলিশের একটি বুলেট সাব্বিরের গলা বিদীর্ণ করে। আন্দোলনরত ছাত্ররা দ্রুত তাকে উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তাকে গ্রামের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯ জুলাই ১০ টায় জানাজাবাদ মির্জাপুর স্থানীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

আত্মীয় ও বন্ধুদের অনুভূতি

তার বাবার বক্তব্য, 'আমি প্রথম বাবা ডাক শুনেছি তার কণ্ঠে। আমার প্রথম সন্তান। তার মৃত্যু আমি কীভাবে মেনে নেই? আমি সহ্য করতে পারছিনা।'

বন্ধু অতুল কুমার বিশ্বাস বলেন, 'আমরা এক সাথে বড় হয়েছি। কত জায়গায় এক সাথে ঘুরেছি। কত কাজ করেছি। সাব্বির হোসেন খুব ভাল মানুষ, ভাল বন্ধু ছিল।'

বোন সুমাইয়া বলেন, 'আমার ভাইতো কোনো দল করতো না। নিরপরাধ ভাই আমার। আমার ভাই কোনো দিন কারও সাথে কোনো রকম ঝগড়াঝাঁটিতে যেত না। চাকরি করে সংসার চালাত। আমরা কার কাছে যাব? কার কাছে বিচার চাইব? আমার ভাইকে যারা হত্যা করেছে আমরা তার বিচার চাই।'

মামাত ভাই তন্ময় আহমেদ তক্বর ভাষ্যমতে, 'সাব্বির ছিল নম্র, ভদ্র, শান্ত মেজাজের মানুষ। সে কারও ক্ষতি করতো না।' তারা দুজন ভালো বন্ধুও ছিল। তার হত্যার বিচার দাবী করেন তিনি।

পারিবারিক অবস্থা

সাব্বিরের বাবা একজন দরিদ্র কৃষক। সংসারের ভার বহন করতে তার কষ্ট দেখে ছেলে সাব্বির লেখাপড়ায় ইস্তফা দেন। তিনি উপার্জনে মনোনিবেশ করেন। নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করে পরিবারকে সহায়তা করেন। তার মৃত্যুতে পরিবারটির সামনে এখন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। তারা চরম অর্থ কষ্টে আছেন। অতিবাহিত করছেন সংকটময় জীবন।

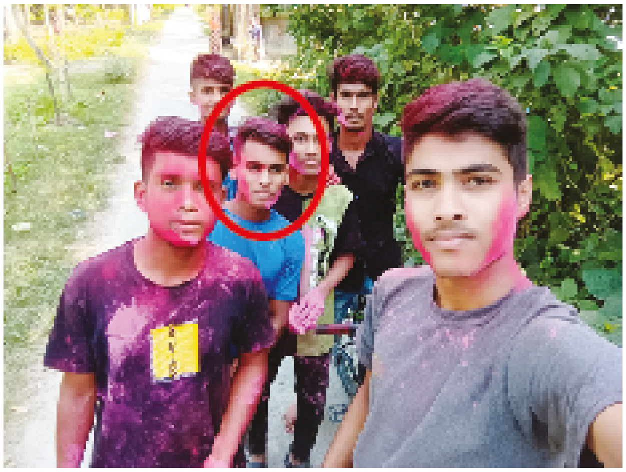

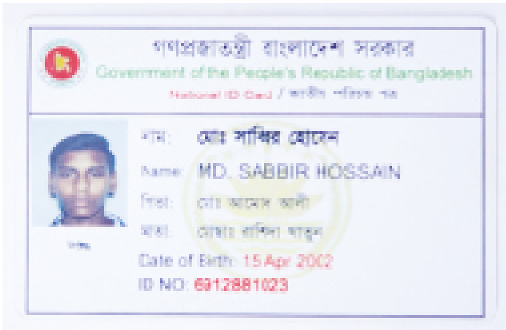

সংক্ষিপ্ত শহীদ প্রোফাইল

নাম	: মো: সাব্বির হোসেন
জন্ম তারিখ	: ১৫-০৪-২০০২
পিতা	: আমোদ আলী
মাতা	: মোছা: রশিদা খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মির্জাপুর, ইউনিয়ন: ২নং মির্জাপুর, থানা: শৈলকুপা, জেলা: ঝিনাইদহ
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, এলাকা: চরিয়ারবিল, থানা: শৈলকুপা জেলা: ঝিনাইদহ
সদস্য	: বাবা, মা, ১ ভাই, ১ বোন
পেশা	: নির্মাণ শ্রমিক
শিক্ষা	: ৬ষ্ট শ্রেণী ও দশ পারার কোরআনে হাফেজ
কবর	: মির্জাপুর স্থানীয় কবরস্থানে
শাহাদাতের তারিখ	: ১৮ জুলাই বিকাল ৩ টা
শাহাদাতের স্থান	: উত্তরা-বিএনএস-আজমপুর পয়েন্টে
আঘাতের ধরন	: পুলিশের ছোঁড়া গুলি গলায় বিদ্ধ হয়

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা।
২। শহীদ সাব্বিরের বোনটি বিবাহযোগ্য। তার বিয়ের ব্যবস্থা করা। সমুদয় খরচ বহন করা।
৩। শহীদের ভাইয়ের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

শহীদ মো: শাহারিয়া

ক্রমিক : ৪১০
আইডি : খুলনা বিভাগ ০২৬

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: শাহারিয়া চাকুরিজীবী ছিলেন। তাঁর ঘরে আট মাসের একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তান রয়েছে। রাজধানীর মিরপুর-১ এলাকায় স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে ভাড়া বাসায় সংসার পেতেছিলেন তিনি। বৈবাহিক জীবনে পদার্পণ করেন ২০১৮ সালে। মহান আল্লাহ শহীদকে একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন। যার সাথে সবসময় খুনসুটিতে মেতে থাকতেন তিনি।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট: বাবা মায়ের চার সন্তানের মাঝে শাহরিয়া ছিলেন তৃতীয়। তিনি পেশায় ছিলেন একজন প্রকৌশলী। ঢাকায় একটি কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনা থেকে আওয়াজ শুরু হয়েছিল জুলাই বিপ্লবের। ডাক এসেছিল কোটা বিরোধী আন্দোলনের। তারপর বিপ্লবের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছিলো সারাদেশে। আওয়াজ থামিয়ে দিতে চেয়েছিল আওয়ামী সন্ত্রাসীরা। লেলিয়ে দিয়েছিল যুবলীগ, ছাত্রলীগের হায়েনাদের। এই রুদ্ধপ্রচেষ্টা রুখে দিয়েছিলো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। আন্দোলন রূপান্তরিত হয় কোটা থেকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে। এই বিপ্লব ছিল শ্রমিকের, দিনমজুরের। আন্দোলন ছিল সাহসী কবি সাংবাদিকের, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও রেমিট্যান্স যোদ্ধা প্রবাসী ভাইবোনদেরও। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই রাস্তায় নেমে এসেছিলেন দেশ ও জাতির মুক্তির স্লোগান তুলে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ।

ইতিহাসে উল্লেখ আছে ফতেহ মক্কার কথা, এই বৃহৎ ভূখণ্ডের ইতিহাসে আছে ফতেহ বাঙ্গালার। এই পথ পরিক্রমায় আমরা পেলাম ফতেহ গণভবন-যেদিন গণভবন সত্যিই গণের ভবনে পরিণত হয়েছিল। ৫ আগস্ট অর্জিত হয় এই ফতেহ বা বিজয়। এর জ্বালানী ছিল বিডিআর বিদ্রোহ, আয়নাঘর। এই ধারাবাহিকতায় নাম আসে শাপলা থেকে শুরু করে মোদী বিরোধী আন্দোলন, শেয়ারবাজারে নি:স্ব মজলুম পরিবার, সাংবাদিক সাগর-রুনির সন্তান মেঘ, ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন ছিল জুলাই ইনকেলাবের জ্বালানি। আমাদের আহত,নিহত যোদ্ধারা ছিলেন সীমাহীন উজ্জ্বল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ৫ আগস্ট আসতে আসতেই ঘটে গিয়েছে জুলাইয়ের প্রাণদানের ইতিহাস। হাসিনা সরকার নির্বিচারে হত্যা করে হাজার হাজার মানুষকে। শহীদ হয় আন্দোলনের সাহসী কর্মী, রুটি রুজির তাগিদে বের হওয়া শ্রমিক, বাসায় খেলারত নিষ্পাপ শিশু। ২৪ এর বীর যোদ্ধা শহীদ শাহরিয়ার। ১৯ জুলাই ২০২৪, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ঢাকাসহ সারাদেশ উত্তপ্ত। শাহরিয়ার নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে বাজারে গিয়েছিলেন। নির্ধারিত সময়ে বাসায় ফিরতে দেরী হওয়ায় তাঁর স্ত্রী বারবার মোবাইলে কল দেয়।

সাড়া না পেয়ে শহীদের ভাইকে জানান বিষয়টি। পরে জানতে পারেন শাহরিয়ার গুলিবিদ্ধ হয়েছে। মিরপুর-২ তখন পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা আন্দোলনকারীদের উপর চড়াও হয়। নির্বিচারে গুলি চালায়। শাহরিয়ার আনুমানিক বিকাল ৫ টায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়েছিল। পথচারীরা শহীদকে নিয়ে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে যায়। সেখান থেকে পাঠানো হয়

আগারগাঁও নিউরো সাইন্স হাসপাতালে। আইসিইউতে রাখা হয়। ২৩ জুলাই সন্ধ্যা ৭ টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। পরবর্তীতে গ্রামের বাড়িতে জানাজা শেষে তাকে স্থানীয় শংকরচন্দ্র কবরস্থানে দাফন করা হয়।

পারিবারিক অবস্থা

বাবা মায়ের চার সন্তানের মাঝে শহীদ মো: শাহরিয়ার ছিলেন তৃতীয়। নিতান্তই দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান তিনি। তাঁর মৃত্যুতে বাধ্য হয়ে রাজধানী শহর ঢাকা ছাড়তে হয়েছে শহীদ স্ত্রীকে। শিশু পুত্রকে সাথে নিয়ে বর্তমানে শ্বশুর-শাশুড়ির সাথেই তিনি দিনাতিপাত করছেন। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির হঠাৎ চির প্রস্থানে পরিবারটি এখন চরম বিপাকে পড়েছে। অর্থ সংকটে অনাদর বুভুক্ষ জীবন পার করছেন শহীদ পত্নী।

আত্মীয়দের অনুভূতি

শহীদের চাচাত ভাই হাফিজুর রহমান বলেন- 'আমার ভাই শাহরিয়ার খুব ভালো মানুষ ছিলেন। সবসময় মানুষের বিপদে সাড়া দিতেন। কারও কোন সমস্যা হলে সমাধানের চেষ্টা করতেন। কারও সাথে কোন ফ্যাসাদে জড়াতেন না। নম্রভদ্র ও মিশুক স্বভাবের মানুষ ছিলেন তিনি। সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। গত রমজানে নিজ এলাকায় বিরাট ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছিলেন।' শহীদ পিতা বলেন- 'শাহরিয়ার খুব ভালো ছেলে ছিল। কোন রকমের অহংকার ছিল না তার। কারও সাথে কোন রকম রেষারেষি পছন্দ করতো না।

প্রস্তাবনা

আট মাস বয়সী একটি সন্তান আছে শহীদ শাহরিয়ারের। সন্তান ও স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত মাসিক ভাতার প্রয়োজন। এককালীন অনুদানও দেয়া যেতে পারে। স্ত্রীকে চাকুরি দিলে তাঁর ভবিষ্যতের পথ সুগম হবে। সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তাঁর লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে। শহীদ বাবা-মা'কে সহায়তা করা যেতে পারে।

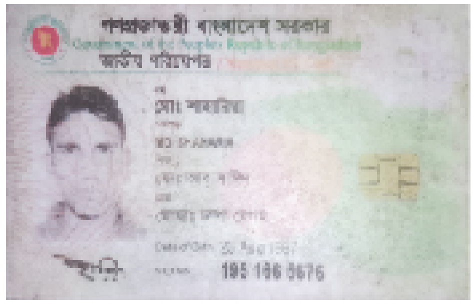
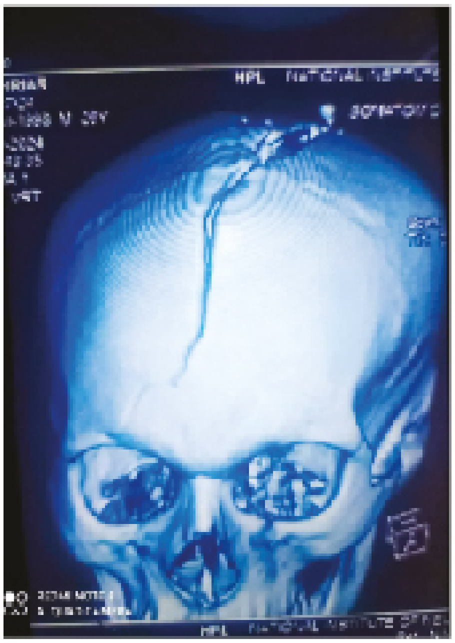

এক নজরে শহীদের প্রোফাইল

নাম	: মো: শাহারিয়া, পেশা: চাকুরি (প্রকৌশলী), কোম্পানি: কোহিনুর লিফট লিমিটেড
জন্ম তারিখ	: ২৩ আগস্ট ১৯৯৭
পিতা	: আবু সাঈদ, বয়স: ৬০, পেশা: কৃষক
মাতা	: চম্পা খাতুন, বয়স: ৪৮, পেশা: গৃহিণী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শংকরচন্দ্র, ইউনিয়ন: ১০ নং শংকরচন্দ্র, থানা: চুয়াডাঙ্গা সদর, জেলা: চুয়াডাঙ্গা
আহত	: ১৯ জুলাই ২০২৪ সন্ধ্যা ৬.০০ টা, মিরপুর-০২, আঘাতকারী: পুলিশ
শাহাদত বরণ	: ২৩ জুলাই ২০২৪ সন্ধ্যা ৭.০০ টা, নিউরো সাইন্স হাসপাতাল ঢাকা
কবর	: শংকরচন্দ্র কবরস্থান

পরিবারের বিবরণ (স্ত্রী ও সন্তান)

মোসা: রাজিয়া সুলতানা, বয়স: ২৪, পেশা: গৃহিণী, সম্পর্ক: স্ত্রী, শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ার (ডিপ্লোমা)

মো: মোস্তাফিজ, বয়স: আট মাস, সম্পর্ক: ছেলে

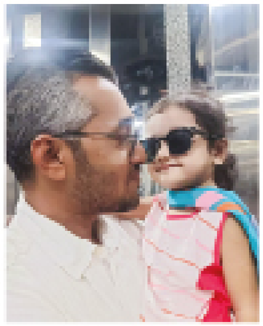

শহীদ মো: মাসুদ রানা মুকুল

ক্রমিক : ৪১১

আইডি : খুলনা বিভাগ ০২৭

পরিচিতি

শহীদ মো: মাসুদ রানা মুকুল। তিনি ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার কয়রাডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা রায়হান বিশ্বাস পেশায় একজন কৃষক। মাতা জাহানারা খাতুন গৃহিনী। মাসুদ রানা ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ২০২৩ সালে তিনি নিজে ব্যবসা শুরু করেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম এম এস ইঞ্জিনিয়ারিং। এসবের পাশপাশি তিনি উদ্যোক্তা হিসেবেও কাজ করতেন এবং সামাজিক অনেক কাজে তিনি নিবেদিত ছিলেন। আর্থিকভাবে মোটামুটি তারা ছিল স্বচ্ছল পরিবার। বর্তমানে তিনি স্বপরিবারে ঢাকার মিরপুর-১ এর আহ্নং এলাকায় বসবাস করছিলেন। স্ত্রী ও একটি কন্যা সন্তান রেখে ৫ আগস্ট ২০২৪ তিনি দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে শহীদ হন। মেয়ে আরবী ফেরদৌস মদিনার বয়স মাত্র ৩ বছর। অল্প বয়সেই বাচ্চাটি পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলো। মাসুদ রানার মৃত্যুতে তার পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেলো।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

দীর্ঘ সময়ের ক্ষমতার দম্ভ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। মানুষ ভুলে যায় ক্ষমতার দৌড় যতই লম্বা হোক তা একদিন শেষ হবেই। ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকার ক্ষমতায় যেভাবে এতোদিন টিকে ছিলেন তাতে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন তাকে কেউ পরাজিত করতে

পারবে না। তাইতো ছাত্রদের যৌক্তিক দাবীর প্রেক্ষিতে তিনি ছিলেন অহমিকায় বিভোর। ভুলে গেছেন তরুণরা চাইলে দেশকে বদলে দিতে পারে। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। কোটা নয় মেধা এটাই ছিল জুলাই ২০২৪ এর স্লোগান। হাজারো তরুণের শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে শত-হাজার প্রাণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে দেশকে চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মুখোমুখি করে। ফলে এক দফা এক দাবীতে পৌঁছাতে সময় লাগে না। শতশত ছাত্রের রক্ত বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে বাধ্য করে। মাত্র একটি কোটা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসকে বদলে দিয়েছে। অধিকারের লড়াইয়ে বাংলাদেশের মানুষ দ্বিতীয়বারের মতো দেশকে স্বাধীন করেছে। এই স্বাধীনতা হাজারো মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত। ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়ে ফ্যাসিবাদী শাসক শেখ হাসিনা দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। নতুন করে শুরু হয় বাংলাদেশের ভীত রচনা।

বিশ্বজুড়ে ক্ষমতাসীন শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর যে উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়েছে তার অন্যতম নিদর্শন স্বৈরশাসক হাসিনার পতন। জনরোষের মুখে বাংলাদেশের দীর্ঘতম সময়ের শাসক শেখ হাসিনার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া আমাদের মনে করিয়ে দেয় জনগণের ঐক্যমতের কাছে শক্তিশালী শাসনব্যবস্থাও কতোটা নাজুক হতে পারে। বর্তমানে জুলাই ২০২৪ বাংলাদেশের একটি ইতিহাসের নাম। ছাত্রদের কোটা আন্দোলন স্বৈরশাসক হাসিনার পতনকে নিশ্চিত করেছে। শহীদ মাসুদ রানা ছিলেন পরোপকারী বন্ধুসুলভ। আত্মীয় স্বজনের কাছে তিনি ছিলেন খুবই স্বচ্ছল ব্যক্তি। সবাইকে তিনি আগলে রাখতেন। সেই মাসুদ রানা দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে ছাত্রদের পাশে থেকেছেন অভিভাবক হয়ে। ধীরে ধীরে আন্দোলনের রূপ রেখা যখন পরিবর্তন হয়ে এক দফা দাবীতে পুরো দেশ সোচ্চার তখন মাসুদ রানাও ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতনের আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

যেভাবে শহীদ হলেন

ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার পতনের আন্দোলনে হাজার হাজার ছাত্র জনতা যখন ঢাকা শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল তখন মাসুদ রানা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পাশেই অবস্থান নিয়েছিলেন। সময়টি ছিল ৪ আগস্ট। সেদিন তিনি মিরপুর ১০ নাম্বারে আন্দোলনে অংশ নিয়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের পানি খাওয়ানোতে ব্যস্ত ছিলেন। পানি খাওয়ানোর সময়টিতে পুলিশের গুলি এসে তার মাথায় আঘাত করে। আনুমানিক সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে এ ঘটনা ঘটে। সেখানেই তিনি আহত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। চারপাশ থেকে তার বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্ররা মিলে তাকে আগারগাঁও নিউরোসাইন্স হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে তাকে আই সি ইউতে ভর্তি করানো হয়। ঐদিন দিবাগত রাত ১.১৫ মিনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। পরবর্তীতে তার বন্ধুদের সহযোগিতায় লাশ তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। পরদিন ৫ আগস্ট দুপুর ২.৩০ মিনিটে কয়রাডাঙ্গা ঈদগাহ কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য

শহীদের চাচাত ভাই মোজাম্মেল হক বলেন, 'আমি ঢাকায় চিকিৎসা করাতে গিয়ে তার বাসায় ছিলাম। সেখানে থাকা অবস্থায় কখন কি খাবো আমার কি লাগবে সবরকম খোঁজখবর রাখত। আমাকে নিয়ে হাসপাতালে দৌড়াত। আজ সে নাই। দেশকে স্বাধীন করে সে আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে। ভীষন কষ্ট পাই।'

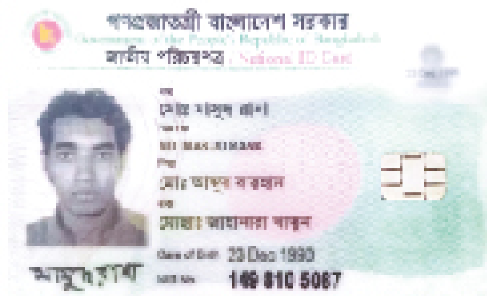

এক নজরে শহীদ মোঃ মাসুদ রানা মুকুল

নাম	: মোঃ মাসুদ রানা
পেশা	: ব্যবসায়ী
পেশাগত প্রতিষ্ঠানের নাম	: এম এস ইঞ্জিনিয়ারিং
পিতা	: রায়হান বিশ্বাস
মাতা	: জাহানারা খাতুন
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২৩-১২-১৯৯০, বয়স: ৩৪ বছর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম-কয়রাডাঙ্গা, থানা-আলমডাঙ্গা, চিতলা ইউনিয়ন, জেলা: চুয়াডাঙ্গা
বর্তমান ঠিকানা	: ঢাকার মিরপুর ১ এর আশেপাশে এলাকা
পিতার পেশা	: কৃষক, বয়স: ৭০ বছর
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, সময়: সন্ধ্যা ৬:৩০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, রাত ১.১৫টা (০৪ তারিখ দিবাগত রাত), নিউরোসাইন্স হাসপাতাল, ঢাকা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: কয়রাডাঙ্গা ঈদগাহ কবরস্থান (23.69ÕN 88.81ÕE) (জিপিএস লোকেশনসহ)
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন, মা, বাবা, ভাই-বোন

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা

২। শহীদের এতিম কন্যার পড়ালেখাসহ সকল ব্যয়ভার বহন করা

৩। শহীদ মাসুদ রানার স্ত্রীর জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করা

শহীদ মো: আশরাফুল ইসলাম

ক্রমিক : ৪১২

আইডি : খুলনা বিভাগ ০২৮

মো: আশরাফুল ইসলামের পরিচয়

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একে একে অনেকগুলি সরকার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কোন সরকারই দেশ, জাতি, সাধারণ জনগোষ্ঠীর মনের ভাষা বুঝতে পারেননি। ফলে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তারা জনগণের খাদেম না হয়ে অত্যাচারিত শাসকে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রে বৈষম্য বাড়তে বাড়তে অনেকটা অকার্যকর সংস্থায় পরিণত হয়। এটার বিরুদ্ধে লড়তে যেয়ে মো: আশরাফুলের মত নিরীহ জনগণকে জীবন দিতে হয়েছে। তিনি ১৩ ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সালে পিতা কফিল উদ্দিন ও মাতা মোসা: নাজমা খাতুনের কোল আলোকিত করে জন্ম নেন। তার বাড়ি কুষ্টিয়া সদর থানাধীন শালদাহ গ্রামে। বাবা মায়ের অপার স্নেহে বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। দরিদ্র বাবা মায়ের ঘরে জন্ম নেওয়া মো: আশরাফুল লেখা পড়ায় বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। চার ভাই ও এক বোন সহ সাত জনের সংসারে বাবার আয়ের সামান্য অর্থ দিয়ে কোন রকম চলছিল। পরিবারটিকে একটু সুখ দেওয়ার জন্য আতিয়ার মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কোম্পানিতে চাকুরী নেন। যৌবনের শুরুতে শাবনী আক্তার ইতি নামে একটি মেয়ের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরবর্তীতে শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীর জমির উপরে ছোট্ট একটা ঘর করে সেখানে বসবাস করতেন। তাদের নয় বছরের একটি ছেলে ও চার বছরের একটি মেয়ে রয়েছে। অভাব অনটন থাকলেও তিনি ধর্মের প্রতি খুবই অনুরাগী ছিলেন। তিনি সবসময় শহীদি তামান্না পোষণ করতেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

শহীদ মো: আশরাফুল ইসলাম নম্র, ভদ্র স্বভাবের হলেও অন্যায়ের কাছে কখনো মাথা নত করেননি। সমাজ থেকে সকল ধরণের বৈষম্য দূর হোক এটা তিনি কামনা করতেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হলে তিনি এটাকে স্বাগত জানান। কিন্তু এ আন্দোলন দমনের জন্য প্রথমে খুনি ছাত্রলীগ এবং পরবর্তীতে পুলিশ ও বিজিবি মাঠে নামান। তারা নির্বিচারে গুলি করে এ আন্দোলন দমাতে চেয়েছিলেন। ০৪/০৮/২০২৪ ইং তারিখের আন্দোলনে অংশ নেয়া এক বাচ্চার মৃত্যু দেখে তিনি মেনে নিতে পারেননি। ঐ দিন অফিস থেকে বাসায় এসে তার স্ত্রীকে বললেন, 'পুলিশ এই বাচ্চাটাকে মারলো কিভাবে? আমি পুলিশের সমুচিত জবাব দেব।' এই কথা বলে একটি লাঠি নিয়ে বাড়ি থেকে তিনি বের হতেই স্ত্রী সামনে এসে বললো, 'তুমি যেও না। তোমার কিছু হলে আমাদের কি হবে।' স্ত্রীর বাধা আর কান্নাকাটিতে তিনি ৪ তারিখ আর যেতে পারেননি। পরের দিন ৫ তারিখ স্ত্রীর রান্নার কাজে সহযোগিতা করতে গিয়ে বলেন, 'আমি আন্দোলনে গিয়ে যদি শাহাদাত বরণ করি, তাহলে তুমি অন্য জায়গায় বিয়ে করবে না তো?' স্ত্রী বললেন, 'না।' 'তাহলে সন্তান দুটি দেখে দেখে রেখো।' এ কথা বলে, স্ত্রীর নিষেধ উপেক্ষা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করেন। আন্দোলন চলাকালীন সময়ের সদর থানার দারোগা সায়েব আলীর নেতৃত্বে আলফা নির্বিচারে ছাত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে। বেলা ১ টার দিকে ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পুলিশের কিছু ছররা গুলি আশরাফুলের পেটের নিচে লাগে। মুহূর্তেই তিনি সেখানে লুটিয়ে পড়েন। তাকে উদ্ধার করে দ্রুত সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ৩ টার দিকে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। অতঃপর সেদিনেই গোসল ও জানাজা নামাজের পর হটস হরিপুর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। সারা জীবনের লালিত স্বপ্ন বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার এক অগ্রসৈনিককে হারালো তার সাথীরা। দেশ হারালো এক বুদ্ধিদীপ্ত তরুণকে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীর বক্তব্য

শহীদ মো: আশরাফুল ইসলাম ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। ছোটবেলা থেকেই তিনি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন। প্রতিবেশীদের সাথে সবসময় সুসম্পর্ক রাখতেন। প্রতিবেশী কুলসুম বেগম শহীদ আশরাফুল সম্পর্কে বলেন, আমার বাড়ির সাথেই তার বাড়ি। তিনি ভালো মানুষ ছিলেন। কথা বলতে বলতে এক পর্যায় তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। স্ত্রী লাবনী আক্তার ইতি বলেন, আমাকে আমার স্বামী খুবই ভালোবাসতেন। আমার দেখা পৃথিবীর ভালো মানুষগুলোর মধ্যে সে ছিল অন্যতম।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ মো: আশরাফুল ইসলাম বাবার বাড়ি থেকে এসে শশুর বাড়িতে স্ত্রীর জায়গায় ছোট একটি ঘর করে বসবাস করতেন। আর্থিকভাবে দুর্বল ও অসচ্ছল একটি পরিবার। দুই সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে কোন রকম দিন পার করতেন। ছোট একটি চাকুরিতে যে টাকা পেতেন তা দিয়ে সংসারের নূন্যতম চাহিদা পূরণ করতেন।

আশরাফুল ইসলামের মৃত্যুতে পরিবারটা একেবারে অসহায় হয়ে গেল। বর্তমানে পরিবারের উপার্জনের আর কেহ রইল না। দুই সন্তানকে নিয়ে স্ত্রী বর্তমানে মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: আশরাফুল ইসলাম
জন্ম	: ১৩/০৯/ ১৯৮৭
পিতা	: কফিল উদ্দিন
মাতা	: মোসা: নাজমা খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	: বাসা: শালদাহ, এলাকা: হটশ হরিপুর, থানা: হটশ হরিপুর, জেলা: কুষ্টিয়া
বৈবাহিক অবস্থা	: বিবাহিত
স্ত্রী	: লাবনী আক্তার ইতি
সান্তান	: এক ছেলে এক মেয়ে
পেশা	: আতিয়ার বেঙ্গল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিমিটেড
ঘটনার স্থান	: থানা: মোড, বক চত্বর, কুষ্টিয়া সদর
আহত হওয়ার সময়কাল	: ০৫/০৮/২০২৪ সময় বেলা ১.০০টা
শাহাদাতের সময়কাল	: ০৫/০৮/ ২০২৪ সময় বিকাল ৩.০০টা
আঘাতের ধরণ	: পেটে ছাররা গুলি লাগে
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: হটশ হরিপুর, কেন্দ্রীয় ঈদগাহ কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. একটি সেলাই মেশিন ও ব্যবসা শুরুর জন্য কিছু কাপড় ক্রয় করে দেয়া যেতে পারে।

২. বাচ্চাদের পর্যায়ক্রমে এতিম প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা।

শহীদ বাবু মিয়া (সুরুজ)

ক্রমিক: ৪১৩

আইডি: খুলনা বিভাগ ২৯

শহীদ বাবু মিয়া (সুরুজ) পরিচয়

সুরুজ দরিদ্র পরিবারে বেড়ে ওঠা এক অসাধারণ যুবকের নাম। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যারা স্মরণীয় হয়েছেন শহীদ বাবু মিয়া (সুরুজ) তাদের অন্যতম। ১৯৮৩ সালের ৩রা অক্টোবর পিতা নওশের আলী ও মাতা রাহেলার কোল জুড়ে আসেন সুরুজ আলী বাবু। তার জন্মস্থান কুষ্টিয়া সদর থানাধীন শালদাহ গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই এলাকায় নম্র, ভদ্র ও মার্জিত ছেলে হিসেবে পরিচিত ছিল। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। দরিদ্র পরিবারে বাবার আয়ের সামান্য অর্থ দিয়েই সংসার চলতো। ফলে লেখাপড়ায় বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি। তিন বোন ও চার ভাইসহ নয়জনের পরিবারে বাবার বড় সন্তান হওয়ায় পরিবারের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন।

পরিবারের সচ্ছলতা আনতে সুরুজ আলী বাবু আলুর দম,ফুচকা এগুলো বিক্রি করতেন। পরবর্তী তে স্বর্ণকারের কাজ শিখে ২০২২ সালে নিজের জমানো কিছু টাকা ও ঋনের অর্থ নিয়ে কুষ্টিয়া শহরে একটি দোকান ভাড়া করে স্বর্ণকারের কাজ শুরু করেন। যৌবনের শুরুতে সায়মা নামের এক মেয়ের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। বড় মেয়ে আলিম ক্লাসে, ছেলে ফয়সাল আহমেদ হাফিজিয়া মাদ্রাসায় নাজরা ও ছোট মেয়ে রুবাইয়া মাদ্রাসাতে নার্সারি ক্লাসে লেখাপড়া করে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম বাবা শহীদ হওয়ায় তাদের পড়াশুনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

শহীদ হওয়ার প্রেক্ষাপট

শহীদ সুরুজ জীবনের কাহিনী যেন এক অশ্রুসিক্ত বেদনার করুণ ইতিহাস। স্ত্রী ও তিন সন্তানের পরিবারে তিনিই ছিলেন একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। অনেক কষ্টে একটি স্বর্ণকারের দোকান নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। ভালোই চলছিল তখন সংসার। ছেলে মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে তিনটি বাচ্চাকেই মাদ্রাসায় ভর্তি করেছিলেন। স্বপ্ন ছিল ছেলে হাফেজ হবে এবং মেয়েরা ধর্মীয় আদর্শে বড় হবে। কিন্তু ৫ই আগস্ট পুলিশের বুলেটের আঘাতে জীবন প্রদীপ চলে যাওয়ার সাথে সাথে তার লালিত স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়।

বেশ কিছুদিন ধরে ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন চলছিল। বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মানে ছাত্রদের সেই আন্দোলনে তিনি সমর্থন করে আসছিলেন। কিন্তু ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সন্ত্রাসী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও খুনি যুবলীগকে লেলিয়ে দিয়ে অসংখ্য ছাত্রকে আহত করে। এরপর এক দফার আন্দোলন শুরু হলে খুনি, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবীতে গড়ে ওঠা উত্তাল জনসমুদ্রে তিনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ৫ই আগস্ট বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে যখন ছাত্র জনতা সেদিন সকাল ১০টায় বাড়ি থেকে বের হয়ে কুষ্টিয়া সদর থানার পাশে এন, এস রোডে বার্মিজ গলিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার সাথে যুক্ত হন। আন্দোলন চলাকালে সদর থানার দারোগা সাহেব আলীর নেতৃত্বে আলফা টিম নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। আনুমানিক বিকাল তিনটা থেকে চারটার মধ্যে আন্দোলনের সাহসী বীর শহীদ সুরুজ আলীর পেটের মাঝে গুলি লাগে। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। শহীদের সাথীরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও শ্বশুরের বক্তব্য

বাল্যবয়স থেকেই শহীদ বাবু মিয়া (সুরুজ) খুবই সাহসী, নম্র ও পরোপকারী ছিলেন। মানুষের বিপদাপদে সবার আগে ছুটে আসতেন। শ্বশুর নৈশ প্রহরী আব্দুল ওয়াহাব বলেন, আমার জামাই খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। প্রতিদিন দোকান থেকে বাড়ি আসার সময় আমার সাথে দেখা করে আসতো। আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। আমিও তাকে আমার ছেলের মতই ভালোবাসতাম। তার কথা মনে পড়লে হৃদয় বেদনাবিধুর হয়ে যায়। এলাকাবাসী জানান, দেশ একজন সাহসী বীর যোদ্ধা ও দেশ প্রেমিক নাগরিককে হারালো।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ সুরুজ আলী বৃদ্ধ মা, স্ত্রী ও তিন সন্তান রেখে মারা যান। তার মৃত্যুতে পরিবারের মধ্যে হাহাকার শুরু হয়। এখন তারা চিন্তিত, কিভাবে চলবেন এবং কিভাবে সংসারের খরচ চালাবেন। পরিবারের সম্পদ বলতে কিছুই নেই। তাদের আশা সমাজের বিত্তবানরা এগিয়ে আসবে। যাতে তাদের জীবনে কিছুটা আলো ফিরে আসে।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: বাবু মিয়া (সুরুজ)
জন্ম	: ০৩/১০/১৯৮৩
পিতা	: মৃত নওশের আলী
মাতা	: রাহেলা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শালদহ, ইউনিয়ন: হাটশ হরিপুর, থানা: কুষ্টিয়া সদর, জেলা: কুষ্টিয়া
বৈবাহিক অবস্থা	: বিবাহিত
স্ত্রী	: সায়মা
সন্তান	: দুই মেয়ে এক ছেলে।
পেশা	: ব্যবসায়ী
ঘটনার স্থান	: বার্মিজ গলি এন, এস রোড কুষ্টিয়া সদর থানা, কুষ্টিয়া।
আহত হওয়ার সময়কাল	: ০৫/০৮/ ২০২৪ আনুমানিক তিনটা ৩০ মিনিট থেকে চারটার মধ্যে
শাহাদাতের সময়কাল	: ০৫/ ০৮/ ২০২৪ আনুমানিক তিনটা তিরিশ থেকে চারটার মধ্যে
আঘাতের ধরণ	: পেটের মাঝামাঝি গুলি লাগে। আক্রমণকারী: পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: হাটিস হরিপুর ঈদগাহ কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. বড় মেয়েকে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া।
২. একটি দুগ্ধজাত গরু ক্রয় করে দেয়া।
৩. ছোট ছেলে ও মেয়েকে এতিম প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা।

শহীদ আব্দুল্লাহ আল মুত্তাকিন

ক্রমিক: ৪১৪

আইডি: খুলনা বিভাগ ৩০

শহীদ পরিচিতি

মা বাবার একমাত্র পুত্র সন্তান শহীদ আব্দুল্লাহ আল মুত্তাকিন। কুষ্টিয়া জেলার সদর থানার চড়থানা পাড়া গ্রামে ২৩ আগস্ট ২০১১ সালে জন্মগ্রহণ করে। কুষ্টিয়াতেই বড় হয় সে। ৬ নং পৌর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল মুত্তাকিন। বাবা জনাব লোকমান হোসেন (৫০) একজন বাবুর্চির কাজ করলেও অসুস্থতার কারণে এখন কর্মহীন। আব্দুল্লাহ আল মুত্তাকিন থাকত বাবা-মায়ের সাথে চড়থানা পাড়াতে। তিন বোনের অতি আদরের ভাই মুত্তাকিন। তিন বোনই বিবাহিত। থাকেন নিজ নিজ স্বামীর বাড়িতে।

শহীদ মুত্তাকিনের জীবনপ্রবাহ

পরিবারের আর্থিক দুর্গতিতে ৪র্থ শ্রেণীর পর তাঁর পড়াশুনা থেমে যায়। এর আগে কিছুদিন মাদ্রাসায়ও অধ্যয়ন করেছিল। বাবাকে আর্থিক সহযোগিতা দেয়ার জন্য স্যানেটারির কাজ শুরু করে। ফায়ার সার্ভিস অফিসের সামনের সড়কের পাশে বাবার চায়ের দোকান ছিল। এছাড়া বাবুর্চির কাজ করতেন জনাব লোকমান। এভাবে নানা টানাপোড়নের মধ্যেই চলতো তাঁদের সংসার ।

পূর্বের প্রেক্ষাপট

কুষ্টিয়ায় কোটা সংস্কার আন্দোলনের কর্মী ও ছাত্রলীগের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে ১৭ জুলাই দুপুরে দিকে। আন্দোলনকারীরা কোটা সংস্কারের দাবিতে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের মজমপুর গেটে অবস্থান করে। তারা সেখানে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিয়ে অবস্থান নেন। মজমপুর গেটে প্রায় এক ঘন্টা অবস্থান করে। ছাত্রলীগের একটি মিছিল মজমপুর গেটে পৌঁছালে পুলিশের অনুরোধে কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা মজমপুর গেট থেকে চৌড়হাস মোড়ে অবস্থান করে। এই ঘটনার পরে অন্যদিকে লাঠিসোঠা নিয়ে পৌরসভার ভেতরে সংগঠিত হন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। সেখান থেকে একটি মিছিল নিয়ে তারা এনএস রোড প্রদক্ষিণ করেন। বিকেল ৫টার দিকে তারা ৩০ থেকে ৪০ টা মোটরসাইকেল ও হাতে লাঠি নিয়ে চৌড়হাস মোড়ের দিকে যাত্রা করেন। এ সময় পুলিশের তিনটি ব্যারিকেট উপেক্ষা করে কোটা আন্দোলনের সমাবেশে হামলা চালায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। তারা সাউন্ড বোমা নিক্ষেপ করে আতঙ্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করে।

শহীদ হওয়ার দিন

আমজনতার উপর চালানো এ চরম নৃশংসতায় আর টিকতে পারেনি সন্ত্রাসী হাসিনা। ৫ আগস্টের গণভবনমুখী কর্মসূচী তাকে গদি ছাড়তে বাধ্য করে। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার দেশত্যাগের খবরে কুষ্টিয়ায় আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা শহরের মজমপুর গেটে বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠে। হাজার হাজার ছাত্র-জনতা কুষ্টিয়া মডেল থানা ঘিরে ফেলে। ঘটনার দিন ৫ আগস্ট সকালে সে বাবার জন্য খাবার নিয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে যায়। সেখান থেকে ফিরে ছাত্র-জনতার ভিড়ে মিশে যায়। এসময় বিজিবি ও সেনাসদস্যরা পুলিশ ও জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে পুলিশকে নিরস্ত্র হতে এবং গুলি ছোঁড়া থেকে বিরত থাকার আহবান জানায়। কিন্তু স্বৈরাচার সরকারের লেলিয়ে দেয়া ঘাতক পুলিশ গুলি ছোঁড়া বন্ধ করেনি। একপর্যায়ে পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়ে নিরস্ত্র কিশোর আব্দুল্লাহ। গুলিটি তার পাঁজর ভেদ করে অপর প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে যায়। এ সময় আরো কয়েকজন গুলিতে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেনা ও বিজিবি কর্মকর্তারা তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালাতে চালাতে থানা থেকে বের হয়ে পুলিশ লাইনে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বিজয়ের এই মুহূর্তে বেলা ২টা থেকে ৩টার মধ্যে ছয়জন নিহত হয়। আব্দুল্লাহর পরিবার সূত্রে জানা যায়, যায় আব্দুল্লাহ তিন ভাই-বোনের সংসারে বাবা-মা দুইজনই অসুস্থ ও কর্মহীন। কিশোর আব্দুল্লাহ স্যানিটারি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে পরিবারের ভরণ পোষণ চালাতেন। তার মৃত্যুতে পুরো পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে। আব্দুল্লাহর বাবার চিকিৎসার খরচ মেটাতে আর কেউই রইল না।

পরিবারের বর্তমান অবস্থা

ছেলের মৃত্যুর পর চায়ের দোকানটি বন্ধ করে দেন শহীদের বাবা। অসুস্থ শরীরটা আর কাজের জন্য সাঁয় দিচ্ছে না তাই মানবেতর জীবন যাপন করছে শহীদ মুত্তাকিনের পরিবার। জামায়াতে ইসলামী কুষ্টিয়া জেলার নেতৃবৃন্দ এবং বিএনপিসহ বিভিন্ন সুহৃদ ব্যক্তিদের আর্থিক সহযোগিতা পেলেও স্থায়ী কোনো সমাধান না হওয়ায় এ শহীদ পরিবারটি বড় অসহায়ত্বের মধ্যে আছে।

কুষ্টিয়ায় প্রথম শহীদ কিশোর আব্দুল্লাহ

বাবার চিকিৎসা খরচ মেটাতে কেউ আর রইল না

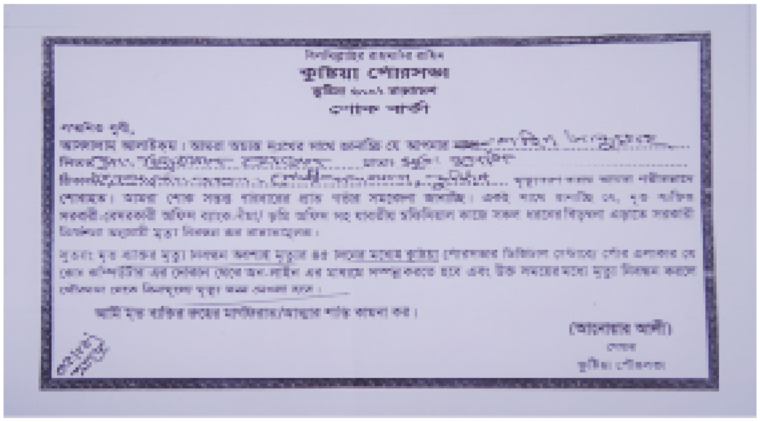

কুষ্টিয়া পৌরসভা

শোক বার্তা

আমি মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাত/আত্মার শান্তি কামনা করি।

(আনোয়ার আলী)

মেয়র

কুষ্টিয়া পৌরসভা

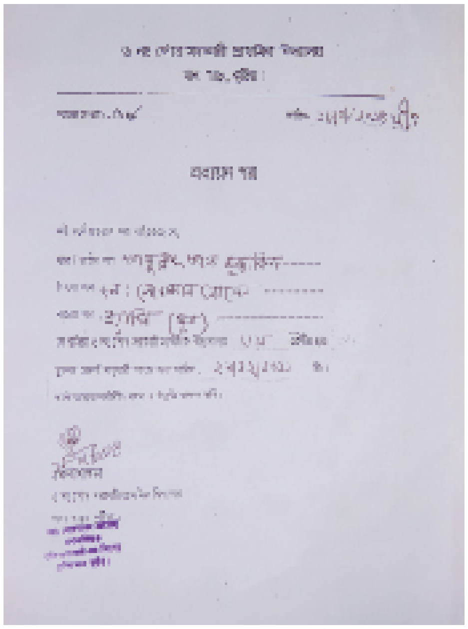

শহীদ মুত্তাকিনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নাম	: আব্দুল্লাহ আল মুত্তাকিন
জন্ম	: ২৩-১২-২০১১
পিতার নাম	: মো: লোকমান হোসেন
মাতার নাম	: মৃত হ্যাপি বেগম
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫-০৮-২০২৪
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চরথানা পাড়া, উপজেলা: কুষ্টিয়া সদর, জেলা: কুষ্টিয়া

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা।

২। শহীদের বাবার সু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

৩। স্থায়ীভাবে ব্যবসার জন্য ব্যবস্থা করা।

শহীদ ইউসুফ শেখ

ক্রমিক: ৪১৫

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৩১

শহীদ পরিচিতি

পুরো নাম মো: ইউসুফ শেখ। ১৯৫৮ সালের ১ জানুয়ারি কুষ্টিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। চাকরি করতেন কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে। তাঁর পিতা ছিলেন এমদাত আলী এবং মাতা ছিলেন মোসা: আনুমতি। পরিবার বলতে ছিল তাঁর স্ত্রী। এছাড়া একটি মেয়ে ছিল যার বিয়ে হয়ে গেছে। থাকতেন কুষ্টিয়া সদরের চড়থানা পাড়াতে। পরিবারের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

ব্যবহারিক জীবন

একমাত্র মেয়েকে বিয়ে দিয়ে নিজের কাছেই রেখেছিলেন। চরপাড়া থানা বেড়িবাঁধের পাশে বসবাস করতেন। মাত্র দুটি রুমের ভাঙা একটি ঘরে তাঁর স্ত্রী, মেয়ে, জামাই ও নাতিকে নিয়ে তিনি বসবাস করতেন। কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। শহীদ ইউসুফ শেখ জীবনের প্রায় পুরোটা সময় কাটিয়ে দিয়েছেন হাসপাতালে। ব্যক্তি হিসেবে অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন তিনি। খুব সততার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করতেন। সমভাবে পালন করার চেষ্টা করতেন ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ। নিজের কোনো রোগের জন্য নয় বরং মানুষের সেবার জন্য তিনি কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে কাটিয়েছেন। নরপিশাচ পুলিশের ছোঁড়া বুলেট তাঁর মানব সেবার কাজ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেয়।

শহীদ হওয়ার দিন

ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন একসময় রূপ নেয় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন থেকে ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতন আন্দোলনে। সারা দেশের ন্যায় কুষ্টিয়াও একদফার আন্দোলনে ফুঁসে ওঠে। হাজার হাজার ছাত্র জনতা খালি হাতে শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ৫ আগস্ট আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন যায়গা থেকে জনগণ গণভবনের উদ্দেশ্যে মিছিল বের করে। ঐ দিন তাঁর কর্মস্থল কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক থেকে বের হলে জানতে পারেন তাঁর নাতি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। নাতিকে খুঁজতে ২.৩০টার দিকে বের হন। খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সামনে সংঘর্ষের মধ্যে পড়েন। বিকাল ৩.৩০ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে শহীদ হন। মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য যিনি রক্ত নিয়ে হাসপাতালে ছোটাছুটি করতেন তাঁকেই মানুষরূপী পশুর হাতে মরতে হলো। এর চেয়ে পৈশাচিক ঘটনা কি হতে পারে! যিনি মানুষের জন্য সারাটা জীবন কাজ করলেন তার স্ত্রীকে অসহায়ভাবে জীবন যাপন করতে হচ্ছে। এলাকাবাসী সহ হাসপাতালের লোকজনেরর জন্য এটা মেনে নেয়া কষ্টকর।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

শহীদের জামাই রিক্সাচালক মো: সোহেল বলেন, "আমার শ্বশুর আমাদের সাথেই থাকতেন। তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন।" শহীদের মেয়ে সীমা খাতুন বলেন, "আমার আব্বা যে পাঞ্জাবী পরে নামাজ পড়ত, যা পরে অফিসে ডিউটি করত সবই আছে শুধু আব্বা নেই। আমি সরকারের নিকট আমার আব্বার হত্যাকারীদের সুষ্ঠু বিচার চাই।" স্বজন হারানোর তীব্র বেদনার সাথে অনিশ্চিত হয়ে গেছে তাদের ভবিষ্যত। দেশের মানুষ এ দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়াবে এমনটাই আশা করছেন শহীদ পরিবারের সদস্যরা।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: ইউসুফ শেখ
জন্ম	: ০১-০১-১৯৫৮ , কুষ্টিয়া
পিতার নাম	: মৃত এমদাত আলী
মাতার নাম	: মোসা: ভানুমতি
পেশা	: চাকুরীজীবী
কর্মস্থান	: কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫-০৮-২০২৪
ঠিকানা	: গ্রাম: চরথানা পাড়া , উপজেলা: কুষ্টিয়া সদর, জেলা: কুষ্টিয়া

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা

শহীদ মো: উসামা

ক্রমিক: ৪১৬

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৩২

শহীদ পরিচিতি

মো: উসামা শহীদি তামান্নায় উজ্জীবিত একজন তরুণ যুবক। যার স্বপ্নই ছিল ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার বাংলাদেশ থেকে বিদায় করে ইসলামের সোনালী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। নিজের জীবন আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে সে সেটা প্রমাণ করে গেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সে একজন অগ্রগামী সৈনিক। তিনি ৩রা মার্চ ২০০৮ সালে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জেলা কুষ্টিয়া সদর থানাধীন দহকুলা গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চার ভাই বোনের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন। বড় বোন সুমাইয়া খাতুন এর বিয়ে হয়ে গেছে। বড় ভাই মাহমুদুল হাসান একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন। আর ছোট ভাই খালিদ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে। বাবা স্থানীয় মসজিদের ইমাম হওয়ায় তৃতীয় সন্তান জন্ম নিলে অনেকটা শখ করে নাম রাখেন উসামা।

তার ধারণা ছিল আমার এ সন্তান একদিন সাহসী বীর পুরুষ হবে। ছোটবেলা থেকে সে অত্যন্ত সৎ, দ্বীনদার ও পরোপকারী ছিলেন। লেখা পড়ায়ও ছিল খুবই মেধাবী। সবেমাত্র দাখিল পাস করে কোয়াতুল উলুম কামিল মাদ্রাসায় আলিম শ্রেণিতে ভর্তি হন। লেখাপড়া জীবনের প্রতিটি স্তরে তিনি মেধার স্বাক্ষর রাখেন। এলাকার সামাজিক কাজ গুলি নিজে দায়িত্ব নিয়ে করতেন। কোনো দরিদ্র পরিবারের সন্তান টাকার অভাবে বিয়ে দিতে সমস্যা কথা জানালে তিনি টাকা উঠানোর ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি কুষ্টিয়ার একটি ব্লাড ব্যাংকের সদস্য ছিলেন। এলাকায় কারো ব্লাডের প্রয়োজন হলে তিনি ব্যবস্থা করে দিতেন। পারিবারিক কাজেও তিনি বাবা মাকে সহযোগিতা করতেন। তার মা অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি প্রায় দুই থেকে তিন মাস নিজে রান্না করে পরিবারের সদস্যদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি সর্বদা শহীদি তামান্না পোষণ করতেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি সমাজের এ নিদারুণ খারাপ অবস্থা তাকে সব সময় ব্যথিত করত। অন্যায়, অপরাধ, গুন্ডামি, মাস্তানি, ফ্যাসিস্ট ও স্বৈরাচারী সমাজের এ চিত্র পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতেন। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন তার সামনে আশার আলো হয়ে হাজির হলো। এলাকার ছাত্র সমাজকে সাথে নিয়ে তিনি এ আন্দোলনের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরিবারের অকুণ্ঠ সমর্থন থাকায় এ আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি সাহসী বীরের ভূমিকা রাখতে পেরেছেন। বিজয় দার প্রান্তে এসে ০৫/০৮/ ২০২৪ তারিখে আওয়ামী পুলিশ ও ছাত্রলীগের গুন্ডাবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণ ও মুহু মুহু গুলিতে বুক ঝাঁজরা হয়ে যায়। উসামা শহীদ হওয়ার সাথে সাথে উদয়মান একটি সোনালী গোলাপ পৃথিবীর বুক থেকে ঝরে পড়ল।

যেভাবে শহীদ হলেন

দেশব্যাপী অন্যায় আর বৈষম্য ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাস শিক্ষাঙ্গনসহ সকল জায়গা আষ্টে পিষ্টে বেঁধে ফেলে। পৃথিবীর কোনো ছাত্রসংগঠন এত ভয়ংকার, কুখ্যাত, নিকৃষ্ট হতে পারে সেটা কারো জানা ছিল না। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের যাবতীয় অপকর্মের পক্ষে লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে এ ছাত্রলীগকে ব্যবহার করে। ডাইনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোটা দেশকে বৈষম্য ও সন্ত্রাসের জনপদে পরিণত করে। ফলে এ সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। গড়ে তোলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। পরবর্তীতে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ যোগদান করেন। শহীদ উসামা প্রথম থেকেই এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। স্বৈরাচারী সরকারের পতনের দিন ০৫/০৮/ ২০২৪ ইং তারিখ উসামা বাসা থেকে বারোটার দিকে বের হন। কুষ্টিয়া শহরে সাদ্দাম বাজারে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ওখান থেকে ছাত্র জনতার মিছিল এন, এস রোডে পৌঁছালে পুলিশ ও সন্ত্রাসী আওয়ামলীগ আর খুনি ছাত্রলীগের নেতারা ছাত্র জনতার উপরে নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। দুঃসাহসী বীর উসামা গুলির ভয় উপেক্ষা করে মুজিব চত্বরে পৌঁছালে আওয়ামী পুলিশের টার্গেটকৃত গুলি উসামার পিঠে লাগে। গুলি পিঠের উপরে অংশে লেগে গলার ডান পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। মুহূর্তে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। শহীদের সাথী ছাত্র জনতা তাকে উদ্ধার করে মোটরসাইকেল যোগেআদ দ্বীন হাসাপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু কর্তব্যরত ডাক্তার উসামাকে মৃত ঘোষণা করেন। এভাবে ঝরে পড়ে একটি তাজা প্রাণ। উসামার নামের সাথে যুক্ত হয় শহীদ শব্দটি। বৈষম্যর বিরুদ্ধে অকাতরে জীবন উৎসর্গকারী উসামা কোটি মানুষের হৃদয়ে আলোকজ্জ্বোল হয়ে থাকবে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীর বক্তব্য

শহীদ মো: উসামা পরিবারের সকল সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী সকলের নিকট অতি প্রিয় ছিলেন। বাবা অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, আমার প্রিয় উসামা আমার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সৎ ও দ্বীনদার ছিলেন। প্রত্যেকদিন সে আন্দোলনে যেত। আমি তাকে কোনো দিন নিষেধ করিনি বরং মিছিলের অগ্রভাগে থাকতে উৎসাহিত করতাম। ০৫ তারিখ সে শহীদ হয়ে আমার বাসায় ফিরে এসেছে। উসামা শহীদ হয়েছে এতে আমি দুঃখিত নই বরং আমি শহীদের পিতা হতে পেরে গর্বিত। স্বৈরাচার হাসিনাকে হঠাতে ছেলেকে আন্দোলনে পাঠিয়েছিলাম। আল্লাহ যেন তার শাহাদাত কবুল করেন। বন্ধু মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, আমরা একজন সৎ, সাহসী, আল্লাহভীরু বন্ধুকে হারিয়ে ফেললাম।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

আল্লাহর রহমতে বাবা-মা চার ভাই বোন ৬ সদস্যের পরিবার মোটামুটি সাচ্ছলতার সাথে চলছিল। বাবা মসজিদে ইমামতি, বড় ভাইয়ের একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকুরি ও জমি জমা থেকে আয়ের একটি অংশ দিয়ে পরিবারের ব্যয় মেটাতেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে উসামা শহীদ হওয়ায় পরিবারের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। মায়ের আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। তারা দোয়া চেয়েছেন, বাবার কাঁধে সন্তানের লাশের ভার যেন আল্লাহ বহন করার তাওফিক দেন।

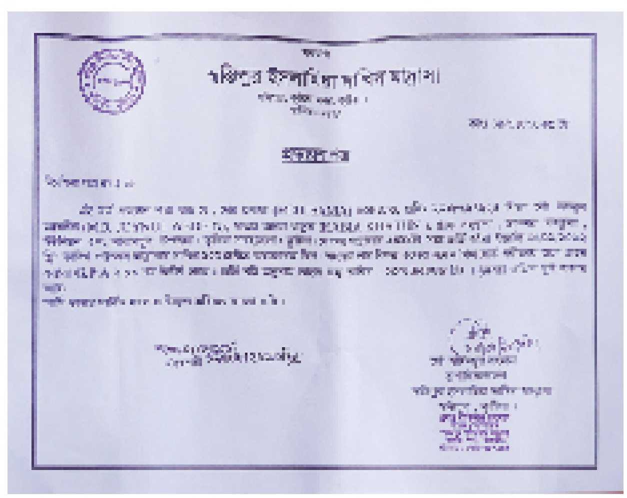

Send message...

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: উসামা
জন্ম	: ০৩/০৪/২০০৮
পিতা	: জয়নাল আবেদীন
মাতা	: রাবিয়া খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দহকুলা: ইউনিয়ন: আলমপুর, থানা: কুষ্টিয়া সদর, জেলা জেলা: কুষ্টিয়া
পেশা	: ছাত্র
ভাইবোন	: তিন ভাই এক বোন
ঘটনার স্থান	: কুষ্টিয়া সদর থানার সামনে, কুষ্টিয়া
আহত হওয়ার সময়কাল	: ০৫/০৮/২০২৪, আনুমানিক দুপুর ২.০০ থেকে ২.৩০ মিনিট
শাহাদাতের সময়কাল	: ০৫/০৮/২০২৪, ৩.০০ ঘটিকায়
আঘাতের ধরণ	: পিঠে গুলি লাগে
আক্রমণকারী	: পুলিশ ও ছাত্রলীগ
শহীদের কবরের অবস্থান	: দহকুলা দারুস সালাম কবরস্থান

পরামর্শ

১। শহীদের বৃদ্ধ বাবা-মাসহ পরিবারের খোঁজখবর নেয়া

শহীদ মোঃ আলমগীর সেখ

ক্রমিক: ৪১৭

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৩৩

জন্ম ও পরিচিতি

শহীদ আলমগীর সেখ জন্ম কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের কসবা গ্রামে। মুদি দোকানি মোঃ ইজহারুল হকের ছেলে শহীদ আলমগীর। তার মা আলেয়া খাতুন একজন গৃহিনী। তার পিতা মাতার ঘরে তিনি ছাড়াও রয়েছে আরও ৩ সন্তান। সন্তানদের মধ্যে তিনি বড়।

শহীদ আলমগীর পেশায় ছিলেন একজন ড্রাইভার। তিনি ঢাকার হেল্থ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল এর গাড়ী চালাতেন। তাঁর বাবার ব্যবসা থেকে মাসিক ১০,০০০ দশ হাজার টাকা আয় হয়। বাবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে যা আয় হয়, তার সাথে আলমগীরের আয়ের টাকা দিয়ে ছোট ভাই বোনের পড়ালেখার খরচ সহ পরিবারের খরচ চলত। শহীদ আলমগীরের স্ত্রী-সন্তান রয়েছে। বড় মেয়ে তুলি জাহান আসমার বয়স ১১ বছর। পড়াশোনা করে ৪র্থ শ্রেণীতে। ছেলে আব্দুল্লাহ আওলাদ এর বয়স ৫ বছর। ১৯ জুলাই, ২০২৪ এ দুই মেয়েকে এতিম করে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন শহীদ মোঃ আলমগীর।

ব্যক্তিগত জীবন

১৯৮৭ সালের ১৮ অক্টোবর কুস্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের কসবা গ্রামে বাবা ইজহরুল হক ও মা আলেয়া খাতুন এর কোল আলো করে পৃথিবীতে আসেন আলমগীর শেখ। তাদের অভাবের সংসারে জন্ম নেয় আরও চার ভাই। পারিবারিক দৈন্যতায় এবং ছোটো ভাইদের জীবনের পথ চলা সাবলীল করতে বেশিদুর পড়াশোনা চালাতে পারেননি আলমগীর শেখ। মাধ্যমিকের গন্ডি পেরুনোর আগেই পড়ালেখায় ইতি টানেন তিনি। যোগ দেন একটি মুদি দোকানের কর্মী হিসেবে। দীর্ঘদিন সেখানে কাজ করেন। তাঁর শৈশব কৈশর কাটে এরকম নানা পেশায় নিয়োজিত থেকে। যৌবনে পদার্পনের পর বিয়ে করে সংসারী হন আলমগীর শেখ। বিয়ের পর পারিবারিক খরচা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেশি আয়ের স্বপ্ন নিয়ে ঢাকায় পাড়ি জমান। ঢাকার রামপুরা এলাকায় অবস্থিত 'হেল্থ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল' নামের একটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে একজন ড্রাইভার হিসেবে কাজ শুরু করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেখানেই কর্মরত ছিলেন তিনি। তাঁর পাঠানো টাকাতে চলত ছোট ভাই আজাদের পড়াশোনা সহ পরিবারের অন্যান্য খরচ। আলমগীর শেখের ঘরে জন্ম নেয় একটি কন্যা ও একটি পুত্র সন্তান। তাদের নাম রাখা হয় তুলি জাহান আসমা ও আব্দুল্লাহ আওলাদ।

শাহাদাতের ঘটনার বিবরণ

দেশের কোটা সংস্কার আন্দোলন তখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ঢাকা সহ সমগ্র দেশ তখন উত্তাল। দেশে দেড় যুগ ধরে অবৈধ ভাবে ক্ষমতার মসনদে বসে থাকা আওয়ামী স্বৈরাচার সরকার আন্দোলনরত ছাত্রদের উপরে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। কোটা সংস্কারের যৌক্তিক আন্দোলনের বিপরীতে তারা কোনো প্রকার সমাধান না করে সেটি দমন করার জন্য নিষ্ঠুর নীতি অবলম্বন করে। সরকারের পেটোয়া বাহিনী তথা ছাত্রলীগ আর পুলিশের মাধ্যমে রাবার বুলেট, ছড়া গুলি, লাঠিচার্জ আর সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হলো ছাত্রদের বুক ঝাঁঝরা করতে থাকে তাজা বুলেট। ১৯ জুলাই'২৪ জুমার নামাজের শেষে নিজ কর্মস্থলে গিয়েছিলেন। ছাত্ররা আন্দোলন করছিল রামপুরাতে নিরীহ ছাত্রদের উপরে নির্বিচারে গুলি করতে থাকে পুলিশ সাথে লাঠিচার্জ তো চলছেই। প্রায় দেড় যুগ ধরে চলা আওয়ামী সন্ত্রাসবাদে আমজনতা এতটাই অতিষ্ঠ ছিল যে তাদেরকে এ ধরনের নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের পরেও দমানো যাচ্ছিল না। আন্দোলনের সময় যত গড়াচ্ছিল আন্দোলনের ভয়াবহতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এরপর হঠাৎ আকাশ থেকে গুলি বর্ষণ হতে শুরু করে। হেলিকপ্টার থেকে গুলি ছুড়লে কিছু লোক আহত হয়। শহীদ আলমগীর আন্দোলনরত আহত শিক্ষার্থীদের পানি খাওয়ানোর জন্য নিচে যায়। ফেরার পথে আনুমানিক ২.৩০ থেকে ৩.০০ টার সময় পুলিশের গুলি ডান কাঁদের নিচ দিয়ে প্রবেশ করে বুকের মধ্যে রয়ে যায়। তাঁর সাথে থাকা ছাত্র জনতা তাৎক্ষণিক একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষনা করেন।

জানাযা ও দাফন

ময়না তদন্ত ছাড়াই ২০শে জুলাই গভীর রাতে লাশ তার গ্রামের বাড়িতে পৌছানো হয়। ২১শে জুলাই শহীদের নামাযে জানাজা সামাজিকভাবে দাফন করা হয়।

যেমন ছিলেন শহীদ আলমগীর

ব্যক্তিগত জীবনে খুব উদার মানসিকতার অধিকারী ছিলেন শহীদ আলমগীর। ছোটবেলা থেকেই পরোপকারী ছিলেন তিনি। সবার প্রয়োজনে সাহায্যের হাত সর্বদা প্রশস্ত রাখতেন। তাঁর মামার বক্তব্যে একথা ফুটে ওঠে। তাঁর দূর সম্পর্কের মামা ফিরোজ জানান, "আলমগীর খুবই ভালো ছেলে ছিল। কেউ কোনো সমস্যায় পড়লে সবার আগে ছুটে যেত। তার দুটি সন্তান আমার সামনে আসলে চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনা।" তার বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা যায় আন্দোলনের সময়। আহত ছাত্রদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেয়া, ছাত্রদের জন্য পানি নিয়ে গিয়ে পান করানো সহ নানা ভাবে আন্দোলনকারীদের সাহায্য করছিলেন শহীদ আলমগীর শেখ। অন্যের সাহায্য করতে করতেই জীবন বিলিয়ে দিলেন আর রেখে গেলেন মানবতার তরে নিজকে বিসর্জন দেয়ার নজির। যুগ যুগ ধরে তার এই আত্মত্যাগ অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাবে সকল মানবসেবার ব্রত নেয়া মানুষদের।

পারিবারিক অবস্থা

পরিবারের রোজগারের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নানামুখি সঙ্কটে পরে গেছে শহীদের পরিবার। তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ভাই আজাদ জানান ভাইয়ের মৃত্যুর পর নিস্ব হয়ে পড়েছেন। সন্তানদের পড়ালেখার পুরো খরচ চালাতো বড় ভাই। ছোট দুইটি বাচ্চার প্রতিপালন নিয়ে সঙ্কায় আছেন শহীদের স্ত্রী। সন্তানদের নিয়ে স্বামীর বাড়িতেই আছেন তিনি।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: আলমগীর সেখ
জন্ম	: ১৮-১০-১৯৮৭
পেশা	: ড্রাইভার
পিতার নাম	: জনাব ইজহারুল হক
মাতার নাম	: মোছা: আলেয়া খাতুন
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই, ২০২৪
শহীদ হওয়ার স্থান	: রামপুরা
ঘাতক	: পুলিশ
আঘাতের ধরন	: গুলি
গুলিবিদ্ধের তারিখ	: ১৯-০৭-২৪
শহীদ হওয়ার তারিখ ও সময়	: ১৯-০৭-২৪, বিকাল-৩.০০
সমাধিস্থল	: নিজ গ্রামের বাড়ি
ঠিকানা	: গ্রাম: কসবা, শিলাইদহ, উপজেলা: কুমারখালী, জেলা: কুষ্টিয়া

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা
২। ছোট দুই সন্তানের জীবনধারণের এবং পড়াশোনার সমস্ত ব্যয় বহন করা
৩। শহীদের স্ত্রীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

শহীদ মো: সেলিম মন্ডল

ক্রমিক: ৪১৮

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৩৪

শহীদ পরিচিতি

মো: সেলিম মন্ডল ১৯৯৫ সালের ৫ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম জনাব মো: ওহাব মন্ডল এবং মা জনাবা মোসা: মেজিয়া খাতুন। বাবা ছিলেন চায়ের দোকানদার। সেলিম মন্ডল নিজে ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রী। কুষ্টিয়া জেলার চর জগন্নাথপুর থানার কুমারখালি গ্রামে তিনি বসবাস করতেন তাঁর পরিবারের সাথে। শহীদের পরিবারে ছিল স্ত্রী মোসা: শোভা খাতুন এবং তাঁর ৩ বছর বয়সী কন্যা হুমায়রা জান্নাত।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

দেশের কোটা সংস্কার আন্দোলন তখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ঢাকা সহ সমগ্র দেশ তখন উত্তাল। দেশে দেড় যুগ ধরে অবৈধ ভাবে ক্ষমতার মসনদে বসে থাকা আওয়ামী স্বৈরাচার সরকার আন্দোলনরত ছাত্রদের উপরে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। কোটা সংস্কারের যৌক্তিক আন্দোলনের বিপরীতে তারা কোনো প্রকার সমাধান না করে সেটি দমন করার জন্য নিষ্ঠুর নীতি অবলম্বন করে। সরকারের পেটোয়া বাহিনী তথা ছাত্রলীগ আর পুলিশের মাধ্যমে রাবার বুলেট, ছড়া গুলি, লাঠিচার্জ আর সবচেয়ে মারাত্মক বিষয়টা হলো ছাত্রদের বুক ঝাঁঝরা করতে থাকে তাজা বুলেট। ১৯ জুলাইয়ের আন্দোলন যখন একেবারেই স্বৈরাচারের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাচ্ছিলো তখন তারা সারাদেশে কারফিউ ঘোষনা করে। কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতা রাজপথ ছাড়তে নারাজ। তাই কারফিউ ঘোষনা হলেও কিছু যায়গায় তখনো চলছিল আন্দোলন।

২০ জুলাই কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালীন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে পুলিশ ও ছাত্রজনতার মাঝে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। পুলিশ এক পর্যায়ে শিমরাইল মোড়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে হাবিবুল্লাহ কাচপুরী মার্কেটের ১০ তলা ভবনের ৭ম তলায় শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশের কার্যালয়ে আশ্রয় নেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে কিছু সংখ্যক লোক ভবনটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। একই ভবনের ৩য় তলায় ডাচ্ বাংলা ব্যাংকে ফার্নিচার মিস্ত্রি আবদুস সালাম সহ আরও কিছু শ্রমিক ডেকোরেশনের কাজ করছিলেন। অনেকেই বের হলেও তিনি সহ কয়েকজন বের হতে পারেননি। সেই আগুনে দগ্ধ হয় তাঁর লালিত স্বপ্নগুলো। স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে হাসিখুশিতে চলতে থাকা ফুলের মত জীবনটি শেষ হয়ে যায় সেখানেই। পুড়ে মারা যান তিনি। ছোট্ট হুমায়রা বাবা ডাকটিও সেই লেলিহান আগুনের শিখায় পুড়ে যায়। তিন দিন পরে ফায়ার সার্ভিস লাশ উদ্ধার করে। পরিবারের লোকজন কুষ্টিয়ায় তার গ্রামের বাড়িতে দাফনের ব্যবস্থা করেন।

শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য

অত্যন্ত নম্র-ভদ্র একজন মানুষ ছিলেন শহীদ সেলিম মণ্ডল। বড়দের সম্মান আর ছোটোদের স্নেহ করাই ছিল তার চরিত্র। নিজের কাজ আর পরিবার নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন তিনি। শহীদের চাচা শ্বশুর শরিফুল ইসলাম বলেন, "আমার বাড়ী তার বাড়ী খুব বেশি দূরে না। ছোটবেলা থেকেই তাকে আমি চিনি। সে মানুষের দিকে মুখ তুলে কখনো কথা বলতেন না। সবসময় নিচু স্বরে কথা বলতেন। অনেক নম্র ভদ্র ছিল। তার এ বিষয়গুলোর জন্য সবার মনে সে স্থান করে নিয়েছিল। এলাকার সবাই তাকে খুব ভালোবাসত।"

শহীদ পরিবারের বর্তমান অবস্থা

একমাত্র উপার্জনক্ষম মো: সেলিম মন্ডলের মৃত্যুতে শহীদের স্ত্রী মোসা: শোভা খাতুন বর্তমানে নিঃস্ব জীবন যাপন করছেন। মেয়ে ও নিজের ভবিষ্যত নিয়ে শংকায় দিন পার করছেন তিনি। বর্তমানে স্বামীর বাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে বসবাস করছেন।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: সেলিম মন্ডল
জন্ম	: ১৯৯৫ সালের ৫ এপ্রিল, কুষ্টিয়া
পিতার নাম	: জনাব মো: ওহাব মন্ডল
মাতার নাম	: মোসা: রেজিয়া খাতুন
পেশা	: কাঠমিস্ত্রী
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২০ জুলাই, ২০২৪
ঠিকানা	: গ্রাম: কুমারখালি, উপজেলা: চর জগন্নাথপুর, জেলা: কুষ্টিয়া

পরামর্শ

১। পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা

২। ছোট কন্যা সন্তানের ভবিষ্যতের ভরণপোষণ নিশ্চিত করা

৩। শহীদের বাবার স্থায়ী ব্যবসা করার ব্যবস্থা করা

শহীদ আব্দুস সালাম

ক্রমিক: ৪১৯

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৩৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আব্দুস সালাম, ১৫ জানুয়ারি ২০০০ সালে কুষ্টিয়ার চর জগন্নাথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, একজন সাধারণ কিন্তু সংগ্রামী দিনমজুর। তাঁর পিতার নাম সাবের বিশ্বাস, যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, ফলে আব্দুস সালামকে পরিবারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে। তাঁর মা মোছাঃ কুলজান খাতুন, ৬২ বছর বয়সী, গৃহিণী। স্ত্রী মোছাঃ মারিয়া খাতুন সন্তান ও পরিবারের দেখাশোনায় ব্যস্ত থাকেন। আব্দুস সালাম একটি ১৬ মাসের সন্তানের পিতা, যার জন্য তিনি শ্রমের মাধ্যমে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার চেষ্টা করতেন।

শহীদ আব্দুস সালাম স্থানীয় একটি ফার্নিচারের দোকানে দিনমজুরের কাজ করতেন। দিনরাত পরিশ্রম করে তিনি পরিবারকে সহায়তা করতেন এবং ছোট্ট ছেলের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। তার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা স্থানীয় সমাজে তাঁকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল।

আব্দুস সালামের আত্মত্যাগের স্মৃতি চিরকাল আমাদের মনে রবে, এবং তিনি হয়ে উঠবেন সংগ্রামের একটি প্রতীক। শহীদ আব্দুস সালামের জীবন ও মৃত্যু আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সমাজের জন্য আত্মত্যাগের মহত্ব কিভাবে একজন সাধারণ মানুষের জীবনকে অসাধারণ করে তুলতে পারে। তাঁর আত্মত্যাগ চিরকাল আমাদের অনুপ্রাণিত করবে এবং আমাদের মধ্যে সংহতি ও মানবতার চেতনা জাগ্রত রাখবে। শহীদ আব্দুস সালামের স্মৃতি আমাদের সকলের হৃদয়ে একটি চিরস্থায়ী স্থান দখল করে থাকবে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে জনগণ নানান অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমের নির্মম ভুক্তভোগী। এদেশের মুক্তিকামী জনতা সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে এসেছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই সাথে হুংকার দিয়ে সংগ্রামী জনতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ছাত্রবৃন্দ। উপরন্তু গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সাক্ষী, দেশের ক্রান্তিকালে বরাবরই ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে।

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতিন, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ সালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয় । আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, জঙ্গই সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুথানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত মুক্তিকামী জনতা।

যেভাবে শহীদ হন

ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। গোটা দেশে যখন আন্দোলন ফুঁসে উঠে, একই দাবিতে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা খালি হাতে ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জেও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

২০ জুলাই কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালীন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে পুলিশ ও ছাত্র-জনতার মাঝে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। পুলিশ এক পর্যায়ে শিমরাইল মোড়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে হাবিবুল্লাহ কাচপুরী মার্কেটের ১০ তলা ভবনের ৭ম তলায় শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশের কার্যালয়ে আশ্রয় নেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আওয়ামী সন্ত্রাস বাহিনীরা ভবনটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। একই ভবনের ৩য় তলায় ডাচ বাংলা ব্যাংকে ফার্নিচার মিস্ত্রি আবদুস সালাম সহ আরও কিছু শ্রমিক ডেকোরেশনের কাজ করছিলেন। অনেকেই বের হলেও তিনি সহ কয়েকজন বের হতে পারেননি। সেই আগুনে পুড়ে মারা যান তিনি। তিন দিন পর ফায়ার সার্ভিস লাশ উদ্ধার করলে পরিবারের লোকজন কুষ্টিয়ায় তার গ্রামের বাড়িতে দাফনের ব্যবস্থা করেন।

> এভাবেই এতিম হয়ে যায় অবুঝ শিশু মাহিম।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য/অনুভূতি

শহীদ মোঃ আব্দুস সালামের প্রতিবেশী জনাব আকবর আলী মৃধা বলেন, ওরা দুই ভাই গ্রামের মধ্যে ভালো মানুষ। যে শহীদ হয়েছেন ঢাকা থেকে আসলেই ওর সাথে আমার অনেক রসিকতা হতো। বাড়ির সাথেই বাড়ি; সব সময় হাসাহাসি তামাশা করতাম, তার কথা খুব মনে পড়ে।

শহীদ পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

শহীদ আব্দুস সালাম ১৬ মাসের ছেলে সন্তানকে রেখে দুনিয়ার সফর শেষ করেন। তার বাড়ি প্রত্যন্ত অঞ্চল কুষ্টিয়ার কুমারখালী

উপজেলার চর জগন্নাথপুর এলাকায়। তিনি রিযিকের সন্ধানে ঢাকায় এসেছিলেন। একটি কার্পিচারের দোকানে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন। তিনি মারা যাওয়ার আড়াই মাস আগে তার বাবা মারা যান।

শহীদ আব্দুস সালাম তার মা, ভাই এর সাথে স্ত্রী ও ছেলে সন্তান সন্তানসহ নিজ বাড়িতে বসবাস করতেন। আর্থিক কোনো আয় না থাকায় বর্তমানে তার সন্তানকে নিয়ে স্ত্রী বাবার বাড়ি অবস্থান করছেন। স্ত্রী নিস্ব অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন।

পরিবারটির সহযোগিতা প্রসঙ্গে

প্রস্তাবনা-১: বাচ্চার জন্য মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।

প্রস্তাবনা-২: বিধবা স্ত্রীর জন্য সেলাই মেশিন ক্রয় করে দেয়া।

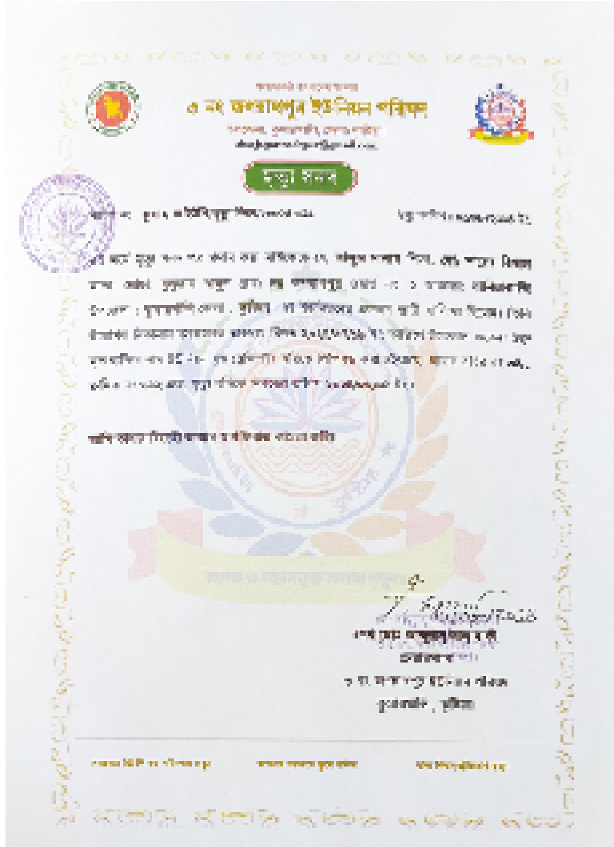

মৃত্যু সনদ

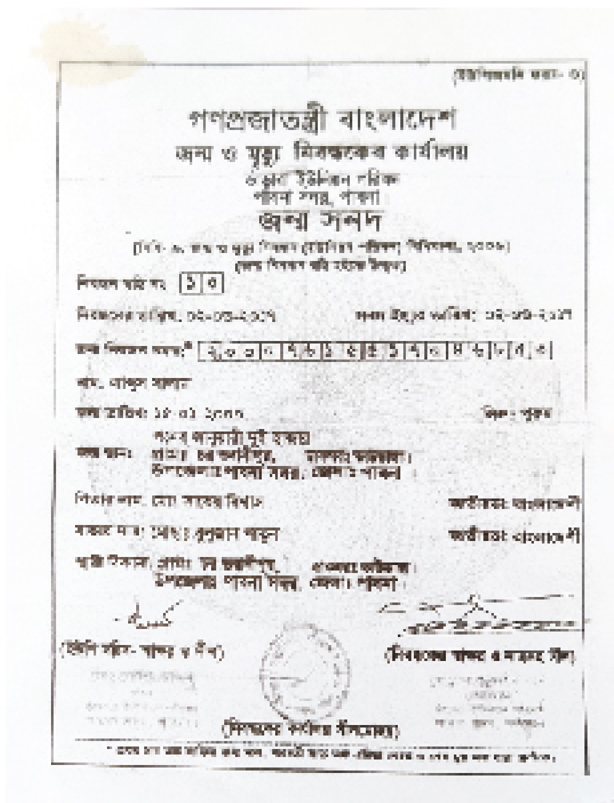

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

জন্ম সনদ

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

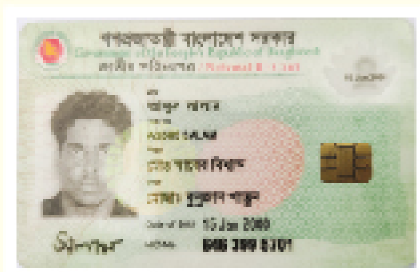

শহীদের পূর্ণনাম	: আব্দুস সালাম
জন্ম তারিখ	: ১৫-০১-২০০০
পেশা বা পদবী	: কার্পেটের দোকানে দিন মজুরের কাজ করতেন
পিতার নাম	: মৃত সাবের বিশ্বাস
পিতার পেশা ও বয়স	: মৃত
মাতার নাম	: মোসা: কুলসুম খাতুন
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৬২ বছর
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ২ জন
সন্তান	: এক ছেলে; ১৬ মাস বয়সী
স্ত্রী	: মোসা: মারিয়া খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: চর জগন্নাথপুর, ইউনিয়ন: জগন্নাথপুর, উপজেলা: কুমারখালি, জেলা: কুষ্টিয়া
ঘটনার স্থান	: শিমরাইল, সিদ্ধিরগঞ্জ, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, ১০ তলা ভবন
আঘাতকারী	: আওয়ামী সন্ত্রাস বাহিনী
আহত হওয়ার সময়কাল	: ২০ জুলাই, ২০২৪, বিকাল ৪.৩০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ২০ জুলাই, ২০২৪, বিকাল ৪.৩০টা; শিমরাইল, সিদ্ধিরগঞ্জ, ঢাকা, চট্টগ্রাম মহাসড়ক, ১০ তলা ভবন

শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান (জিপিএস লোকেশনসহ) : পোড়াগোলা, ঢাকা চর ভবানীপুর কবরস্থান; 23.89028N 89.299642

"স্কুলের সবাই যাচ্ছে, আমি কি ঘরে বসে থাকতে পারি? প্রয়োজনে আমি শহীদ হব।"

শহীদ মোঃ মাহিম হোসেন

ক্রমিক: ৪২০
আইডি: খুলনা বিভাগ ০৩৬

শহীদ পরিচিতি

মোঃ মাহিম হোসেন ৩০ অক্টোবর ২০০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার বেতবাড়িয়া ইউনিয়নের বামন পাড়া গ্রামের ইব্রাহিম হোসেনের বড় ছেলে মাহিম। চাঁদট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র মাহিম ছোটবেলা থেকেই অনেক মেধাবী ও দূরন্ত ছিলেন। বিভিন্ন খেলাধুলায় পারদর্শী মাহিম ফুটবল খেলায়ও বেশ পারদর্শী ছিলেন। পরিবারের বড় সন্তান হওয়ায় তিনি চাচা, ফুফু সবার আদরে বড় হয়েছেন। তাকে ঘিরে বাবার অনেক স্বপ্ন ছিল। সে বড় চাকুরী করবে তাদের দুঃখের দিন ঘুচবে। কিন্তু এক নিমিষেই তার বাবার সব আশা শেষ হয়ে যায়।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালে জুলাই মাসে বাংলাদেশে সংগঠিত বৈষম্যবিরোধি ছাত্র জনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বেশ কয়েকটি মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। প্রথমত, শিক্ষা ব্যবস্থার অসমতা ও বৈষম্য: দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার মান ও সুযোগ-সুবিধার মধ্যে যে বিশাল ফারাক রয়েছে, তা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছিল। সরকারি কলেজগুলোর অব্যবস্থাপনা এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাণিজ্যিকীকরণ শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্যা তৈরি করেছে।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক বৈষম্য: বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে উঁচু শ্রেণির ও নিম্ন শ্রেণির মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে। চাকরি, পেশা ও অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে চাপ ও অস্থিরতা বেড়ে গেছে। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক পরিবেশ: সরকারের দমন-পীড়ন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অভাব এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর ওপর নজরদারি এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। ছাত্রদের মধ্যে ন্যায্যতার দাবি এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াস আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করেছে।

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতির, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার আগ্নেয়গিরি। তাই ২০২৪ তালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয় । আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, র‍্যাব সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসীস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিস্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

আন্দোলনে যোগদান

বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে জনগণ নানান অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমের নির্মম ভুক্তভোগী। এদেশের মুক্তিকামী জনতা সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে এহেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই সাথে হুংকার দিয়ে সংগ্রামী জনতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ছাত্রবৃন্দ। উপরন্তু গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সাক্ষী, দেশের ক্রান্তিকালে বরাবরই ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে। জুলাই ২০২৪ এ সংগঠিত ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন একসময় রূপ নেয় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পর্যায়ক্রমে শুরুহয় ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতন আন্দোলন। সারা দেশের ন্যায় কুষ্টিয়াও স্বৈরাচারী খুনি হাসিনা সরকার পতনের একদফার আন্দোলনে ফুঁসে ওঠে। হাজার হাজার ছাত্র জনতা খালি হাতে শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সে আন্দোলনে শহীদ মাহিমও দলবল নিয়ে অংশগ্রহন করেন; বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলে নেতৃত্ব দিতে থাকেন।

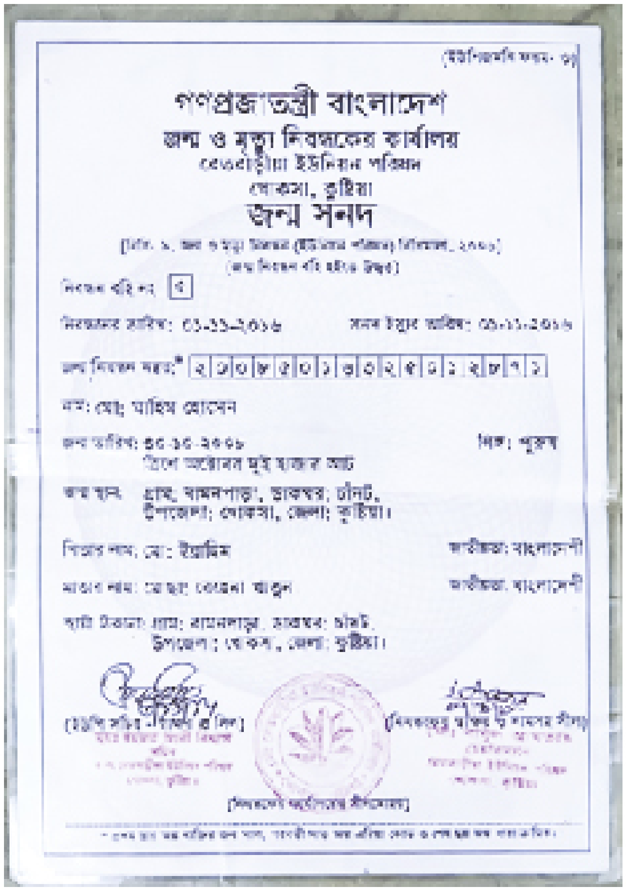
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
ইউনিয়ন পরিষদ
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া
জন্ম সনদ

নাম: মোঃ মাহিম হোসেন
জন্ম তারিখ: ১৫-১০-২০০৮
পনেরো অক্টোবর দুই হাজার আট
লিঙ্গ: পুরুষ
পিতার নাম: মোঃ ইব্রাহিম
জাতীয়তা: বাংলাদেশী
জাতীয়তা: বাংলাদেশী

শাহাদাত বরণ

৫ আগস্ট আন্দোলনে যাওয়ার সময় তার মা তাকে আন্দোলনে যেতে বার বার নিষেধ করেছিলেন। পরম শ্রদ্ধেয় মমতাময়ী মায়ের নিষেধ উপেক্ষা করে মাহিম বলেছিলেন, "স্কুলের সবাই যাচ্ছে, আমি কি ঘরে বসে থাকতে পারি? আমি প্রয়োজনে শহীদ হব"। একথা বলে তিনি মিছিলে যোগ দিতে উপজেলা সদরে চলে যান। সেদিন প্রিয় সন্তানের অমূল্য প্রাণ সংশয়ের কথা ভেবে ফ্যাসিস্ট সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুকের মানিকের এমন দেদীপ্ত হুংকার হৃদয়ের মণিকোঠায় গর্বের সঞ্চার করে। পথিমধ্যে মাহিম ও তার দল ঘাতক পুলিশের বাধার মুখে পড়ে। পুলিশের বাধার মুখে বন্ধুদের রেখে কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে বাসে উঠেন। পাশের উপজেলা কুমারখালীতে গিয়ে বাস থেকে নেমে সেখানেই আন্দোলনে যোগ দেন। এসময় তিনি পুলিশের ছোঁড়া মুহুর্মুহু কাঁদানে গ্যাসের মধ্যে পড়েন। অকস্মাৎ এমন পরিস্থিতিতে তিনি গুরুতর আহত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে সদর এলাকা ছাত্র জনতা ও ঘাতক পুলিশ, আওয়ামী সন্ত্রাসীদের ত্রিমুখী সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে গুরুতর আহত মাহিমকে উদ্ধার করা খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে। কঠিন প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা স্থানীয় কয়েকজন নারী তাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে নিরাপদে বাড়িতে ফেরার ব্যবস্থা করেন। বাড়িতে আসার পর তার শরীর ও মুখে জ্বালা যন্ত্রণা আরও বাড়তে থাকে। ১৭ আগস্ট তিনি সকাল থেকে প্রচণ্ড জ্বর ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হন। ১৯ তারিখ শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরদিন সকাল ৭.০০ টায় মারা যায়। শহীদ মাহিম হোসেনের মরদেহ বিকেলে গ্রামের বাড়ি পৌঁছালে বাড়ির পাশে ইয়াকুব আহমদ হাই স্কুলে জানাজা শেষে চাঁদট কবরস্থানে তাঁকে চির নিদ্রায় শায়িত করা হয়।

বন্ধ হয়ে যায় সকল চাওয়া, সকল আবদার। আর কেউ বলবে না আমাকে খেলার বল কিনে দাও। বাবা মা হারালেন কিশোর বয়সী এই দূরন্ত ছেলেকে।

পারিবারিক অবস্থা

মাহিম হোসেনের বাবা টাইলস মিস্ত্রীর কাজ করেন। এ কাজ করেই সংসারের খরচ ও সন্তানের পড়ালেখা খরচ চালাতেন। নিজস্ব জমি না থাকায় সরকারের গৃহায়ন প্রকল্পের অধীনে একটি সরকারী ঘরে থাকেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

শহীদের চাচা চাঁদ আলী মোল্লা বলেন, "সে অনেক মেধাবী ছিল। আমার অজ্ঞাতেই সে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে।" মাহিমের ফুফু মোসাঃ হালিমা খাতুন বলেন, "মাহিমকে আমরা কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। বিভিন্ন সময় আমাদের কাছে অনেক কিছু আবদার করেছে। অনেক সময় আবদার পূরণ করতে পেরেছি আবার অনেক সময় পারিনি। তাকে হারিয়ে আমরা অনেক শূণ্যতা অনুভব করছি। এ শূণ্যতা পূরণ করা অসম্ভব।"

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: মাহিম হোসেন
জন্ম	: ৩০-১০-২০০৮
পিতা	: মো: ইব্রাহিম, টাইলস মিস্ত্রি-৪২ বছর
মাতা	: মোসা: রেহেনা খাতুন, গৃহিনী-৩৬ বছর
পেশা	: স্যানেটারি দোকানে কাজ করতেন
শিক্ষা	: ছাত্র, দশম শ্রেণি, চাঁদট মাধ্যমিক বিদ্যালয়
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বামন পাড়া, ইউনিয়ন: বেতবাড়িয়া, থানা: খোকসা, জেলা: কুষ্টিয়া
আহত হওয়ার সময়	: ০৪ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর ১২.৩০টা
ঘটনার স্থান	: কুমার খালি বাস স্ট্যান্ড, কুষ্টিয়া
শাহাদাত	: ২০ আগস্ট, ২০২৪, সকাল ৭.০০টা, কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী সরকারে যাত্রাবাড়ীর ঘাতক পুলিশ বাহিনী (কাঁদানে গ্যাস)
কবরস্থান	: চাঁদট গোরস্থান
সহোদর	: নাঈম, ১২ বছর, বামন পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫ম শ্রেণি
	: নিয়ামুল, ৮ বছর, বামন পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২য় শ্রেণি

পরামর্শ

১। একটি দুগ্ধজাত গাভী ক্রয় করে দেয়া যেতে পারে
২। ছোট ভাইদের পড়ালেখার সম্পূর্ণ খরচের ব্যবস্থা করা
৩। এককালীন অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা

শহীদ মোঃ জামাল উদ্দীন শেখ

ক্রমিক: ৪২১

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৩৭

“বাবা, আমি যদি শহীদ হয়ে যাই
আমাকে দাদার কবরের পাশে কবর দিও”

জন্ম ও পরিচিতি

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ভাড়রা গ্রামের মৃত আজগর আলী শেখের ছেলে তিন সন্তানের জনক জামালউদ্দীন শেখ। তিনি ১০ অক্টোবর ১৯৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় একজন গার্মেন্টস কর্মী ছিলেন। তাঁর মাতা মোছা: রুপজান; ৭০ বছর বয়সী গৃহিণী।

পারিবারিক জীবন

শহীদ মো: জামালুদ্দিন শেখ এর দুই ছেলে বিবাহ করে নিজ নিজ পরিবারসহ আলাদা জীবনযাপন করতেন। ছোট ছেলে মো: রাব্বি শেখ এনাম স্কুল এন্ড কলেজের ১ম শ্রেনিতে অধ্যয়ন করে। অভাব অনটনের কারণে ছোট সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে দুই থেকে আড়াই বছর আগে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকার সাভারে এনাম মেডিকেলের পাশেই ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। শুরুতে তিনি ইটভাটায় চাকরি করতেন। এরপর কুলফি আইসক্রিম বিক্রি করে সংসারের খরচ চালাতে না পেরে শহীদ হওয়ার আগের মাসে তিনি পাকিজা গার্মেন্টসে চাকরী নেন। স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে তিনি ভালোই দিন পার করছিলেন। যেদিন শহীদ হন, ৫ আগস্ট সকালে খাওয়ার সময় স্ত্রীর সাথে অনেক গল্প হয়।

আন্দোলনের পটভূমি

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতিন, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ সালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয় । আন্দোলনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসীস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

যেভাবে শহীদ হন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলনে সারা দেশের ন্যায় সাভারেও উত্তাল হয়ে উঠে। ৫ আগস্ট সকাল থেকেই কারফিউ উপেক্ষা করে ছাত্রজনতা সাভারের বিভিন্ন পয়েন্টে বিক্ষোভ করে। এই পরিস্থিতিতে দুপুরের দিকে ছেলেকে বাসায় এবং আশেপাশে না পেয়ে তাকে খুঁজতে বাসা থেকে বের হন তিনি। জামাল শেখ সরাসরি সম্মুখ সমরে অংশ নিতে না পারলেও মুক্তিকামী মনোবল ছিল তেজোদ্দীপ্ত ।সাভার মুক্তির মোড় চেয়ারম্যান বাড়ির পাশে ছোট ছেলেকে খোঁজাখুঁজির সময় তিনি আন্দোলনরত ছাত্র জনতার সাথে মিশে যান। আন্দোলনের তীব্রতায় বিকেল তিনটায় স্বৈরাচারী

শেখ হাসিনা সরকারের পতন হলে আন্দোলনরত জনতা আনন্দ মিছিল করতে শুরু করে। এই বিজয় মিছিলেও ফ্যাসিস্ট সরকারের ঘাতক পুলিশ ছাত্রজনতার উপরে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। বিকাল ৪.৩০-৫.০০ টার দিকে দুর্ভাগ্যবশত দুটি বুলেট জামালউদ্দীনের শরীরে লাগে; একটি বুকে এবং অন্যটি পায়ের হাঁটুর উপর। সাথে সাথে স্থানীয়রা উদ্ধার করে এনাম মেডিকেল নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। খবর পেয়ে রাতেই স্বজনরা তার লাশ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসেন। ময়না তদন্ত ছাড়াই ৬ আগস্ট সকালে স্থানীয় ভাড়রা পূর্ব পাড়া জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে দাফন করেন।

ভাগ্যের এমন নির্মম পরিহাসে শহীদের পরিবারের সদস্যরা গভীর শোকে আচ্ছন্ন। এই নিরীহ পিতার মৃত্যু কেবল তার পরিবারের জন্য নয়, সমাজের জন্যও একটি বড় ক্ষতি।

শহীদ সম্পর্কে স্বজনদের বক্তব্য

মন্টু আলী শেখ শহীদের চাচাত ভাই বলেন, ভাই অনেক ভালো মানুষ ছিল। উনি সবসময় সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। কারও সাথে বিবাদ করে নাই। এগুলো সে অপছন্দ করত।

বাবাকে হারিয়ে বড় ছেলে রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'পুলিশ কেন আমার বাবাকে মারল। বাবা হত্যার বিচার চাই।'

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: জামাল উদ্দীন শেখ
জন্ম	: ১০-১০-১৯৮৩
পিতা	: আজগর আলী শেখ, মৃত
মাতা	: মোছা: রুপজান, গৃহিনী-৭০ বছর
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ভাড়রা, ইউনিয়ন: চাপড়া, থানা: কুমার খালি, জেলা: কুষ্টিয়া
আহত হওয়ার সময়	: ০৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৪.৩০টা
ঘটনার স্থান	: চেয়ারম্যান বাড়ির পাশে, সাভার মুক্তির মোড়, ঢাকা
মৃত্যুর তারিখ	: ০৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৫.০০ টা, সাভার মুক্তির মোড়, ঢাকা
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী সরকারে যাত্রাবাড়ীর ঘাতক পুলিশ বাহিনী
কবরস্থান	: ভাড়রা পূর্ব পাড়া জান্নাতুল বাকী কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১। ছোট সন্তানকে ইয়াতিম প্রতিপালন প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা
২। এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা

শহীদ মোঃ বাবলু ফরাজী

ক্রমিক: ৪২২

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৩৮

জন্ম ও পরিচিতি

সদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিলেন শহীদ মোঃ বাবুল ফরাজী। তিনি ৪ জুলাই ১৯৬৬ সালে কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৃত নওশের আলী এবং মাতা মৃত মোছাঃ বুড়ী খাতুন। একজন সৎ, আদর্শবান মানুষ হিসেবে এলাকায় তাঁর বেশ সুনাম রয়েছে। কর্মঠ বাবুল নানা সামাজিক কাজে সবসময় ছিলেন অগ্রসরমান। দায়িত্ববান ব্যক্তি হিসেবেও তিনি ছিলেন বেশ সুপরিচিত।

পারিবারিক অবস্থা

সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলির সন্তান ছিলেন শহীদ বাবলু ফরাজী। তার পরিবারের সদস্যদের সাথে একান্তে কথা বলে জানা যায় বর্তমানে পরিবারের আর্থিক অবস্থা একেবারেই নাজুক, যার কারণে তিনি ফেরি করে কাপড় বিক্রি করতেন।

শহীদ বাবলু ফরাজীর স্ত্রী জটিল রোগে আক্রান্ত এবং ছেলে কিডনী রোগে আক্রান্ত। তাঁর ৩০ বছর বয়সী ছেলে সুজন মাহমুদ বর্তমানে বেকার। অর্থাভাবে সুচিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছেনা। পরিবারটি হটশ হরিপুর, কুষ্টিয়ায় নিজ বাড়িতে অবস্থান করছেন। তাঁর মেয়ে মোছাঃ হেলেনা বিবাহিত এবং গৃহিণী।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে জনগণ নানান অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমের নির্মম ভুক্তভোগী। এদেশের মুক্তিকামী জনতা সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে এহেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই সাথে হুংকার দিয়ে সংগ্রামী জনতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ছাত্রবৃন্দ। উপরন্তু গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সাক্ষী, দেশের ক্রান্তিকালে বরাবরই ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে।

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতিন, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ সালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয়। আন্দোলনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, জনই সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে নেমে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

আন্দোলনে যোগদান

বাংলাদেশ নামক গাড়িটা যখন এমনভাবে ব্রেক ফেইল করলো আর বাংলাদেশী নামক যাত্রীরা যখন আতঙ্কিত; চারদিকে যখন কষ্ট, বেদনা, চিৎকার, আহাজারি আর নিশ্চিত ধ্বংসের সুস্পষ্ট লক্ষণ, তখন শহীদ বাবুল ফরাজীর মত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ব্যক্তি কি বসে থাকতে পারেন? তাঁর হৃদয়ে কি দাগ কাটতে পারেনা? পারিবারিক নানা টানাপোড়নে থাকলেও রাষ্ট্রযন্ত্রের এমন বর্বরতা দেখে সমাজ সচেতন একজন বাবুলের মনেও আঁচড় কাটতে পারে। কেননা সবকিছু তো তার সামনেই ঘটছে। তিনি নিজের কানেই শুনছেন মানুষের নিদারুণ আর্তনাদ; ব্যথিত মনের হাহাকার। নিজের চোখে দেখছেন কিভাবে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে শাসক নামধারী শোষক গোষ্ঠী। নিজের নাতি নাতনি তুল্য আহত, নিহত শিক্ষার্থীদের নিজের সামনে যখন নির্মমভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখছেন, তখন কি তার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে না? তিনিও তো রক্তে মাংসে গড়া একজন মানুষ। তাঁর মনেও প্রশ্ন জেগেছিল। তিনি ভাবতেন, এই দেশ কি আমার? এখানে আমার আর আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ কি? আমাদের নিরাপত্তা কোথায়? আমরা কি আসলেই বেঁচে আছি? নাকি জীবন্ত লাশ? আমরাও কি আহত, নিহত শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যদের মতো বিমূর্ত হয়ে বেঁচে আছি? নাকি বাংলাদেশ নামক আয়নাঘরে গুম হয়ে প্রতিনিয়ত গোলামী করে যাচ্ছি কোনো এক নব্য ফেরাউনের?

এরকম শত সহস্র প্রশ্ন জেগে উঠতো জনাব বাবুল ফরাজীর হৃদয়ে। কোনো উত্তরই তিনি খুঁজে পেতেন না। আর যখন খুঁজে পেলেন, তখন নিজেকে তিনি আবিষ্কার করলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের পাশেই।

শাহাদাতের অমীয় সুধা পান

প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর- যিনি অন্যায়কে কখনো বরদাস্ত করেন না, তিনি হলেন মোঃ বাবলু ফরাজী। অভাব অনটনের সংসারে তিনি ফেরি করে কাপড় বিক্রির মাধ্যমে খরচ চালাতেন। মাস কয়েক আগে

রাজশাহীতে তাঁর স্ত্রীকে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন। ডাক্তার অপারেশন করানোর কথা বললেও টাকার অভাবে ২য় বার আর ডাক্তারের নিকট নিতে পারেন নি। এদিকে তাঁর ছেলে বেশ কিছু বছর যাবৎ কিডনি জনিত সমস্যায় ভুগছেন । আর্থিকভাবে খুবই কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে সময় পার করছিলেন। পরিবারের অভাব থাকলেও সহজে কাউকে তিনি বুঝতে দিতেন না। যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন তখন পরিবারের খরচ চালানোর মতো মাত্র ৩ হাজার টাকা ছিল।

“আমি যুদ্ধে যাব শহীদ হব”

ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন একসময় রূপ নেয় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন থেকে স্বৈরশাসক খুনি হাসিনার পতন আন্দোলনে। সারা দেশের ন্যায় কুষ্টিয়ায়ও ‘এক দফা এক দাবি’ আন্দোলনে ফুঁসে ওঠে। অন্যান্য দিনের মতো ৫ আগস্টেও হাজার হাজার ছাত্র জনতা খালি হাতে শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে বিক্ষোভ করতে থাকে। শহীদ বাবলু ফরাজী মুক্তিকামী মানুষের সাথে শুরু থেকেই আন্দোলনে যোগদান করে আসছিলেন। সেদিনও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

যেদিন শহীদ হবেন তার দুই দিন আগ থেকেই বলে আসছিলেন, “আমি যুদ্ধে যাব, শহীদ হব।” ৫ আগস্ট সকালে ভাত খেয়ে কাউকে না জানিয়ে কুষ্টিয়া শহরের চার রাস্তার মোড়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। স্ত্রী তাকে বাড়িতে না পেয়ে ফোন দিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে বললে শহীদ বলেন, “আমি যুদ্ধে আছি, খালি হাতে আসিনি, লাঠি হাতে নিয়ে এসেছি, আমি যুদ্ধ করব।” তার নাতনি ও তাকে আসতে বললে, তিনি একই উত্তর দেন। নাতনি রসিকতা করে বলে, “নানী তোমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।” তিনি জবাবে বলেন, “আমি আর বাড়িতে যাব না।”

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলনে শহীদ বাবলু ফরাজি ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে কুষ্টিয়া শহরের চার রাস্তার মোড়ের লিয়াকত মিষ্টান্ন ভান্ডারের পাশে হাইস্কুল মাঠের গলিতে অবস্থান নেন। অবস্থানরত ছাত্রজনতার উপর শোষক খুনি সরকারের লেলিয়ে দেয়া ঘাতক বাহিনীর এস আই সাবের আলীর নেতৃত্বে পুলিশের আলফা টিম নির্বিচারে গুলি করতে থাকে। মুহূর্তেই গোটা এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সেসময় আনুমানিক বিকাল ৩.০০-৩.১৫ মিনিটে বাবলু ফরাজী গুলিবিদ্ধ হয়। সাথে সাথে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। একটি গুলি তার মাথার বাম পাশ দিয়ে ঢুকে ডান পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। বিপ্লবী বাবলুর রক্তাক্ত নিথর দেহ পড়ে থাকে। শহীদের রক্তে রাজপথ রূপ নেয় এক রক্তগঙ্গায়। কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আন্দোলনরত জনতা ৩.২০ মিনিটে তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায় এবং তাকে ১০ নং ওয়ার্ডে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসা চলমান অবস্থায় বিকাল ৪.২০ মিনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সত্যিই শহীদ বাবলু ফরাজী জীবিত অবস্থায় আর বাড়িতে ফিরতে পারলেন না। তিনি তার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, নাতি-নাতিকে রেখে চলে গেলেন আল্লাহর দরবারে।

> পরিবারের সদস্যদের সাথে সাথে এলাকাবাসীও বাবলু ফরাজীর মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে।

জানাজা ও দাফন

হাসপাতাল থেকে শহীদের মরদেহ নিজ এলাকা কুষ্টিয়ার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নামাজে জানাযা শেষে হাটশ হরিপুর ইউনিয়ন কবরস্থানে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শহীদ মোঃ বাবলু ফরাজীকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে প্রতিবেশীর বক্তব্য

প্রতিবেশী প্রভাষক জনাব শামীম বলেন, “শহীদ বাবলু ফরাজী একজন ধার্মিক মানুষ ছিলেন। তিনি পরিশ্রমী ও সাহসী ছিলেন। যেখানেই অন্যায় দেখতেন তিনি প্রতিবাদ করতেন। এভাবে তাকে মরতে হবে কল্পনাও করতে পারিনি। তাকে হারিয়ে আমরা খুবই কষ্ট অনুভব করছি।”

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম : মো: বাবলু ফরাজী

জন্ম : ০৪-০৭-১৯৬৬

পিতা : মৃত নওশের আলী

মাতা : মৃত মোছা: বুড়ী খাতুন

পেশা : ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: হাটশ হরিপুর, ইউনিয়ন: হরিপুর, থানা: কুষ্টিয়া সদর , জেলা: কুষ্টিয়া

আহত হওয়ার সময় : ০৫ আগস্ট, ২০২৪; বিকাল ৩.৩০ টা

ঘটনার স্থান : চার রাস্তার মোড়, হাই স্কুল গলি, কুষ্টিয়া শহর

মৃত্যুর তারিখ ও স্থান : ০৫ আগস্ট, ২০২৪; বিকাল ৪.২০ টা, সদর হাসপাতাল, কুষ্টিয়া

আক্রমণকারী : স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক পুলিশ, এস আই সাবের আলীর নেতৃত্বে

কবরস্থান : হাটশ হরিপুর ইউনিয়ন কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১। অসুস্থ ছেলে ও স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

২। আয়ের কোনো উৎস না থাকায় পরিবারটির জন্য এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা।

শহীদ মো: ছাব্বির ইসলাম সাকিব

ক্রমিক: ৪২৩

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৩৯

শহীদ পরিচিতি

বাগেরহাটের হিজলায় ২০০৪ সালের ২৭ এপ্রিল মো: ছাব্বির ইসলাম সাকিব জন্মগ্রহণ করেন। সেনা কর্মকর্তা বাবা ও গৃহিণী মায়ের অতি আদরের মোঃ ছাব্বির ইসলাম সাকিব ছোট বেলা থেকেই ভালো ছাত্র ছিলেন। তিন বোনের অতি আদরের একমাত্র ছোট ভাই হিসেবে বড় হতে থাকেন এবং তিনি তার বোনদের খুব ভালবাসতেন। বাবা মায়ের শাসনের সাথে বোনদের কাছ থেকে আদর্শের শিক্ষা লাভ করেন। এলাকায় নামাযী ছেলে হিসেবে প্রতিবেশিরা তাকে খুব ভালো জানতো এবং তাকে সবাই খুব ভালবাসতো। দেশপ্রেম, নামাজী এবং ভদ্র হওয়ায় এলাকার মানুষের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তিনি শেরে বাংলা ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেণীতে পড়তেন। স্বপ্ন ছিল পড়াশোনা করে অনেক বড় হবেন। বাবা মা এবং বোনদের জন্য জীবনে কিছু করবেন। অবশেষে মহান রব তাকে সমগ্র জাতির মুক্তির জন্যই কবুল করে নিলেন। ১৯ জুলাই ২০২৪ সালের সন্ধ্যা ছয়টায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন ২৪ এর এই বীর মুক্তিযোদ্ধা।

শাহাদাতের বর্ণনা

বুঝ হওয়ার পর থেকেই শহীদ ছাব্বির বাংলাদেশে আওয়ামী দু:শাসনই দেখে বড় হয়েছেন। যেই বাংলাদেশে আওয়ামীলীগ ও তার সহযোগীরা ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ দ্বিতীয় শ্রেণী নাগরিক। বিরোধী দল ও মতের যে কাউকেই যেকোনো সময় যেকোনো অজুহাতে নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া, গুম-খুন-ক্রসফায়ার দিয়ে দিন দুপুরে মানুষ হত্যা, বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে "সরকারবিরোধী" ট্যাগিং এর মাধ্যমে ছাত্রলীগ কর্তৃক সাধারণ ছাত্র পিটিয়ে মারা যেন নিত্যদিনের সংবাদ। একজন আওয়ামী সাংসদের গাড়িবহরে ইঁট-পাটকেল নিক্ষেপের অজুহাতে ৬ জন বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীকে রাতারাতি হত্যার নিউজ যেন সংবাদপত্রের সর্বশেষ পাতার ৮ম কলামের শেষ প্যারাগ্রাফ।

গত প্রায় দেড়যুগ ধরে সরকারের অসংখ্য অবিচারের বিরুদ্ধে গড়ে উঠা বিভিন্ন আন্দোলন ও প্রতিবাদকে সরকার কঠোরভাবে দমন করে এসেছে। তাই গত জুন মাস থেকে শুরু হওয়া সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক কোটাপ্রথা সংস্কারের দাবিতে আপামর ছাত্রজনতার আন্দোলনকে দমাতেও সরকার একই পদ্ধতি অবলম্বন করে। প্রথমদিকে সরকার আন্দোলনকারীদের দমাতে লাঠিচার্জ টিয়ারশেল সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করলেও পরবর্তীতে তা সরাসরি আন্দোলনকারীদের বুক, মাথা ও চোখ লক্ষ্য করে বুলেট নিক্ষেপে গিয়ে থামে। ১৬ জুলাই শহীদ আবু সাঈদ এর শাহাদাতের মাধ্যমে শহীদের এই মিছিল শুরু হলে পরবর্তীতে তা ছাড়িয়ে যায় হাজারের ঘর। আহত হয় অগণিত শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ। পঙ্গু ও অন্ধত্বের শিকার হওয়া মানুষের সঠিক হিসেব আজও নেই।

বাবা-মা কখনো চাননি ছাব্বির আন্দোলনে যোগ দিয়ে মিছিল, মিটিং করুক। এদিকে তিনি চিন্তা করেছিলেন আমাকে এই আন্দোলনে যোগ দিতেই হবে। ছাব্বির সব সময় অন্যায় আর অত্যাচারের বিপক্ষে ছিলেন। যেহেতু বাগেরহাটে ছাব্বির আন্দোলনে যোগ দিতে পারছিলেন না তাই বাগেরহাট থেকে ঢাকায় আসেন ছাত্রজনতার সাথে মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য। তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে প্রথমে ঢাকায় বোনের বাসা টঙ্গীতে আসেন। টংগী থেকে উত্তরার বিএনএস সেন্টারে আসেন ১৯ তারিখ, শুক্রবার। দেশব্যাপী ছাত্রজনতার বিক্ষোভ মিছিলের অংশ হিসাবে তিনি ৭ নং সেক্টরের বিএনএস সেন্টারের সামনে অবস্থান নেন। মিছিলের সম্মুখ ভাগে ছিলেন তিনি। মিছিলের সম্মুখ ভাগে থাকায় ছাব্বির পুলিশের সামনা সামনি অবস্থান নেন। এদিকে পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশের সেই গুলি প্রচন্ড গতিতে আঘাত করে মো: ছাব্বির ইসলাম সাকিব কে। পর পর পাচ টা গুলি এসে লাগে তার শরীরে। দুটি গুলি মাথায় আর বাকী তিনটি গুলি লাগে বুকে। মূহুর্তেই ছাব্বির রক্তাক্ত হয়ে ঢলে পড়েন রাস্তায়। অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে তার সাথীরা তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু ততক্ষণে মহান রবের দরবারে সাড়া দিয়েছেন শহীদ ছাব্বির। ডাক্তার প্রাথমিক অবস্থা যাচাই করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সেদিন রাতেই লাশ নিয়ে যায় পুলিশ। রাত তিনটায় প্রায় ৫০ জন পুলিশ গ্রামের বাড়ীতে এসে লাশ মাটিচাপা দিয়ে চলে যায়।

মো: ছাব্বির ইসলাম সাকিব এর মৃত্যুতে বাবা মা গভীর শোকাহত। সন্তান হারিয়ে বাবা মা এখন পাগল প্রায়। বোনদের একমাত্র আদরের ভাই হওয়ায় বোনেরাও শোকে মুহ্যমান। পরিবারের হাল ধরতে চাওয়া ছেলেটার ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে বাবা মায়ের সকল অভাব দূর করে দিব, বর্তমানে পরিবারের তেমন কোনো আয় নেই, পিতা সাবেক সেনাসদস্য, পেনশনের সামান্য যা কিছু টাকা পান তা দিয়েই কোনো রকমে সংসার চলে।

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: মো: ছাব্বির ইসলাম সাকিব
জন্ম তারিখ	: ২৭-০৪-২০০৪
পিতা	: মো: শহিদুল মন্ডল
মাতা	: কাকলী বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: হিজলা, ইউনিয়ন: হিজলা, থানা: চিতলমারী, জেলা: বাগেরহাট
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
পেশা	: ছাত্র, শেরেবাংলা ডিগ্রী কলেজ, চিতলমারী, বাগেরহাট
ঘটনার স্থান	: বিএনএস সেন্টার, ৭নং সেক্টর, উত্তরা, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯ জুলাই সন্ধ্যা ৬টা
শাহাদাতের সময়কাল	: ১৯ জুলাই সন্ধ্যা ৬টা, বিএনএস সেন্টার, ৭নং সেক্টর, উত্তরা, ঢাকা
আঘাতের ধরন	: বুলেটের আঘাত (৫টি), মাথায় ও বুকে
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: চিতলমারী, হিজলা, বাগেরহাট

প্রস্তাবনা

১. পিতা অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য। পেনশনের টাকায় চলে পরিবার। এককালীন সহযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে

শহীদ বিপ্লব শেখ

ক্রমিক: ৪২৪

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৪০

শহীদ পরিচিতি

শহীদ বিপ্লব শেখ বাগেরহাট জেলার মোল্লার হাট থানাধীন বুড়ি গাংনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্র ভ্যানচালক বাবা মোঃ পারভেজ শেখ ও মা এলিজা বেগমের বড় ছেলে তিনি। পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ায় তিনি তার ছেলেকে খুব বেশি পড়াতে না পারলেও অক্ষরজ্ঞানহীন রাখেন নাই। তার চরিত্রের নৈতিকতার ভিত্তি তার বাবার কাছ থেকেই তিনি পান। মানুষের আনন্দে আনন্দিত হওয়া, অন্যের দুঃখে ব্যাথিত হওয়া এসব মানবিক গুনের প্রস্ফুটন তার ছেলেবেলায়ই ঘটে। পরিবারের সবার জন্য কষ্ট করে টাকা উপার্জন করে তা পরিবারের কল্যাণে খরচ করতে হয় তা তিনি তার বাবার কাছ থেকেই শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি খুব সাদাসিদা ও সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ছিলেন পিতামাতার খুব অনুগত ও শান্ত। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে অল্প বয়সে গার্মেন্টসে আয়রণ ম্যান হিসাবে চাকরিতে যোগদান করেন। ছোট ভাই বোনদের পড়াশোনার খরচের জোগান তার চাকুরির বেতন থেকেই আসতো।

শাহাদাতের ঘটনা

১৯-০৭-২০২৪ শুক্রবার সকাল। পবিত্র জুম্মার দিন। ভোর থেকেই ঢাকা সহ পুরো বাংলাদেশের অবস্থা ছিল থমথমে। অন্যান্য দিনের মতো পুলিশের সাথে ছাত্রজনতার ঝামেলা তৈরি হয়নি এখনো। শুক্রবার হওয়ায় ছাত্রজনতা জুম্মার নামাজের পরে আন্দোলনে নামার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের, মাদ্রাসা ছাত্রদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ। তারাও এই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বিপ্লব শেখ ছিলেন একজন গার্মেন্টস কর্মী এবং তিনি তার বন্ধুদের সাথে আন্দোলনে নামবেন অন্যান্য দিনের মতো, এটাই ছিল তার সেদিনকার পরিকল্পনা। সে অনুযায়ী বিপ্লব শেখ জুম্মার নামাজ শেষ করে বন্ধু এবং সাধারণ জনতা ও ছাত্রদের সাথে মিরপুর ১০ এ নেমে পড়েন।

ইতোপূর্বে ১৬ জুলাই আবু সাঈদ, ফয়সাল মাহমুদ শান্ত, ওয়াসিম আকরাম সহ মোট ৬ জনকে শহীদ করে দেওয়ার মাধ্যমে সরকার শুরু করেছে আন্দোলন দমনের নামে হত্যাযজ্ঞ।

১৯ জুলাই ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে পুলিশের সাথে সবচেয়ে বেশি সংঘর্ষ হয়। ঢাকার অন্যান্য জায়গার তুলনায় মিরপুর-১০ এ সংঘর্ষ একটু বেশিই হয় কারণ সেখানে পুলিশের সাথে ছত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগ একসাথে ছাত্রজনতার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। নামাজের পর পরই দুই গ্রুপে ধাওয়া পালটা শুরু হয়। পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার সাথে সমান তালে চলে পুলিশের থেমে থেমে গুলিবর্ষণ। একই সাথে সেদিন সরকারের পক্ষ থেকে আকাশ পথে হেলিকপ্টার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় গরম পানি। পুলিশ আর ছাত্রজনতার ধাওয়া পালটা ধাওয়ার এক পর্যায়ে পরপর দুটি গুলি এসে বিধে বিপ্লব শেখের মাথার পেছনে একটা এবং পিঠে এবং তিনি ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন। পরে তার সাথীরা তাকে আজমল হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক বিপ্লব শেখকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবার হাসপাতাল থেকে তার লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ তার পিতাকে বলেছিল-লোকজনকে বলবে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গিয়েছে।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

বিপ্লব শেখের বাবা একজন ভ্যান চালক। মা অন্যদের বাড়িতে গিয়ে কাজ করে যা আয় করেন তাও বাবার পাশাপাশি সংসার চালাতে খরচ করেন। বিপ্লব শেখ ছাড়াও এই বাবা মায়ের আরও তিন জন ছেলে মেয়ে রয়েছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে সংসার চালানো তাঁর জন্য অতি কষ্টের বিষয়। দিন এনে দিন খাওয়া এই পরিবারের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা অতি নাজুক। ইচ্ছে ছিল বড় ছেলে বিপ্লব শেখ গার্মেন্টস এ কাজ করে পরিবারের হাল ধরার পাশাপাশি ছোট ভাই বোনদের পড়াশোনার খরচও বহন করবে। ছেলে বিপ্লব শেখেরও এমনই ইচ্ছে ছিল।

পরিবারের বড় সন্তানকে হারিয়ে বিপ্লব শেখের বাবা ও মা পাগল প্রায়। ছেলে কেন্দ্রিক তাদের আশা আকাঙ্খার আর কিছুই বাকি রইলো না। গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে পরিবারের হাল ধরা ছেলেটিকে হারিয়ে পরিবারে নেমে এসেছে অভাব আর অনটন।

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: বিপ্লব শেখ
জন্ম তারিখ	: ০১-০৪-২০০৫
পিতা	: মোহাম্মদ পারভেজ শেখ
মাতা	: এলিজা পারভীন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বুড়ি গাংনি, ইউনিয়ন: গাংনি, থানা: মোল্লারহাট, জেলা: বাগেরহাট
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী
ঘটনার স্থান	: মিরপুর ১০ গোল চত্বর
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯ জুলাই ২০২৪, সন্ধ্যা ছয়টা
শাহাদাতের সময়কাল	: ১৯ জুলাই ২০২৪, সন্ধ্যা ছয়টা
আঘাতের ধরন	: মাথার পেছনে ও পিঠে গুলি
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: বুড়ি গাংনি

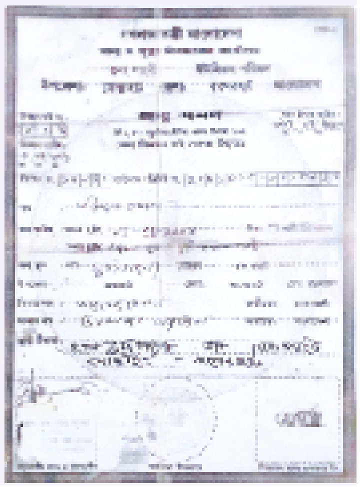

প্রস্তাবনা

১. ছোট ছোট তিনজন ভাই বোন রয়েছে। তাদের পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়া যেতে পারে

২. ভ্যানচালক বাবাকে ব্যবসার পুঁজি দেওয়া যেতে পারে

শহীদ আলিফ আহমেদ সিয়াম

ক্রমিক : ৪২৫

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৪১

"মা আমাকে যেতে দাও। আমি মারা গেলে, তোমার ছেলে শহীদ হয়েছে জেনে গর্বে তোমার বুক ভরে যাবে।"

শহীদ পরিচিতি

২০০৯ সালের ৩১ আগস্ট বাগেরহাট সদর থানার বাশবাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করে কিশোর শহীদ আলিফ আহমেদ সিয়াম। সে সাভার ডেইরি ফার্ম হাই স্কুলের ১০ম শ্রেণির ছাত্র। তার ছোট বোন ইশরাত জাহান শামহা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। বাবা-মা এবং ছোট বোনকে নিয়ে সাভারের ইসলামনগর এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকতো তারা। একজন পাইলট হওয়ার এবং এভিয়েশন সেক্টরে যোগদানের আকাঙ্খা ছিল তার। কিন্তু ৫ আগস্ট সাভারে পুলিশের গুলিতে নিহত হলে তার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। আলিফ খুব সাদাসিদা ও সহজ সরল প্রকৃতির ছিল। পিতামাতার খুব অনুগত ও শান্ত ছেলে।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে নিজের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পরিবারের কাছে তেমন কিছু চাইত না। টিফিনের জন্য যে টাকা দেওয়া হতো সেখান থেকে অর্ধেক খরচ করে বাকী অর্ধেক টাকা মায়ের কাছে ফেরত দিতো। ছোট বোনকে পড়াশোনার বিষয়ে সাহায্য করতো, বাবার কষ্ট দেখে নিজেই সেই কাজে সাহায্য করতেন। মাকে বলতো আমি বড় হয়ে তোমাদের সকল প্রকার অভাব অনটন দূর করে দিব ইনশাল্লাহ। এলাকার মানুষের সাথে তার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল, এজন্য এলাকার সবাই তাকে খুব ভালবাসতো। বাসার পাশে একটা অভাবী ছেলে ছিল তাকে নিজের বাসা থেকে মা কে না বলে খাবার দিত মাঝেমধ্যেই, মা দেখে যদি রাগারাগি করেন এই ভয়ে বলত না। কারণ আলিফ নিজেও জানত তাদের অভাব অনটনের সংসার। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাইদের সাথেও ছিল অসাধারণ সম্পর্ক, এজন্য তিনটা জানাজার মধ্যে একটা জানাজা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

শাহাদাতের ঘটনা

যেদিন থেকে কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হলো তখন থেকেই আলিফ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, পড়ালেখার প্রতি মন নাই। আলিফ বারবার টিভির সামনে যায় আর ছটফট করে। এরপর প্রথম যেদিন তিনি শুনতে পেল জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাইয়েরা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন সেদিন থেকেই সে আন্দোলনে যাওয়া শুরু করে। আলিফ ও তাঁর বাবা প্রতিদিন কোটা সংস্কার আন্দোলনে যেত। আলিফের মা নিষেধ করলেও তাঁর বাবা তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং সাহস যোগাতেন। একদিন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনে গিয়ে আলিফের হাতে রাবার বুলেট ও চোখে টিয়ারশেলের গ্যাস লাগে। এই অবস্থা দেখে মা কান্নাকাটি করেন এবং পরবর্তীতে আর আন্দোলনে যেতে দিচ্ছিলেন না। তখন সে তার মাকে বলে "মা, আমাকে যেতে দাও। আমি মারা গেলে, তোমার ছেলে শহীদ হয়েছে জেনে তোমার হৃদয় গর্বে ভরে যাবে।"এরপর ৫ আগস্ট ঢাকাগামী লংমার্চে কর্মসূচির ঘোষণা আসলে আলিফের মা আর তাকে ধরে রাখতে পারেননি। আলিফের বন্ধুরা আলিফদের বাসায় এলে "খুব বেশি দূরে যাবে না"-এই বলে বাসা থেকে বের হয়ে যায় আলিফ। যাওয়ার সময় আলিফের মা একটা মুঠো ফোন দিয়ে দেন, ১১টার দিকে মায়ের সাথে আলিফের কথাও হয়।

১২টা ১০ এর দিকে ফোন দিলে আলিফ মাকে বলে মা আমরা গনভবনের দিকে যাচ্ছি, তুমি চিন্তা করো না। ইনশাল্লাহ আমার কিছু হবে না, যদি আমার কিছু হয়ও আমি শহীদ হব আর তুমি শহীদের মা হবে। মা বললেন আমি শহীদের মা হতে চাই না, তুমি এখনই বাসায় চলে আসো বাবা। তখন আলিফ বলে তুমি দোয়া কর মা, আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি সেই উদ্দেশ্য যেন সফল হয় এবং বিজয়ের বেশে তোমার কাছে ফেরত আসতে পারি। আর কিছু না বলে ফোন রেখে দেয়। কিছুক্ষণ পর সাভারে গুলাগুলি শুরু হলে আলিফের মা আতংকিত হয়ে পড়েন। ২ টা ৩০ এর দিকে আলিফের মায়ের কাছে একটা অপরিচিত নাম্বার থেকে ফোন আসে যে আলিফের মাথায় গুলি লেগেছে। ল্যাবজন হাসপাতালে আলিফকে নেওয়া হয়, সেখান থেকে এনাম মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। এনাম মেডিকেলে আইসিইউ সাপোর্টে রাখা হয়। টানা দুই দিন যমে মানুষে লড়াই চলে। অতপর ৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টায় মারা যায় আলিফ আহমেদ সিয়াম। পান করে শাহাদাতের অমিয় সুধা। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

শহীদ সম্পর্কে তার স্বজনের বক্তব্য

আসসালামু আলাইকুম, আমি আলিফ আহমেদ সিয়ামের আম্মু। আমার ছেলে আলিফ আহমেদ ডেইরি ফার্ম স্কুলের দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থী ছিল। আমি ক্যামেরার সামনে কথা বলতে পারি না তবুও আমার বাবার বাস্তব জীবন নিয়ে আজ কিছু কথা বলবো। আমার বাবার সাহসিকতা ছিল বীরের মতো। আমার বাবার বীরের মতো সাহসিকতার গল্পটা আমাকে আজ বলতেই হবে।

আমি ৫২র ভাষা আন্দোলন দেখি নাই, দেখি নাই ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু আমি দেখেছি ২০২৪ জুলাইয়ের কোটা সংস্কার আন্দোলন। আমি দেখেছি আবু সাইদ, মুগ্ধ, শ্রাবণ ও আলিফের মতো বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। আমি দেখেছি তাদের মনে দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা, দেশের জন্য জীবন দেওয়ার অসীম সাহসিকতা। আমি চাই আমার ছেলে হত্যার সঙ্গে জড়িত সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হোক।

আমার ছেলের অনেক স্বপ্ন ছিল এবং তা মুহূর্তের মধ্যে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমি তার হত্যার বিচার দাবি করছি।

সিয়ামের বাবা, বুলবুল কবির, যিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটি কাপড়ের দোকান চালান, তিনি বলেন, 'সিয়াম তার স্কুলে মেধাবী ছাত্র এবং স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ন ছিল। পাইলট হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে সে বিজ্ঞান গ্রুপ বেছে নিয়েছিল। সে কঠোর পরিশ্রম করেছে, অসংখ্য পুরস্কার জিতেছে। তার এইরকম সমাপ্তি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিনা।"

বুলবুল আরও উল্লেখ করেছেন যে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী গাজী এম এইচ তামিম তার পক্ষে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ আটজনের বিরুদ্ধে ১৫ জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মামলা করেছেন।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ
আলিফ আহমেদ সিয়াম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তার বাবা বুলবুল আহমেদ সাভারে থাকেন। প্রথম দিকে বুলবুল আহমেদ পাচ হাজার টাকা বেতনে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে চাকুরী করতেন। অফিসটি মতিঝিলে হওয়ায় সাভার থেকে মতিঝিলের অফিসে আসা যাওয়া কষ্ট হবে বলে তিনি ভ্যানের উপর কাপড় বিক্রির ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করেন। কোভিডের সময় ক্ষুদ্র ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। জীবন জীবিকা চালানোর জন্য এরপর বিভিন্ন বাসায় আর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে খাবার সরবরাহ করতেন। বর্তমানে আবার ভ্যানের উপর কাপড় বিক্রির ব্যবসাটি শুরু করেন, যাতে মাসিক আট থেকে দশ হাজার টাকা আয় করেন। এসবক্ষেত্রে আলিফ আহমেদ সিয়াম বাবাকে সাহায্যতা করত।

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: আলিফ আহমেদ সিয়াম
জন্ম তারিখ	: ৩১-০৮-২০০৯
পিতা	: বুলবুল কবির
মাতা	: তানিয়া আহমেদ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বাশবাড়িয়া, ইউনিয়ন: ডেমা, থানা: বাগেরহাট সদর, জেলা: বাগেরহাট
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে, ইসলামপুর থানা, সাভার, ঢাকা
পেশা	: ছাত্র (দশম শ্রেণী)
ঘটনার স্থান	: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গেট
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট দুপুর ২:১০ টা
শাহাদাতের সময়কাল	: ৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা, এনাম মেডিকেল কলেজ আইসিইউ
আঘাতের ধরন	: মাথায় গুলি
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: বাগেরহাট

প্রস্তাবনা

১. শহীদের বাবাকে ব্যবসার জন্য পুঁজির ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে

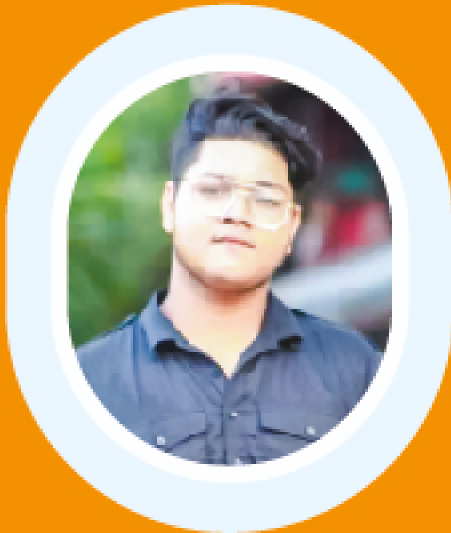

শহীদ সাকিব রায়হান

ক্রমিক : ৪২৬

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৪২

'মৃত্যুর আগে তিনি পাশে থাকা সাথীকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমার শাহাদাতের মাধ্যমে কি দেশে স্বাধীনতা আসবে?' তার সাথীরা বলেন, 'ইনশাআল্লাহ'। এরপর তিনি পানি পান করেন এবং কালিমা পড়েন।'

শহীদ পরিচিতি

২০০৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খুলনা জেলার সোনাডাঙ্গা থানার আকাবা মসজিদ ইউনিয়নের নবপল্লী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সাকিব রায়হান। জনাব শেখ আজিজুর রহমান ও নুরুন্নাহার বেগম দম্পতির কনিষ্ঠ সন্তান তিনি। পরিবারের সদস্য বৃদ্ধি হলে স্বাভাবিক ভাবে অর্থ কষ্ট দেখা দেয়। সংসারের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় পিতা আজীজুর রহমান একপ্রকার দুশ্চিন্তায় পড়েন। জীবিকার তাগিদে খুলনা ছেড়ে ঢাকায় আসেন। ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে চেষ্টা করেন রিজিক সন্ধানের। মাঝে মাঝে দিনমজুরের কাজও করতেন তিনি। কিন্তু ২০২০ সালের করোনা মহামারীতে সবকিছু স্থবির হয়ে পড়ে। কোনকিছুতেই যেন পেরে উঠছিলেন না শহীদ পিতা।

এমনকি সন্তানদের লেখাপড়াও থেমে যায়। হিফজুল কোরআন অধ্যয়ন কালীন সাকিব রায়হানের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। শহীদ ১৮ পারা হিফজ সম্পন্ন করেন। জনাব আজিজুর রহমান নিজ এলাকায় ফিরে যান। একটি মুদির দোকান দিয়ে চেষ্টা করেন পরিবারের খরচ বহনের। নামমাত্র উপার্জন দিয়েই বড় মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন করেন। মেজ ছেলে সাব্বির রায়হান বর্তমানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ি। শহীদ পিতা গ্রামে ফিরে গেলেও সংসারের হাল ধরতে সাকিব চাকরি শুরু করেছিলেন। প্রথমে রবি সিমকার্ড বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে (এসআর) কাজ শুরু করেন। এরপর বাংলালিংক কোম্পানিতে যুক্ত হন। তবে কিছুদিন পর দুর্ঘটনায় পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হলে তিনদিন অনুপস্থিত থাকায় চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় শহীদ সাকিব রায়হানকে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সংস্থায় স্বল্পমেয়াদী চুক্তিভিত্তিক কাজের পাশাপাশি নতুন চাকরির সন্ধান করতে থাকেন। কিছুদিন পর অর্থনৈতিক শুমারির মাঠকর্মী হিসেবে যুক্ত হন। ১ আগস্ট ২০২৪ তারিখে নতুন চাকরিতে যোগদানের কথা ছিল শহীদের। মা-বাবা বারবার খুলনায় ফিরে আসতে বলেছিলেন। তিনি বলতেন-'খুলনায় কিছু করার সুযোগ কম। ঢাকায় চাকরি অথবা ব্যবসা করে তোমাদের মুখে হাসি ফোটাব, এরপর ফিরব ইনশাআল্লাহ্।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

সরকারী বৈষম্যের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে স্বৈরাচারী সরকার পুলিশ ও আওয়ামীলীগ-ছাত্রলীগের গুন্ডা বাহিনী লেলিয়ে দিলে আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠে। ১৬ জুলাই সারা দেশে ৬ জন নিহত হয়। দিনে দিনে লাশের সারি বাড়তে থাকে। ১৭ তারিখ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে পুলিশ ও ছাত্রলীগের যৌথ হামলায় শিক্ষার্থীরা হলছাড়া হলে ১৮ তারিখ আন্দোলনের নেত...ত্ব নেয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। এদিন পুলিশ র‍্যাব হেলিকপ্টার ব্যবহার করে ছাত্রদের উপর গুলি চালায়। ১৯ তারিখ জুমার নামাজে পর আপামর ছাত্রজনতা রাস্তায় বেরিয়ে আসলে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে গুলি চালায় পুলিশ ও ছাত্রলীগের গুন্ডারা। জুলাইয়ের ১৫ তারিখ থেকেই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন সাকিব রায়হান। ১৭ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পুলিশ ও শেখ হাসিনার গুন্ডাবাহিনীর হামলায় রক্তাক্ত হলে ছাত্রদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর রক্তাক্ত লোগো প্রোফাইল পিকচার হিসেবে সংযুক্ত করেন সাকিব রায়হান। যা এখনও বিদ্যমান। বন্ধুদের সাথে প্রতিদিনই আন্দোলনে যেতেন তিনি। বাড়ি থেকে বার বার আন্দোলনে যেতে নিষেধ করতো তার পরিবার। অবশেষে ১৯ তারিখ বিকাল তিনটায় মিরপুর ১০ নাম্বারে ছাত্রজনতার মিছিলে পুলিশ হামলা চালালে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়েন সাকিব। পুলিশের ছোড়া তপ্ত বুলেট তার বুক ভেদ করে পিঠ ফুড়ে বেরিয়ে যায়। ছাত্ররা তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে গাড়িতে মৃত্যুবরন করেন শহীদ সাকিব রায়হান। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষনা করেন। তাঁর বড় ভাই খবর পেয়ে হাসপাতালে যায়। পুলিশ লাশ ফেরত দিতে নয়-ছয় করে। তারা বলে এটা পুলিশ কেস, মামলা করতে হবে। অনেক সময় লাগবে। পরে এসে লাশ নিয়ে যাবেন। অনেক কান্নাকাটির মাধ্যমে করজোড়ে অনুরোধ করলে পরবর্তীতে মর্গ থেকে লাশ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় পুলিশ। জানিয়ে দেয়- 'কোন মৃত্যুসনদ দেওয়া হবে না।' পরদিন ২০ জুলাই প্রভাতে বড়ভাই সাব্বির রায়হান অ্যাম্বুলেন্সে করে মরদেহ নিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে যায়। জানাজা শেষে বসুপাড়া কবরস্থানে শহীদ সাকিব রায়হানকে দাফন করা হয়।

মৃত্যুর আগে তিনি পাশে থাকা সাথীকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমার শাহাদাতের মাধ্যমে কি দেশে স্বাধীনতা আসবে?' তার সাথীরা বলেন, 'ইনশাআল্লাহ'। এরপর তিনি পানি পান করেন এবং কালিমা পড়েন।

নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

সাকিবের মা নুরুন্নাহার বেগম জানায়- 'বিকেল পাঁচটার দিকে কেউ একজন সাকিবের বাবার মুঠোফোন নম্বরে ফোন করে বলেন, সাকিব গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তাঁকে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ কথা শুনেই তিনি ভেঙ্গে পড়েন। প্রথম দিকে কোথায় কী করবেন, তা বুঝতে পারছিলেন না। পরে ঢাকায় থাকা

বড় ছেলে ও জামাতাকে ফোন করে ঘটনাটি জানান। তাঁরাই সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে খোঁজ করে সাকিবের লাশ বাড়িতে নিয়ে আসেন। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর আমার ছেলে দুই ঘণ্টার মতো বেঁচে ছিল। তাকে দুটি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তারা ভর্তি করেনি। পরে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নেওয়ার পথে সাকিব মারা যায়। নিজেকে কী বলে সান্ত্বনা দেব, ভেবে পাচ্ছিনা। জোয়ান ছাওয়ালডারে এইভাবে কবর দিতে হবে, ভাবতেও পারিনি। আমার ছাওয়াল গেছে, আমি বুঝতেছি কী কষ্ট! এখন ছাওয়ালের জন্য দোয়া করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।' 'গত বুধবারও ফোন করেছিল। কত কথা বলল। এখন আমার সাকিব চলে গেছে, এখন এসব বলে কী হবে? আমাদের কিছু বলার নেই। মরদেহ ফেরত পাইছি, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। কত মা তো তাও পায়নাই।'

শহীদ পিতা জনাব আজিজুর রহমান বলেন, 'গত শুক্রবার আমরা দু'জন ঢাকায় ছেলেদের কাছে গিয়েছিলাম। আসার সময় বারবার সাকিবকে বললাম, আমাদের সঙ্গে খুলনায় চল।' আমার ছেলে বলেছিল- '১ আগস্ট থেকে নতুন চাকরিতে যোগ দেব। চাকরি করে তোমাদের মুখে হাসি ফোটাব।' কিন্তু আমাদের সব হাসি যে কেড়ে নিল-এটা কাকে বলবো। কিছু বললেই আমার ছেলে হাসতো। ওর হাসিতে আমার কলিজা ঠান্ডা হয়ে যেত। 'কারও কাছে বিচার চাই না। বিচার আল্লাহপাক করবে।'

জনপ্রিয়তার কথার সত্যতা পাওয়া গেল বায়তুল আকাবা মসজিদের সামনে গিয়ে। জোহরের নামাজ শেষে কথা হচ্ছিলো কয়েকজন মুসল্লিদের সঙ্গে। সবাই একবাক্যেই বললেন, এমন ভদ্র ছেলে এলাকায় কমই ছিল। এলাকার প্রিয় মুখটির লাশ হয়ে ফিরে আসা দেখে সবার মুখে ক্ষোভ ও হতাশা ঝরে।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

সাকিবের বাড়ি খুলনা নগরীর ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের নবপল্লী এলাকায়। সেখানকার বায়তুল আকাবা জামে মসজিদের সামনে টিনের চাল ও বেড়ায় জীর্ণশীর্ণ এক কক্ষের একটি বাড়িতে থাকেন সাকিবের বাবা-মা। বাড়িতে প্রবেশের পথটিও বেশ জীর্ণ। রান্নাঘরটি গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া। ওই জায়গাটুকু নুরুন্নাহার তাঁর পৈত্রিকসূত্রে পেয়েছেন। সেখানেই ঘর করে কোনোরকমে থাকছেন। বাবা শেখ মো: আজিজুর রহমানের কাপড়ের ব্যবসা ছিল। করোনার সময় ব্যবসা বন্ধ হওয়ার পর একটি মুদি দোকান দিয়েছেন। মা নুরুন্নাহার বেগম গৃহিণী। তার বড় ছেলে সাব্বির রায়হান ঢাকায় অনলাইনে ছোটখাটো ব্যবসা করেন। তাদের দুই ছেলে এবং এক মেয়ের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন সাকিব রায়হান। সাকিব রাজধানীর স্বপনগর এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন। বাসায় মাকে নিয়ে থাকতে চেয়েছিলেন তিনি। নুরুন্নাহার বেগমও ঢাকায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঘাতকের গুলি সবকিছু মুহূর্তে বিলীন করে দিয়েছে। বাকরুদ্ধ করে দিয়েছে শহীদ পিতা-মাতাকে।

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: সাকিব রায়হান
জন্ম তারিখ	: ১৪-০৯-২০০৪
পিতা	: শেখ আজিজুর রহমান (ফুলন)
মাতা	: নুরুন্নাহার বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নবপল্লী, ইউনিয়ন: আকাবা মসজিদ, থানা: সোনাডাঙ্গা, জেলা: খুলনা
পেশা	: চাকুরি
ঘটনার স্থান	: মিরপুর ১০
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৩টা
শাহাদাতের সময়কাল	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৫ টায় হাসপাতালে নেয়ার পথে
আঘাতের ধরন	: বুকে গুলি বিদ্ধ
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: বসুপাড়া সরকারী কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. শহীদের ভাইয়ের জন্য চাকরীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে
২. গ্রামের বাড়িতে বাবা মায়ের জন্য একটি স্থায়ী ঘর করে দেওয়া যেতে পারে
৩. শহীদের পিতাকে ব্যবসার জন্য পুঁজির ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে

শহীদ মোহাম্মদ ইয়াসিন আলী শেখ

ক্রমিক : ৪২৭

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৪৩

শহীদ পরিচিতি

খুলনা জেলার রহিম নগরে নূর ইসলামের পরিবারে জন্মগ্রহন করেন মো ইয়াসিন আলী শেখ। হতদরিদ্র পিতা মাতার ঘরে আলো হয়ে আসে ছোট্ট ছেলে মো: ইয়াসিন আলী শেখ। তার জন্মের পরেই তার বাবা মারা যান। বড় তিন বোনের আদরের একমাত্র ভাই। মায়ের স্বপ্ন ছেলে বড় হয়ে সংসারের হাল ধরবে। ছোট থেকেই লেখাপড়ায় ভালো ছিল, সাথে ছিল দুরন্তপনা। চঞ্চল হলেও ছোট বেলা থেকেই কোনো বিবেক বর্জিত কাজে যুক্ত হতো না। মানবিক সকল কাজে সাহায্য ছিল উল্লেখ করার মতো। প্রতিবেশীদের খোজখবর রাখতেন নিয়মিত। তিনি অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন।

তিন বোন এর ছোট ভাই হিসেবে যথেষ্ট আদরেই বেড়ে উঠেছেন। যদিও পরিবারে অভাব অনটন লেগেই থাকতো। অভাব অনটন দেখা ছোট্ট ছেলেটি কখনো পরিবারে খুব দামি কিছু কিনতে চায়নি, বরং বোনদের খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে তিনি ছিলেন যথেষ্ট সচেতন। ছেলেটি স্বপ্ন দেখত আমি একদিন বড় হবো, বড় হয়ে বোনদের আমার নিজের টাকায় বিয়ে দিবো। পারিবারিক অভাব আর অনটনের মধ্যে খুব বেশি পড়াশোনা না করতে পারলেও তার বিবেকবোধ ছিল প্রখর। তিনি সাধাসিধা ও সহজ সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। পরিবারের অভাব মেটানোর জন্যই ঢাকা আসেন ইয়াসিন। ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকার একটি এলপি গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে ডেলিভারি ম্যানের কাজ করতেন।

শাহাদাতের ঘটনা

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক কোটা প্রথা আদালত কর্তৃক পুনর্বহাল হলে সারা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামে। শান্তিপূর্ণ মিছিল, সমাবেশ, মানববন্ধন, রাষ্ট্রপতি বরাবর স্মারকলিপি প্রেরণ- এই সমস্ত কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রদের আন্দোলন এগিয়ে যেতে থাকে। এর মাঝে রাষ্ট্রপতি বরাবর স্মারকলিপি প্রদানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে ছাত্ররা এগিয়ে গেলে পুলিশ তাদের বিনা উষ্কানিতে লাঠিচার্জ, কাঁদানো গ্যাস এবং সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের মাধ্যমে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ছাত্ররাও পুলিশের এরূপ গনতান্ত্রিক অধিকার হরণের প্রতিবাদে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এরপর থেকেই সরকার ও আন্দোলনকারীদের মাঝে উত্তাপ বাড়তে থাকে। এরই মাঝে ১৬ জুলাই ২০২৪ তারিখে দেশব্যাপী পুলিশের অত্যাচার ও গুলিতে আবু সাঈদ, শান্ত ও ওয়াসিম আকরাম সহ ৬ জন নিহত হলে ছাত্রসমাজ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সরকার ছাত্র সমাজের ন্যায্য দাবি গ্রাহ্য না করে আন্দোলনকারীদের উপর দমন-পীড়ন নীতি অবলম্বন করে। ১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ব্যাপক হামলা করা হয়। আবাসিক ছাত্রদের হল থেকে বের করে দেয়া হয়। পুলিশ ও ছাত্রলীগের গুলিতে বাড়তে থাকে মৃতের সংখ্যা। ১৮ জুলাই ঢাকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলনের নেতৃত্ব নিলে ঢাকা জুড়ে নিরস্ত্র ছাত্র ও সশস্ত্র পুলিশ-ছাত্রলীগ বাহিনীর সংঘর্ষে লাশের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় শতকের ঘর। মাত্র তিন দিনে শত শত সাধারণ ছাত্রের লাশ দেখে আর ঘরে বসে থাকতে পারেনি দেশের সাধারণ জনগণ, শ্রমিক সমাজসহ অন্যান্য শ্রেণিপেশার মানুষ। তারাও ছাত্রদের সাথে আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে এর পরদিন থেকে একযোগে মাঠে নামে। কোটা সংস্কার ছাত্রআন্দোলন পরিণত হয় বৈষম্য বিরোধী গন গনআন্দোলনে।

১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, পবিত্র জুমার দিন। যাত্রাবাড়ী এলাকা। সকাল থেকেই এখানকার পরিস্থিতি ছিল থমথমে। তবে সকাল থেকে নামাজের আগ পর্যন্ত কোনো অপ্রতিকর ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়নি। পবিত্র জুমার নামাজ আদায় করে আপামর ছাত্র-জনতা একযোগে রাজপথে নেমে আসে। জনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলে বাধা প্রদান ও অতর্কিত হামলা চালায় পুলিশ বাহিনী ও আওয়ামী লীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। তাদের এলোপাথাড়ি গুলিতে রাস্তার উপর একের পর লাশ পড়তে থাকে। বড় হতে থাকে শহীদের মিছিল।

নামাজের পর গ্রাহকের বাসায় গ্যাসের সিলিন্ডার পৌঁছে দোকানে ফেরার সময় শহীদ ইয়াসিন যাত্রাবাড়ীতে ছাত্র-জনতা ও আওয়ামী লীগের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার মাঝে পড়ে যান। সংঘর্ষের একপর্যায়ে সন্ত্রাসীদের ছোড়া বুলেট আঘাত করে ইয়াসিনকে। আহত অবস্থায় তাকে মুগদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৫ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শহীদের মায়ের কথা

জুরাইন রহিম নগরের ইয়াসিন শেখের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে, জীর্ণশীর্ণ কুড়ে ঘরে বসবাস তাদের।

ইয়াসিনের মা মনজিলা বেগম জানান, 'ইয়াসিন গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর কয়েকটা ছেলে ঢাকার যাত্রাবাড়ী মাতুয়াইল এলাকায় আমার ভাড়া বাসায় এসে জানায় তার গুলির খবর। তখন আমার কাছে একটা টাকাও ছিল না, অনেক অনুরোধের পর এক রিকশাচালক বিনা ভাড়ায় আমাকে ইয়াসিনের কাছে নিয়ে যায়। এরপর তাকে মুগদা হাসপাতালে ভর্তি করি। ২৫ তারিখ সে মারা যায়। এরপর গ্রামের লোকজনের দেয়া চাঁদার টাকায় অ্যাম্বুলেন্সে করে ইয়াসিনের লাশ খুলনার বাড়িতে আনি। আনার পথেও অনেক হয়রানি পোহাতে হয়।'

কাঁদতে কাঁদতে তিনি আরো বলেন, 'আমার ছেলের কোনো দোষ ছিল না। সে পথচারী ছিল। সে তো কোনো দল করতো না। কাজ করতো, ভাত খেত। আমি মানুষের বাড়িতে কাজ করতাম। ইয়াসিনের আয় দিয়েই বাসা ভাড়াসহ সংসার চলতো। আমি এখন কী করে চলবো, আমাকে কে খাওয়াবে? আমার তো সব শেষ। এত অল্প বয়সে সে আমার বুক খালি করে চলে যাবে তা ভাবতেও পারিনি।'

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

আলী ছাড়াও আরও তিন বোন রয়েছে। সব বোনের বিয়েও হয় কিন্তু কিছুদিন আগে ছোট বোনের ডিভোর্স হয়। ইয়াসিন পরিবারের ছোট হওয়ায় তখনও কোনো কাজে যুক্ত ছিল না। হত দরিদ্র পরিবার, সংসারে নুন আনতে পানতা ফুরায়। মা অন্যের বাড়ী কাজ করেন এবং এই আয় দিয়ে কোনো রকমে সংসার চালান। মায়ের এমন কষ্ট দেখে ইয়াসিন আলী সিদ্ধান্ত নেন ঢাকা গিয়ে কিছু করে মাকে সাহায্য করার। অর্থনৈতিক অবস্থা শুধু মো: ইয়াসিন আলীকে নয় তার মাকেও ঢাকায় আনতে বাধ্য করে।

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: মো: ইয়াসিন আলী শেখ
জন্ম তারিখ	: ১৬-১০-২০০৮
পিতা	: মরহুম নুর ইসলাম শেখ
মাতা	: মনজিলা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রহিম নগর, ইউনিয়ন: ৩নং নৈহাটি, থানা: রূপসা, জেলা: খুলনা
পেশা	: চাকরিজীবী (গ্যাস সিলিন্ডার ডেলিভারির কাজ করতেন)
ঘটনার স্থান	: যাত্রাবাড়ী
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯ জুলাই বিকেল ৩টা
শাহাদাতের সময়কাল	: ২৪ জুলাই সন্ধ্যা ৬টা
আঘাতের ধরন	: গুলির আঘাত
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: রহিমনগর, খুলনা কলোনি কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. শহীদের মাকে ব্যাবসার পুঁজি হিসেবে এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে

শহীদ মোঃ হামিদ শেখ

ক্রমিক : ৪২৮

আইডি : খুলনা বিভাগ ০৪৪

শহীদ পরিচিতি

আর কত অন্যায় করলে শেখ হাসিনাসহ তার দোষররা শাস্তি পাবে। আর কত প্রাণ নিলে তারা তাদের রাক্ষুসে মনোভাব দূর করবে। কত রক্ত দরকার তাদের পিপাসা মিটানোর জন্য। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এভাবেই বুঝি সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করেছে। তার থেকে এই শিক্ষা নিয়ে তার সন্তান শেখ হাসিনা এখন ২০০৮ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে, জেল জুলুম দিয়েছে, ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে এবং তার পোষা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ দ্বারা হাজার হাজার বোনকে ধর্ষণ গণধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে।

এত অন্যায় দেখে হামিদ শেখ আর সহ্য করতে পারল না। সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করল স্বৈরাচার পতনের জন্য ছাত্রদের সাথে রাজপথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করল। অবশেষে বাংলাদেশের ভাগ্য আকাশে উজ্জ্বল সূর্য উঠিয়ে চির বিদায় নিলেন।

শহীদ মো: হামিদ শেখের সংক্ষিপ্ত জীবনী

খুলনার তেরখাদা পানতিতা গ্রামে ১৯৯৭ জন্মগ্রহণ করেন মো: হামিদ শেখ। বাবার নাম মো: জাফর শেখ। মা রাশিদা বেগম। তিন ভাই বোনের মধ্যে মো: হামিদ শেখ সবার বড়। তার ছোট এক বোন আর একজন ভাই আছে। পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা থাকলেও পারিবারিক অভাবের কারণে তা পায়নি। হত দরিদ্র পরিবার। বাবা ভ্যান চালক। ভ্যান চালক পিতার আয়ে সংসার চলে। বাড়িতে যেই ঘর আছে তার মাত্র দুইটা বেড়া আছে, বেড়া দুটি জড়োসড়ো। তিনবেলা খাবার জোটাতে বাবার হিমশিম খেতে হয়। বাবা খেটে খাওয়া মানুষ হিসেবে লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা দিতে না পারলেও ছেলের মধ্যে যথেষ্ট সততা তৈরী করে দিতে পেরেছিলেন। চার সদস্যের পরিবারের অভাব অনটন যখন মারাত্মক পর্যায়ে আসে তখনই ছেলে মোঃ হামিদ শেখ পরিবারের সাহায্যের জন্য গার্মেন্টসে এসে কর্মী হিসেবে টাকা আয় করতে থাকেন। বাবা জানান, 'আমার ছেলে প্রথম বেতনের সব টাকাই আমার হাতে তুলে দেয়। বাড়িতে আসার সময় ও আমার আর ওর মায়ের জন্য নতুন কাপড় কিনে আনতো। এছাড়াও ছোট ভাই বোনদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নতুন জামা-কাপড় কিনে দিতো।

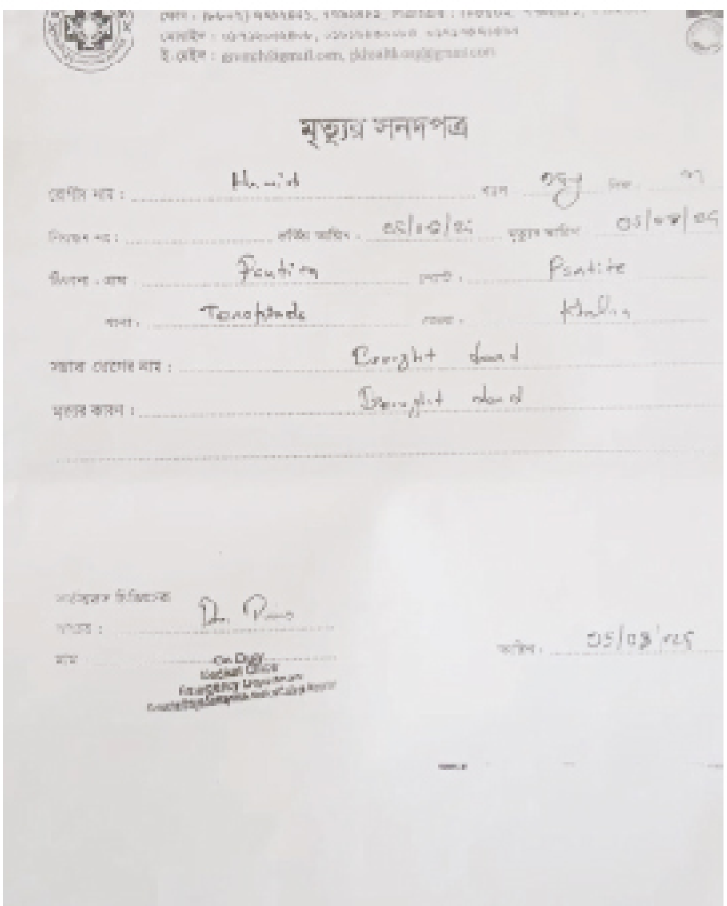
মৃত্যুর সনদপত্র

রোগীর নাম :

মৃত্যুর কারণ :

সেদিনের মর্মান্তিক ঘটনা

তিনি খুব সাদাসিদা ও সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আন্দোলনের শুরুতে তিনি বন্ধুদের সাথে ছাত্রজনতার মিছিলে যোগ দেন। তিনি অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন, প্রতিবেশীদের খোজখবর রাখতেন নিয়মিত। দায়িত্ববান ভাই হিসেবে তিনি তার ছোট ভাইকে পড়াশোনার খরচ চালাতেন।

সংসার চালানোর পাশাপাশি বাবা-মার সকল দিক তিনি খেয়াল রাখতেন। তিনি মাকে বলেছিলেন, 'মা আমি একটা মহৎ কাজে যাচ্ছি, তুমি কি চাও না আমি শহীদ হই? তুমি আমার জন্য দোয়া করো। আর আমাকে ক্ষমা করে দিও আমি ফিরে নাও আসতে পারি। কারণ দীর্ঘ ১৫-১৬ বছর অবৈধভাবে ক্ষমতায় বসে থাকা স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা বিদায় নিচ্ছে। এই সময় হয়তো সে তার সর্বশক্তি ব্যবহার করবে। সাধারণ মানুষকে নির্দ্বিধায় হত্যা করবে। তবুও আমরা তার রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে এই আন্দোলনকে সফল করব ইনশাআল্লাহ। 'মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন খোকা তুই এমনটা করিসনে। তুই ছাড়া আমার সংসার চালানোর আর কেউ নেই। তুই হারিয়ে গেলে আমরাও হারিয়ে যেতে পারি। আন্দোলন করার তো অনেক মানুষ আছে তারা করুক না। তুইতো গরিব মানুষের ছেলে বিজয় আসলেই কি, না আসলেই কি। দেশ স্বাধীন হলে গরিবদের কোনো লাভ নেই স্বাধীনতার স্বাদ শুধু ধনীরাই ভোগ করে। হামিদ বললেন না মা, লাভ লোকসানের হিসাব তো হবে ওপর আল্লাহর কাছে। আমি তো যাচ্ছি আমার নৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য। আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন সৎকাজে আদেশ করার আর অসৎ কাজে বাধা দেওয়ার। আমি অসৎ কাজে বাধা দিতে যাচ্ছি আমি গণহত্যাকারী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছি। দীর্ঘ ১৫ বছর শেখ হাসিনা তার দলীয় ক্যাডারদের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। আমাদের দেশের সুনামধন্য সেনাবাহিনীকে পঙ্গু করেছে। আমাদের দেশে অর্থনীতিকে অচল করেছে। এই দেশটাকে বাঁচাতে হবে তা না হলে ফ্যাসিবাদী সরকার বাংলাদেশের নাম গন্ধ পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলবে। তখন মায়ের কান্না ছাড়া কিছুই করার থাকলো না। মা বললেন, 'আল্লাহ তোর ভালো করুক।'

৫ আগস্ট সোমবার। বিজয়ের আনন্দে সবাই ঘর ছাড়া। নারী, পুরুষ, ছোট, বড় সবাই আনন্দ মিছিল বের করেছে। মো: হামিদ শেখ সবার সাথে দুপুর ১২ টায় সেই আনন্দ মিছিলে বের হয়েছিলেন কিন্তু তিনি

তখনও বোঝেননি এটাই আমার বাসা থেকে শেষ বের হওয়া, আর ফেরত আসা হবে না। মোঃ হামিদ শেখ সবার সাথে বিজয় মিছিলে গিয়ে আশুলিয়া থানার সামনে এসে পৌছান। তিনি মিছিলের প্রায় সম্মুখভাগে ছিলেন।

হঠাৎ গুলির শব্দ শুনতে পায় হামিদ শেখ, সাথে মানুষের দিকবিদিক ছোটাছুটি। অবস্থা দেখে হামিদ নিজেও ছোটাছুটি শুরু করেন। আশেপাশের মানুষকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখে তাদের ফেলে রেখে পেছন ফিরে আর আসতে মন চাইলো না। তিনি এগিয়ে গেলেন আহতদের সহায়তা করার জন্য যদিও পরিবেশ অনুকূলে ছিল না। এমতাবস্থায় তার ঘাড়ে এবং বুকে দুইটা গুলি লাগে। যদিও পরে গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বাচিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে কিন্তু মো: হামিদ শেখ ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। কেউ চিন্তাই করতে পারিনি এইভাবে পুলিশ গুলি করবে। পুলিশ তো আমাদের দেশেরই কোনো মায়ের সন্তান। এরা তো আমাদের পরিশ্রমের টাকায় বেতন পায়। তাদের হাতের বুলেট আমাদের ট্যাক্সের টাকায় কেনা। তাদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়েছে সন্ত্রাসীদের নির্মূল করার জন্য। তারা অস্ত্র নিয়েছে এই ওয়াদা করে যে, 'আমরা দেশের শান্তিরক্ষা করব, আমরা অন্যায়কে দূর করব। কিন্তু তারা অন্যায়ের পক্ষ নিয়ে, জালিম সরকারের পক্ষ নিয়ে সাধারণ মানুষকে এভাবে নির্দ্বিধায় হত্যা করবে এটা কেউ কল্পনা করেনি।' আহ! একটি আঙ্গুল দিয়ে ট্রিগার চেপে বুলেট বের করতে বোধ হয় এদের কোনো কষ্টই হচ্ছে না কিন্তু একটি বুলেটের আঘাতে একটি প্রাণ শুধু যাচ্ছে না, একটি প্রাণ চলে যাবার সাথে সাথে অনেক মানুষের মুখের আহার চলে যাচ্ছে। যে সন্তানের উপর পরিবারের অনেকগুলো সদস্য নির্ভরশীল ছিল তারা হয়তো আজ সেই সন্তানকে হারিয়ে ভিক্ষার ঝুলি কাধে তুলে নিবে।

এক সহকর্মীর অনুভূতি

বন্ধু, পরিবার আর প্রতিবেশীদের সাথে ছিল তার দারুণ সম্পর্ক। সাহায্য, সহানুভূতি প্রকাশ করার মন- মানসিকতা ছিল অনন্য। পরিবারের সাহায্যের জন্য পড়াশোনা বাদ দিয়ে গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন। এরই পরিপেক্ষিতে আশুলিয়ার ধামরাইতে বসবাস শুরু করেন। সেই গার্মেন্টস কর্মীদের সাথে কাজ করতেন তাদের সাথে সব সময় হাসি মুখে কথা বলতেন। সহকর্মী হিসেবে তার প্রশংসা আছে যথেষ্ট।

বাবার অনুভূতি: হত দরিদ্র পরিবার। বাবা ভ্যান চালক, ভ্যান চালক পিতার আয়ে সংসার চলে। বাড়িতে যেই ঘর আছে তার মাত্র দুইটা বেড়া আছে, বেড়া দুটি জড়োসড়ো। তিনবেলা খাবার জোটাতে বাবার হিমশিম খেতে হয়। চার সদস্যের পরিবারের অভাব অনটন যখন মারাত্মক পর্যায়ে আসে তখনই ছেলে মোঃ হামিদ শেখ পরিবারের সাহায্যের জন্য গার্মেন্টসে এসে কর্মী হিসেবে টাকা আয় করতে থাকেন। বাবা জানান, 'আমার ছেলে প্রথম বেতনের সব টাকাই আমার হাতে তুলে দেয়। বাড়িতে আসার সময় আমার আর ওর মায়ের জন্য নতুন কাপড় কিনে আনতো। এছাড়াও ছোট ভাই বোনদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নতুন জামা-কাপড় কিনে দিতো নিজের জীবনের চাইতেও সে তার পরিবারকে বেশি ভালোবাসতো।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

দায়িত্ববান ভাই হিসেবে তিনি তার ছোট ভাই, বোনের পড়াশোনার খরচ চালাতেন। সংসার চালানোর পাশাপাশি বাবা-মার সকল দিক তিনি খেয়াল রাখতেন। তিনি তার মাকে বলেছিলেন 'মা আমি একটা মহৎ কাজে যাচ্ছি, তুমি কি চাও না আমি শহীদ হই? তুমি আমার জন্য দোয়া করো। আমাকে ক্ষমা করে দিও। 'মো: হামিদ শেখ এর বাবা এখন একজন ভ্যান চালক। বেচে থাকা চার সদস্যের পরিবার নিয়ে তিনি এখন খুব কষ্টে জীবনযাপন করছেন।

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা।

২। শহীদের বোনটি বিবাহযোগ্য। তার বিয়ের ব্যবস্থা করা। সমুদয় খরচ বহন করা।

৩। শহীদের ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ চালানো এবং পড়াশোনা শেষ এ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

একনজরে শহীদের পরিচয়

পূর্ণাঙ্গ নাম	: মো: হামিদ শেখ
পিতা	: মো: জাফর শেখ(৫৫) ভ্যান চালক
মাতা	: মোসা: রাশিদা বেগম (৫০) গৃহিণী
জন্ম তারিখ	: ১২-০৪-১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পানতিতা, ইউনিয়ন ২নংবারাসাত, থানা: তেরখাদা, জেলা: খুলনা
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: পানতিতা, ইউনিয়ন ২নংবারাসাত, থানা: তেরখাদা, জেলা: খুলনা
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী। প্রোটেক্স স্পোর্টস ওয়ার লিমিটেড। লাকুড়িয়া পাড়া ধামরাই, ঢাকা
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
আক্রমণের স্থান ওই সময়	: আশুলিয়া থানা, সাভার ঢাকা ০৫-০৮-২০২৪, দুপুর ১২:০০টা
শাহাদাতের সময়	: আশুলিয়া থানা, সাভার ঢাকা ০৫-০৮-২০২৪, দুপুর ১২:০০টা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন	: রহিমনগর, খুলনা কলোনি কবরস্থান

শহীদ মো: নবী নুর মোড়ল

ক্রমিক : ৪২৯

আইডি : খুলনা বিভাগ ০৪৫

শহীদ পরিচিতি

জুলাই বিপ্লবের এক অখ্যাত নক্ষত্র মো: নবী নুর মোড়ল। লক্ষ ছাত্র-জনতার সাথে এক হয়ে নেমেছিলেন অত্যাচারী খুনী শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তিনি পেশায় ছিলেন সাধারণ একজন মাছ ব্যবসায়ী। দায়িত্বশীল স্বামী এবং একজন পিতা হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। ১৯৭২ সালের ১৩ নভেম্বর খুলনা জেলার পাইকগাছা গ্রামে মৃত মো: করিম মোড়ল ও তহুরা বিবি দম্পতির ঘর আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামে বাবা-মায়ের আদরে প্রিয় সন্তান হিসেবে বেড়ে ওঠেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় শহীদ পিতা ছেলেকে খুব বেশি লেখাপড়া করাতে পারেননি। এরপর নিজের সাথে বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত করেছেন। বাবার সাথে বেড়ে ওঠার ফলে সেখান থেকে নৈতিক ভিত্তি গড়ে ওঠে।

মানুষের আনন্দে আনন্দিত হওয়া, অন্যের দুঃখে ব্যাথিত হওয়া এসব মানবিক দিকগুলো তাঁর ভেতর স্থান পায়। মাতা তহুরা বিবির বয়স ৮০ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত কারনে অসুস্থ। দুই মেয়ে, স্ত্রী ও বৃদ্ধা মাতা কে নিয়ে একটু সুখের জন্য ৬ বছর আগে খুলনার পাইকগাছা থেকে ঢাকায় আসেন নবীনুর। সাভারে কি করবেন তখনও ঠিক করেন নি। পরে নিজের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে নবীনুর মোড়ল ফুটপাতে মাছ ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসার সাথে সাথে তিনি দেশেরও খোজ খবর রাখতেন। পরিবারের সবার জন্য কষ্ট করে টাকা উপার্জন করে তাদের কল্যাণে খরচ করতেন। মাছ ব্যবসায় যা উপার্জন করতেন তা দিয়ে সংসার খুব ভালোভাবে চলতো না। পরিবারে দুই মেয়ে ও স্ত্রীর সাথে অসাধারণ বন্ধন ছিল তাঁর। মেয়েদের অত্যন্ত স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে বড় করছিলেন। বড় মেয়ে নাজমা বেগমকে (২২) সুপাত্রে পাত্রস্থ করেন।

৬ বছর একাধারে ব্যবসা করে ধীরেধীরে সকল ধার দেনা শোধ করেন। শহীদের ইচ্ছা ছিল ছোট মেয়ে ফাহিমাকে (১৮) ভাল পাত্রের কাছে বিয়ে দেবেন। খুলনার পাইকগাছাতে ছোট করে মা ও স্ত্রী কে নিয়ে একটা সুখের নীড় গড়ে তুলবেন। তিনি ছিলেন একজন যোগ্য পিতা, একজন যোগ্য স্বামী, একজন যোগ্য সন্তান। মানবিক হয়ে ওঠা মানুষটা সাভার ধামরাইতে বসবাস শুরু করেন তার পরিবারের জন্য।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মো: নবীনুর মোড়ল একজন অতি দরিদ্র মাছ ব্যবসায়ী। তিনি ছিলেন তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁকে হারিয়ে তাঁর স্ত্রী গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। বর্তমানে ভীষণ কষ্টে নবীনূর মোড়লের রেখে যাওয়া সংসার চলছে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন হলো বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের একটি সংগঠন। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে কোটা আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে এটি গঠিত হয় এবং এটি কোটা সংস্কার আন্দোলন ও পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। ২০২৪ সালের ১ জুলাই সংগঠনটি সৃষ্টি হয় এবং সৃষ্টির পরপরই আন্দোলন সফল করার জন্য ৮ জুলাই সংগঠনটি ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি ঘোষণা করে, যার মধ্যে ২৩ জন সমন্বয়ক ও ৪২ জন সহ-সমন্বয়ক ছিলেন। কোটা সংস্কার আন্দোলনের একপর্যায়ে ১৭ জুলাই রাত থেকে মোবাইল ইন্টারনেট এবং ১৮ জুলাই রাতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যায়। ২০ জুলাই, শনিবার দেশজুড়ে কারফিউ, সেনা মোতায়েনের মধ্যেও যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, বাড্ডা ও মিরপুর এলাকায় চলে সংঘর্ষ, ধাওয়া ও গুলি। নবীনুর মোড়ল জুলাই এর শুরুতেই ছাত্রজনতার যৌক্তিক এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা পোষণ করেন। মাছ ব্যবসায়ী হলেও জুলাইয়ের বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ছিলেন। ব্যবসার পাশাপাশি তিনি আন্দোলনের শুরুতেই মাছ বিক্রি ও আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। তিনি তার সমবয়সী এবং সাধারণ মানুষকে এই আন্দোলনে একত্রিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।

মানুষকে এই আন্দোলনে একত্রিত করার পাশাপাশি তিনি শহীদ হওয়ার আগের দিন ছাত্র-জনতার সঙ্গে একত্রিত হয়ে পুলিশ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া র সাথে যুক্ত হন। এর পরের দিন বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। বিক্ষোভ মিছিল এ অংশগ্রহণ করলে সেদিন ও পুলিশের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। বিক্ষোভ মিছিল এর শেষের দিকে, ৫ টার দিকে সাভারের ওয়াপদা রোড সংলগ্ন রহমান মার্কেটের সামনে পুলিশের গুলি তাকে আঘাত করে। এরপর তাকে দ্রুত এনাম মেডিকেলে নেওয়া হয়। সেখানে তার রাত ৯ টা পর্যন্ত জ্ঞান

ছিল। কিন্তু শহীদের স্বজনদের হাজার কাকুতি মিনতির পরও অপারেশন করা হয়নি এবং গুলি বের করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তিনি তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে জামাইকে বার বার জানিয়েছিলেন তাকে যেন অন্তত একটা ব্লেড দিয়ে হলেও কেটে বুলেট টা বের করে দেওয়া হয়। রাত ৯ টার পরে তীব্র ব্যথায় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সে অবস্থায় তিনি ২১ জুলাই রাত ২.০০ টায় ইন্তেকাল করেন। মারা যাওয়ার পরও তার লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। শহীদ পরিবারের সাথে হয়রানি করা হয়। পরবর্তীতে শহীদের জামাই ৪১ হাজার টাকা জমা দিয়ে লাশ ছাড়িয়ে আনেন। এই অকুতোভয় শহীদকে শেষ সমাধি দেওয়া হয় নিজ গ্রাম খুলনার পাইকগাছায়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

মা-'আমার ছেলের মত আরেকটা ছেলে হয়না। সারাজীবন আল্লাহর রাস্তায় চলার চেষ্টা করেছে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নসিব করুন।'

স্ত্রী-'তিনি ছিলেন এই সংসারের বটগাছ। মেয়েদের খুব ভালবাসতেন। ইচ্ছা করে কখনও নামাজ ছাড়তেন না। আমাকে আর মেয়েদেরকে সবসময় সৎ থাকার, নামাজ, রোজা ঠিকমতো পড়ার তাগাদা দিতেন। তিনি বলতেন মেয়েরা আমার মাথার তাজ। ছোট মেয়েকে হিফয ভর্তি করেছেন। কত স্বপ্ন ছিল আমার স্বামীর। আল্লাহ তার সকল ইচ্ছা পূরন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। তিনি শহীদ হয়েছেন। মহান আল্লাহ তার মৃত্যুকে শহীদি মৃত্যু হিসেবে কবুল করুন।'

জামাই- 'আমার শ্বশুর হিসেবে বলছি না, তার মত অমায়িক মানুষ খুব কমই আছে। আমাকে কখনও আব্বু ছাড়া ডাকেন নি। উনি সবাইকে খুব ভালবাসতেন। ইসলামের ব্যাপারে সবসময় সবাইকে সাবধান করতেন। আমি তাঁকে কখনও নামাজ ছাড়তে দেখিনি। সবার সাথে তাঁর এতটা ভাল সম্পর্ক ছিল যে যখন এনাম মেডিকেল থেকে চিকিৎসা খরচ বকেয়া থাকায় লাশ ছাড়ছিল না, তখন সবাই এগিয়ে এসেছিলেন। সে সময় আমাদের হাতে একেবারেই টাকা ছিল না।'

প্রতিবেশী-'তিনি খুব সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। নিয়মিত প্রতিবেশীদের খোঁজ খবর রাখতেন। সকলের সাথে অমায়িক ব্যবহার করতেন। মাছ ব্যবসায়ি হলেও তিনি সমাজের ভাল কাজগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকতেন। ধর্মীয় কাজে নিজেকে সর্বদা উজাড় করে দিতেন।

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: মো: নবী নুর মোড়ল
জন্ম	: ১৩-১১-১৯৭২
পেশা	: মাছ ব্যবসায়ী
মাসিক আয়	: ১০,০০০/-
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শ্রীকণ্ঠপুর, ইউনিয়ন : বাড়ুলি, থানা: পাইকগাছা, জেলা: খুলনা
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: বনপুকুর, এলাকা: সাভার, থানা: সাভার, জেলা: ঢাকা
পিতার নাম	: মৃত মো: করিম মোড়ল
মাতার নাম	: তহুরা বিবি, বয়স: ৮০
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন (স্ত্রী, মা ও ছোট মেয়ে ফাহিমা)
ঘটনার স্থান	: ওয়াপদা রোড, সাভার রহমান মার্কেট
আক্রমনকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ২০-০৭-২৪, বিকাল: ৫:০০ ঘটিকা
মৃত্যুর তারিখ ও সময় স্থান	: ২১-০৭-২৪, রাত: ২:০০ ঘটিকা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারে মাসিক সহযোগিতা করা যেতে পারে

২. শহীদের কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ খরচ যোগানে এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে

৩. শহীদ জননীকে চিকিৎসা বাবদ সহযোগিতা করা যেতে পারে

শহীদ মো: হাফেজ আনাজ বিল্লাহ

ক্রমিক : ৪৩০

আইডি : খুলনা বিভাগ ০৪৬

শহীদ পরিচিতি

হাফেজ আনাজ বিল্লাহর মৃত্যুতে দেশ ও জাতি হারিয়েছে এক প্রতিশ্রুতিশীল নাগরিক বাগানের শ্রেষ্ঠ গোলাপটিকে। হাফেজ আনাজ বিল্লাহ ২০০০ সালে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার কুড়ি কাহুনিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। তাঁর পিতা আরজ আলী এলাকার একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। মাতার মোসা: আনোয়ারা খাতুনের শখ আনাজকে কোরানের হাফেজ বানাবেন। মায়ের ইচ্ছা আনাজ পূরণ করেছে। পিতা মাতার আদর যত্ন এবং ভাই দের মায়া মমতায় শিশুটি গড়ে উঠে সুন্দর সুঠাম ও আকর্ষণীয় চরিত্রের। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তার মাঝে সৃষ্টি হয় মহান আল্লাহর একনিষ্ঠতা এবং খোদাভীরুতা ও বলিষ্ঠ সাহসীকতার। কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অগ্রসৈনিক কোরআনের আলোকেই যাতে গড়ে উঠতে পারে সে জন্য পিতা তাকে ভর্তি করান হাফেজিয়া মাদ্রাসায়। পুরো কোরআন শরীফ আত্মস্থ করে কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্যে ভর্তি হয় প্রতাপনগর ফাজিল মাদরাসায়।

মূল ঘটনার বিবরণ

হাফেজ আনাজ বিল্লাহর অনুপম চরিত্র চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে সর্বস্তরের মানুষদের। আল্লাহ তার মনোনীত বান্দাদের এভাবেই ব্যতিক্রম গুণাবলী দিয়ে গুণান্বিত করেন যা মানুষ কখনো ভুলতে পারে না। হাফেজ আনাজ বিল্লাহ সবাইকে সালাম দিতেন, কেউ কিছু বললে তিনি শুধু হাসতেন শহীদ হাফেজ আনাজ বিল্লাহ নিয়মিত সকলপ্রকার সামাজিক ও দাওয়াতী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন। সমাজের মানবের যে য কোনো বিপদে তিনি সবার আগে ছুটে যেতেন। সকলের কাছে তিনি পরোপকারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি সব সময় স্থানীয় সকল ভালো উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতেন। আন্দোলনের শুরু থেকেই তিনি নিয়মিত মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি বড় ভাই ও বন্ধুদের কাছে সব সময় বলতেন-আমি যেন শহীদ হতে পারি। শহীদি তামান্না বুকে ধারন করে তিনি সর্বদা ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন।

কোটা সংস্কারের দাবিতে চলা স্বৈরাচার বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে শহীদ হাফেজ আনাজ বিল্লাহ শুরু থেকেই অংশ গ্রহণ করতেন। গত ০৫.০৮.২০২৪ তারিখে সারা দেশের মতো সাতক্ষীরা জেলাতেও আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে। উত্তাল হয়ে উঠে শহীদের রক্তে ভেজা এই জনপদের প্রতিটি প্রান্তর। দুপুরের পর থেকেই স্বৈরশাসকের পলায়নের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিকাল ৩টায় হাজার হাজার জনতার অংশগ্রহণে ছাত্র জনতার বিক্ষোভ মিছিলটি স্বৈরাচার পতনের বিজয় মিছিলে পরিণত হয়।

প্রতাপনগর বাজার থেকে বিজয় মিছিলটি সামান্য অগ্রসর হলে বিকাল ৪ টায় প্রতাপনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা শেখ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে সশস্ত্র যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা মিছিলের উপর হামলা চালায় ও গুলি করে। এক পর্যায়ে শেখ জাকিরের পিস্তল ও শটগানের গুলিতে ঘটনাস্থলে অনেক মানুষ হতাহত হয়। শহীদ হাফেজ আনাজ বিল্লাহ মিছিলের সামনের সারিতে থেকে অংশগ্রহণ করেন।

সে জেনেছে স্বৈরাচার সরকার পতন হয়েছে তারপরেও আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্যে গুলি চালানোর সাহস কিভাবে হয়! সে ভেবেছিল হয়তো সন্ত্রাসীরা আর গুলি চালাতে পারবে না। কিন্তু কে জানে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা হাফেজ আনাজসহ সাধারণ ছাত্র জনতার উপর এভাবেগুলি করবে! এসব আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের উপরের চেহারা দেখে তো আর বোঝার উপায় নেই যে তারা মানুষ নয় তারা হিংস্র জানোয়ারের চাইতেও বেশি কিছু। শেখ হাসিনা এমনভাবে এদেরকে তৈরি করেছে যেন বিন্দু পরিমাণ এদের অন্তরে মায়া মহব্বত নেই। যারা গুলি করেছে তারাও তো মুসলিম নামধারী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি তারা মুসলমানের সন্তান হতো তাহলে যে বুকের মধ্যে আল্লাহর কোরআন লিপিবদ্ধ সেই বুকে গুলি চালাতে পারতো না। যাই হোক অবশেষে হাফেজ আনাজের সমস্ত ভাবনাকে দূর করে দিয়ে তার দিকে ধেয়ে আসে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের বুলেট। সাথে সাথে অশান্তিতে ভরা, নৈরাজ্যপূর্ণ পৃথিবীর এই মায়া মহব্বত ত্যাগ কর শান্তিময় জান্নাতের দিকে চলে যান হাফেজ আনাজ। মিছিলকারী ছাত্র-জনতা তাকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করেন। যে কোনো মিছিলে তিনি সম্মুখ সারিতে থাকতেন। গত ০৫.০৮.২০২৪ তারিখের মিছিলে যাওয়ার পূর্বে তিনি সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে দোয়া করতে বলেছিলেন, যেন আজই তিনি শহীদ হতে পারেন। মহান আল্লাহ তাকে কবুল করেছেন।

হাফেজ আনাজ বিল্লাহ সম্পর্কে তার বড় ভাইয়ের অনুভূতি

দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মত বড় আলেম হবে এ আশায় হেফজ শেষ করে ফাজিল মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিলে। ভাইদের মধ্যে হাফেজ আনাজ ছিলো ব্যতিক্রমী। তার মেধা অত্যন্ত প্রখর ছিল। গ্রামের সকলেই ভাবতো আনাজ বড় হয়ে অনেক বড় মাওলানা হবে। তার কণ্ঠ অনেক সুন্দর ছিল। সে কোরআন তেলোয়াত করলে মানুষ শত ব্যস্ততা ভুলে যেয়ে তার তেলাওয়াত শুনতো।

হাফেজ আনাজ বিল্লাহ সম্পর্কে তার এক বন্ধুর অনুভূতি

শহীদ হাফেজ আনাজ বিল্লাহ তার বড় ভাই ও বন্ধুদের বলতেন, 'তোমরা দোয়া করো আল্লাহ যেন আমাকে শহীদ হিসাবে কবুল করেন।' হাফেজ আনাজ বিল্লাহ মানুষদের বলতো-ভাই ও বোনেরা শোনো! অন্যায়, অত্যাচার জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলো। খোদার জমিনে খোদার দেয়া জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হও।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহীদের অন্য ৩ ভাই সকলেই বর্তমানে লেখা পড়া করেন। পিতা একটি ছোট মুদি দোকান চালান। বড় ভাইও বর্তমানে বেকার অবস্থায় আছেন। কোনো চাকুরী নাই তাই মাঝে মাঝে অন্যের খেতে দিন মজুরীর কাজ করে পরিবারকে সাপোর্ট দেয়ার চেষ্টা করেন। পিতার অসুস্থ্যতার কারনে সপ্তাহে দুই-এক দিন দোকান বন্ধ রাখতে হয়।

একনজরে শহীদের পরিচয়

শহীদের পূর্ণ নাম	: মো: হাফেজ আনাজ বিল্লাহ
জন্ম তারিখ	: ১৭.০৩.২০০০
জন্মস্থান	: নিজ জেলা, সাতক্ষীরা
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: দশম শ্রেণী, প্রতাপনগর মদীনাতুল উলুম ফাজিল মাদরাসা
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: কুড়ি কাহুনিয়া, ইউনিয়ন: প্রতাপনগর, থানা: আশাশুনি, জেলা: সাতক্ষীরা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কুড়ি কাহুনিয়া, ইউনিয়ন: প্রতাপনগর, থানা: আশাশুনি, জেলা: সাতক্ষীরা
পিতা, পেশা ও বয়স	: আরজ আলী, মুদি দোকান, ৬৫ বছর
মাতা	: মোসা: আনোয়ারা খাতুন
মায়ের পেশা ও বয়স	: গৃহিনী, ৫৫ বছর, ব্যবসা
ভাইদের বিবরন	: ১. মো: আরিফ বিল্লাহ (২৩)
	: ২. মো: আহসান উল্লাহ (৩)
আঘাতকারীর	: আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ
আহত হওয়ার ও স্থান সময়	: প্রতাপনগর বাজার, আশাশুনি, ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৪টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৪টা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান, প্রতাপনগর, আশাশুনি, সাতক্ষীরা

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা

২। শহীদের তিনটি ভাইয়ের জন্য পড়ালেখার ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং তাদের সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করা

৩। একটি স্থায়ী আয়ের উৎস তৈরি করে দেওয়া

শহীদ আলম সরদার

ক্রমিক : ৪৩১

আইডি : খুলনা বিভাগ ০৪৭

শহীদ পরিচিতি

শহীদরা আমাদের গৌরবের প্রতীক এবং তারা এমন নক্ষত্র যারা আমাদের আকাশে তাদের সুগন্ধিময় রক্ত দিয়ে সুগন্ধযুক্ত করে। শহীদদের পবিত্র রক্তের রঙে আমাদের পৃথিবী আলোকিত হয়। জাতীয় ইস্যুতে সারা জীবন উৎসর্গকারী মানুষ বিরল। তাদের কাছে সর্বোপরি নিহিত রয়েছে উচ্চ আদর্শ, তাদের জনগণের স্বাধীনতা। এমনই ছিলেন শহীদ আলম সরদার। জন্ম ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ হিজলা গ্রাম, আশাশুনি থানা, সাতক্ষীরা জেলায়। বাংলাদেশে গরিবের ঘরে জন্ম নিলে লেখাপড়া করার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়, কারণ বাংলাদেশে দীর্ঘদিন স্বাধীনতা অর্জন করলেও এই স্বাধীনতার স্বাদ গরিবের ঘরে এখনো পৌঁছায়নি। আলম সরদারও গরিব ঘরে জন্ম নেওয়ায় লেখাপড়ার তেমন সুযোগ পাননি। পরিবারের অভাব দূর করতে ছোটকাল থেকেই অন্যের খেতে কাজ করতেন। এটা স্পষ্ট যে তিনি অন্যদের থেকে আলাদা, কারণ তিনি সত্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। তিনি ছিলেন শুদ্ধচিত্ত, উদ্যমী, স্নেহশীল, সকলকে দেখে হাসতেন, কিন্তু তিনি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেন না, তিনি সর্বদা এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ঘরে স্ত্রীসহ এক ছেলে ও দুই মেয়েকে রেখে স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের বন্দুকের গুলিতে ৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে তিনি শাহাদাত বরণ করে।

শহীদ আলম সরদার ছিলেন প্রতিবাদের অন্যতম নায়ক। ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ৫ই আগস্ট পর্যন্ত চলতে থাকা এই বিক্ষোভগুলিতে, এক মুহূর্তের জন্যও আলাদা হননি, বিপরীতে, তার সহযোগী অংশগ্রহণকারীদের দাবি হিসাবে, তারা আলমের সাহসী কর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

ছাত্র জনতার কোটা সংস্কারের দাবিতে চলা স্বৈরাচার বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলের খবর শহীদ আলম সরদার প্রতিবেশীদের থেকে নিয়মিত পেতেন। তিনি সব সময় বলতেন, 'আমি যদি সুযোগ পেতাম অবশ্য এই আন্দোলনে যোগ দিতাম।' ০৫.০৮.২০২৪ তারিখে সারা দেশের মতো সাতক্ষীরা জেলাতেও আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে। উত্তাল হয়ে উঠে শহীদের রক্তে ভেজা এই জনপদের প্রতিটি প্রান্তর। দুপুরের পর থেকেই স্বৈরশাসকের পলায়নের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিকাল ৩টায় হাজার হাজার জনতার অংশগ্রহণে ছাত্র জনতার বিক্ষোভ মিছিলটি স্বৈরাচার পতনের বিজয় মিছিলে পরিণত হয়।

প্রতাপনগর বাজার থেকে বিজয় মিছিলটি সামান্য অগ্রসর হলে বিকাল ৪টায় প্রতাপনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা শেখ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে সশস্ত্র যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা মিছিলের উপর হামলা চালায় ও গুলি করে। এক পর্যায়ে শেখ জাকিরের পিস্তল ও শর্টগানের গুলিতে ঘটনাস্থলে অনেক মানুষ হতাহত হয়। শহীদ আলম সরদার মিছিলের সম্মুখ সারিতে থেকে অংশগ্রহণ করেন এবং গুলিতে মারাত্মক আহত হন। মিছিলকারী ছাত্র-জনতা তাকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করেন।শহীদ আলম সরদার নিয়মিত সকলপ্রকার সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন। সকলের কাছে তিনি পরোপকারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রতিবেশী ও স্ত্রীর কাছে সব সময় বলতেন-দোয়া করো আমি যেন শহীদ হতে পারি।

শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য

শহীদের ছেলের অনুভূতি

আশরাফুল ইসলাম শহীদের ছেলে যার বয়স মাত্র ১২ বছর। তার নিভৃত কান্নায় হয়তোবা প্রকৃতিও কেঁদে ওঠে। তার প্রশ্ন "আমার আব্বুকে কেন হত্যা করলো? আমার আব্বু তো কোনোদিন কারো ক্ষতি করেননি। মানুষের জন্য, ইসলামের জন্য তাঁর হৃদয় কাঁদতো, আর তাই তিনি ইসলামকে জীবনের মিশন মনে করেছিলেন। সত্য বলতে কী, এটাই ছিল আমার আব্বুর অপরাধ। কিন্তু কেন বড় অসময়ে আমার আব্বুকে প্রাণ দিতে হল?" কে দেবে এই প্রশ্নের জবাব?

শহীদের স্ত্রীর কথা

শহীদের স্ত্রী আসমা খাতুন বলেন, 'নিজেকে সান্ত্বনা দিই এভাবে যে, আমি একজন শহীদের স্ত্রী। আমার স্বামী যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যেয়ে জীবন দিল আমি আমার সন্তানদের সে অন্যায়ের প্রতিবাদে চিরদিন সক্রিয় রাখবো। বর্তমান সরকারের কাছে আমি আমার স্বামী হত্যার বিচার চাই। আমার সন্তানদের নিয়ে যেন আমি সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারি , সন্তানদের লেখাপড়া যেন চালিয়ে যেতে পারি সেজন্য সরকারের কাছে আমি সহযোগিতা কামনা করছি।

অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ আলম সরদার দিনমজুরী করে সংসার চালাতেন। ছোট তিনটি সন্তান নিয়ে স্ত্রী অন্যের বাড়িতে কাজ করে দিন কাটাচ্ছেন। ছোট একটি ছেলে ও একটি মেয়ে স্থানীয় মাদরাসা ও স্কুলে পড়াশুনা করে। অর্থনৈতিক দৈন্যদশায় ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।শহীদের স্ত্রী শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় তেমন কোনো কাজ করতে পারেন না। শহীদের এক ভাই, তিনিও দিনমজুর হওয়ায় বর্তমানে ভাইয়ের পরিবারকে খুব বেশি সহযোগিতা করতে পারছেন না।

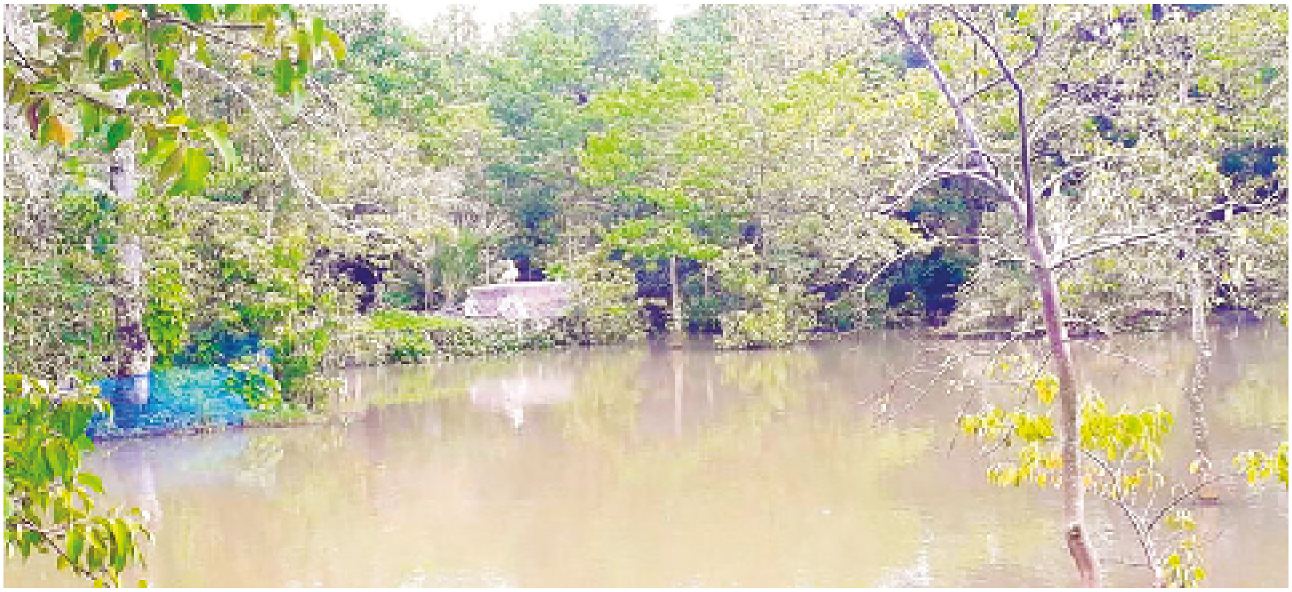

একনজরে শহীদের পরিচয়

শহীদের পূর্ণ নাম	: শহীদ আলম সরদার
জন্ম তারিখ	: ২১-০৩-১৯৮৮
জন্মস্থান	: নিজ জেলা ,সাতক্ষীরা
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: পঞ্চম শ্রেণী
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: হিজলা, ইউনিয়ন: প্রতাপনগর, থানা :আশাশুনি, জেলা : সাতক্ষীরা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম : হিজলা, ইউনিয়ন: প্রতাপনগর, থানা: আশাশুনি, জেলা: সাতক্ষীরা
পিতা, পেশা ও বয়স	: রহিম সরদার, দিনমুজুর, ৭০ বছর
মাতা, পেশা ও বয়স	: মোছা: রাশেদা বেগম, গৃহিনী, ৬৫ বছর
আয়ের উৎস	: দিনমুজুর
স্ত্রী	: আসমা খাতুন (৩২)
আঘাতকারীর	: আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ
আহত হওয়ার ও স্থান সময়	: প্রতাপনগর বাজার, আশাশুনি, ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৪টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৪টা
শহীদের কবর	: পারিবারিক কবরস্থান, হিজলা, প্রতাপনগর ,আশাশুনি, সাতক্ষীরা

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা

২। শহীদের তিনটি এতিম সন্তানের জন্য পড়ালেখার ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং তাদের সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করা

৩। একটি স্থায়ী আয়ের উৎস তৈরি করে দেওয়া

শহীদ আবুল বাশার আদম

ক্রমিক : ৪৩২

আইডি : খুলনা বিভাগ ০৪৮

শহীদ পরিচিতি

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম শহীদ আবুল বাশার আদম। তিনি সাতক্ষীরার আশাশুনি থানার কল্যাণপুর গ্রামে দিনমুজুর পিতা নূর হাকিম ঘরামি (৬৫) এবং গৃহিনী মাতা শাহানারার (৫৫) ঘরে ১০ জুন ২০০৬ জন্মগ্রহণ করেন। এপিএস ডিগ্রি কলেজের ছাত্র ছিলেন শহীদ আবুল বাশার আদম। ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিজয় অর্জিত হলে সারাদেশের মতো বিজয় মিছিল বের হয় সাতক্ষীরার আশাশুনি থানার প্রতাপনগর বাজারেও। সশস্ত্র যুবলীগ ও ছাত্রলীগ নেতারা আনন্দ মিছিল লক্ষ করে গুলি চালালে অনেক আহতের মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন আবুল বাশার আদম।

ব্যক্তিগত জীবন

এপিএস ডিগ্রি কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন শহীদ আবুল বাশার আদম। দিন মুজুর পিতা নূর হাকিম ঘরামির সংসার চলতে চায় না। তিন ছেলে ও এক মেয়ের বড় সংসার চলে অতিকষ্টে। তাছাড়া সবাই স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করে। শহীদ আবুল বাশারের এক ভাই মো. চঞ্চল হোসেন পড়াশোনা করছেন প্রতাপনগর কলেজের একাদশ শ্রেণীতে এবং বিল্লাল হোসেন ও বোন সুফিয়া খাতুন যথাক্রমে দশম এবং নবম শ্রেণীর ছাত্র।

যেভাবে শহীদ হন আবুল বাশার আদম

বাংলাদেশের দক্ষিণের জেলা সাতক্ষীরার প্রতাপনগর বাজার। ৫ আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার বিজয়ের খবর সেখানে পৌঁছাতে সময় লাগে। বিকেল ৪টা। তৎক্ষণাৎ বের হয় বিজয়। মিছিলটি পৌঁছায় সাতক্ষীরার আশাশুনি থানার প্রতাপনগর বাজারে। বাজারে আরো লোকজন যোগ দেয় মিছিলে। হাজার হাজার জনতা। বাজার থেকে মিছিলটি অগ্রসর হলে প্রতাপনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে সশস্ত্র যুবলীগ ও ছাত্রলীগ নেতারা মিছিলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে অনেকে আহত হন। গুলিবিদ্ধ হন শহীদ আবুল বাশার আদমও। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আবুল বাশার অদমের পিতার অশ্রুসিক্ত কথা

আবুল বাশার অদম নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী, একই সাথে সাহসী এবং স্নেহশীল ছিল। তার কথায় গুরুত্ব এবং ভারসাম্যপূর্ণ প্রকাশ পেতো তার যা বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করে। সেই প্রফুল্ল মুখ কেউ ভুলতে পারবেনা যা তাকে পরিচিত এবং সকলের মধ্যে প্রিয় করে তুলেছে। সে তার ভাইদের সাথে তার বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিল । তাকে কোনো কাজ দিলে সেই কাজের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের সঠিকতার প্রতি আগ্রহী ছিল এবং কাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতো। আমার আবুল বাশার আমার কলিজা, আমার জীবন।তাকে ছাড়া আমি এখন কিভাবে বাচবো এত ভালো সন্তান আমি হারিয়ে ফেললাম! তবে আমার সন্তান হারানোর পরেও আমি খুশি এই কারণে যে দীর্ঘ ১৬ বছর পর বাংলাদেশের স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে আমার ছেলে শহীদ হিসেবে অমর হয়ে থাকবে। কিন্তু শেখ হাসিনাকে মানুষ সন্ত্রাসী গণহত্যাকারী হিসাবেই জানবে। আমি আমার কলিজার টুকরা আবুল বাসার আদম হত্যার বিচার চাই। বর্তমান সরকার যেন সর্বপ্রথম আমার ছেলেসহ সারাদেশের কোমল প্রাণ ছাত্রদের যারা হত্যা করেছে তাদের বিচার করে।

শহীদ সম্পর্কে তার ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া

শহীদ আবুল বাশার আদমের ছোট ভাই চঞ্চল হোসেন বলেন, "সুযোগ পেলেই সে ফুটবল নিয়ে মাঠে দৌড়ে যেত। স্কুলের হয়ে, কলেজের হয়ে, গ্রামের হয়ে সে ফুটবল খেলতে যেত। খেলায় জিতলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকত না। সংসারের অভাব-অনটন, আব্বার বকাঝকাও তাকে একটুকু বিচলিত করত না। একটু একরোখা ছিল। শুরু থেকেই সে আন্দোলনের সাথে ছিল। কিন্তু মিছিল শেষে তার এই পরিণতি হবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। ভাইকে তো আমরা আর ফিরে পাবো না। তবে আমরা ঐ খুনিদের বিচার চাই। আব্বা-মা খুবই ভেঙে পড়েছেন।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ আবুল বাশার আদমের পিতা নূর হাকিম ঘরামি পেশা একজন দিনমুজুর। তাদের নিজস্ব কোনো জমিজমা নেই। কিন্তু সংসারের সদস্য ছিলেন ছয়জন। এখন পাঁচজন। অথচ সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি শহীদের পিতা নূর হাকিম ঘরামি। তাছাড়া শহীদের মাতাও দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ। তিনি সংসারের কোনো কাজে সহায়তা করতে পারেন না। তাছাড়া নূর হাকিম ঘরামির ছেলে-মেয়েরা সবাই স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করছেন। সংসার খরচ এবং ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার খরচ জোগাতে প্রতিনিয়ত হিমশিম খান শহীদের পিতা নূর হাকিম ঘরামি।

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: শহীদ আবুল বাশার আদম
পিতা	: নূর হাকিম ঘরামি
মাতা	: শাহানারা
পেশা	: শিক্ষার্থী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১০ জুন ২০০৬
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট
শাহাদাৎ বরণের স্থান	: আশাশুনি থানার প্রতাপনগর বাজার
দাফনের স্থান	: নিজ গ্রাম কল্যাণপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: কল্যাণপুর, প্রতাপ নগর, আশুগুনি, সাতক্ষিরা
ভাইবোন ও সন্তানের বিবরণ	: দুই ভাই ও এক বোন

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা
২। একটি স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া
৩। শহীদের অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

শহীদ মোঃ আসিফ হাসান

ক্রমিক : ৪৩৩
আইডি : খুলনা বিভাগ ০৪৯

"আমি শহীদ হলে তোরা আমার লাশ বাড়িতে পৌঁছে দিস কিন্তু তোরা বিজয় নিয়ে ফিরবি"

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ আসিফ হাসান ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার অন্তর্গত নোয়াপাড়া ইউনিয়নের আস্কারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ মাহমুদ আলম ও মাতার নাম মোছাঃ মরিয়ম বেগম। নিজগ্রামের আস্কারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই হাতেখড়ি হয় মোঃ আসিফ হাসানের। ছোট থেকেই আসিফ ছিলেন বেশ ভদ্র ও পরোপকারী। পাশাপাশি ছিলেন ইসলামের প্রতি বেশ অনুরক্ত ও ধার্মিক। নিজে যেমন অন্যায় করতেন না, তেমনি অপরের কোনো অন্যায় দেখলেও সাথে সাথে প্রতিবাদ করতেন। এজন্য এলাকার ছোট বড় সবার স্নেহ আর ভালোবাসার পাত্র ছিলেন তিনি।

দীপ্তিময় শহীদ আসিফের সে দিনের গল্প

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্র জনতার চলা প্রতিটি কর্মসূচিতে শহীদ আসিফ হাসান প্রতিদিন অংশগ্রহণ করতেন। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি আর শান্তিপূর্ণ সমাবেশে পুলিশ ও স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের অনুগত সন্ত্রাসীদের একের পর এক হামলার কথা শোনা যাচ্ছিল দেশজুড়ে। আন্দোলন তখন ছড়িয়ে গেছে সারা দেশে। দেশের প্রতিটি স্কুল-কলেজ, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তখন সরকারের জঘন্য হামলা আর ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে এসেছে। ঘটনার রেশ ছড়িয়ে গিয়েছিল উত্তরাতেও, শহীদ আসিফ আন্দোলনের শুরু থেকে প্রতিদিনই উত্তরার বিভিন্ন পয়েন্টে মিছিলে নেতৃত্ব দিতেন এবং বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আর সবাইকে আন্দোলনে আসতে উৎসাহ দিতেন। দিনটি ছিল ১৮ই জুলাই, ২০২৪ সেদিন সকালে তিনি ও তাঁর অন্যান্য বন্ধুরা মিলে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

ঐদিন সকাল ১১ টা থেকে তিনি উত্তরার বিএনএস সেন্টারের সামনে স্থানীয় বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলিত ছাত্র সমাজকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পাশাপাশি আন্দোলনে অংশ নেয়া ছাত্রছাত্রীদের পানি, বিস্কুট, কেক সরবরাহ করছিলেন। এমন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনেও একের পর এক কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট আর শর্ট গানের গুলি চলতে থাকে। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে এমন নৃশংস হামলার কথা হয়তো ইতিহাসের কুখ্যাত নৃশংসতাগুলোকেও ছাপিয়ে যায়। দুপুর আনুমানিক ১ টায় পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার মিছিলে এবার একের পর এক গুলিবর্ষণ করে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী, সাধারণ জনতা ও পথচারী আহত হন। তাদের অনেককেই হাসপাতালে পৌঁছে দিচ্ছিলেন শহীদ আসিফ। এক পর্যায়ে আহত হলেন তাঁর বন্ধু শাহ আলম। বন্ধুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও একপ্রকার তাকে জোর করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন আসিফ। নিজে রয়ে গেলেন আন্দোলনের মাঝেই। তখনও মিছিলের সম্মুখভাগে তিনি; মিছিলের সামনের দিকে থাকায় এবার ঘাতক পুলিশের লক্ষ্যবস্তু হয় সে। ঠিক তার বুক বরাবর তাক করে একের পর এক গুলি করা হল। শর্টগানের তিনটি তাজা গুলি আর অসংখ্য রাবার বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেল তার বুক। শহীদ আসিফ আহত হয়ে উত্তরার বিএনএস সেন্টারের সামনের মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। স্থানীয় ছাত্র-জনতা তাকে দ্রুত উত্তরার আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। দীর্ঘক্ষণ আই সি ইউ-তে থাকার পর অবশেষে বিকাল ৫ টায় কর্তব্যরত চিকিৎসক জানালেন, দুনিয়ার সফর শেষ হলো আসিফের। এখন থেকে তিনি শহীদ আসিফ।

শহীদ সম্পর্কে ছোট ভাই রাকিব হাসান ও সহযোদ্ধাদের বক্তব্য

শহীদ আসিফ হাসানের সাথে আন্দোলনে অংশ নেওয়া বন্ধুরা বলেন, "আসিফ বলেছিল আমি শহীদ হলে তোরা আমার লাশ বাড়িতে পৌঁছে দিস কিন্তু তোরা বিজয় নিয়ে ফিরবি।" মুঠোফোনযোগে শহীদ আসিফ হাসানের ছোট ভাই রাকিবের সাথে কথা হলে সে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলে, "আমার ভাই একটু জেদি ছিল কিন্তু ন্যায়পরায়ণ আর মেধাবী ছিল। তাঁর সামনে কোনো অন্যায় হলে ভাইয়া সহ্য করতে পারতেন না। পাশাপাশি খুব অতিথি পরায়ণ ছিল। ভাইয়া, খুব খেলাধুলা করতো আর এলাকার সবাইকে সব সময় মাতিয়ে রাখতো।"

নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, শহীদ আসিফ হাসান এর স্মৃতিফলক উন্মোচন ও আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় আয়োজিত বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠানে শহীদ আসিফকে নিয়ে এমন অনেক আবেগঘন স্মৃতির গল্প তুলে ধরেন, তাঁর বন্ধু ও সহযোদ্ধারা। সে অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন, "যখন শহীদ আসিফকে দেখি, যখন শহীদের মর্যাদা বুঝি, তখন বেঁচে থাকাটাই অপরাধের মনে হয়।"

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ মোঃ আসিফ হাসানের পরিবার মোটামুটি স্বাবলম্বী। তাঁর বাবা মৎস্য ব্যবসার সাথে জড়িত আর মা গৃহিণী। মূলত অন্যের পুকুর লিজ নিয়ে মৎস্য ব্যবসা করলেও স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের দিন চলে যায়। তাই পাঁচ সহোদর ভাই-বোন আর পিতা-মাতাকে নিয়ে ছিল তাঁদের সুখের সংসার। শহীদ আসিফের বড় তিন বোন বিবাহিত আর ছোট ভাই রাকিব হাসান সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্র।

Rakibul Ahasan Rakib 19h
Sohid Asif
18 july

Md Monyrul Islam 23h
Bijoy Sarkar Try it
স্বাধীন
শহীদ আসিফ হাসান

একনজরে শহীদের পরিচয়

শহীদের পূর্ণনাম	: মো: আসিফ হাসান
জন্ম তারিখ	: ১ জানুয়ারি, ২০০৩
পেশা	: নর্দান ইউনিভার্সিটি, ইংরেজি বিভাগ, স্নাতক চতুর্থ বর্ষ
পিতার নাম	: মো: মাহমুদ আলম
পিতার পেশা ও বয়স	: ক্ষুদ্র ব্যাবসা, ৭০ বছর
মাতার নাম	: মোসা: মরিয়ম বেগম
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৬০ বছর
পরিবারের মাসিক আয়	: ২০০০০ টাকা
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৬ জন
শাহাদাতের তারিখ	: ১৮ জুলাই ২০২৪

ভাই-বোনের বিবরণ

১. নাম: মাকসুদা মুন্নী, বয়স: ৪০ বছর, পেশা: গৃহিণী, শহীদের সাথে সম্পর্ক: বোন

২. নাম: মুন নাহার বেগম, বয়স: ৩৫ পেশা: গৃহিণী, শহীদের সাথে সম্পর্ক: বোন

৩. নাম: জেসমিন সুলতানা, বয়স: ৩০, পেশা: গৃহিণী, শহীদের সাথে সম্পর্ক: বোন

৪. নাম: রাকিব হাসান, বয়স: ২২ পেশা: ছাত্র, শ্রেণি: স্নাতক প্রথম বর্ষ, শহীদের সাথে সম্পর্ক: ছোট ভাই

স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম: আস্কারপুর, ইউনিয়ন: নাওয়াপাড়া, উপজেলা: দেবহাটা, জেলা: সাতক্ষীরা

পরিবারটির সহযোগিতা প্রসঙ্গে পরামর্শ

১। শহীদের বাবাকে তার ব্যবসা সম্প্রসারিত করার স্বার্থে কিছু অর্থ সহযোগিতা করা যেতে পারে

২। শহীদের গ্রামে তাঁর জন্য কল্যাণময় কোনো সামাজিক কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে

শহীদ মেহেদী হাসান রাব্বি

ক্রমিক : ৪৩৪

আইডি : খুলনা বিভাগ ০৫০

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মেহেদী হাসান রাব্বি ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সালে মাগুরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে ভরা গ্রামের নাম বরুনাতৈল, গ্রামটি মাগুরা জেলা সদরের মাগুরা পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রামেরই মৃত ময়েন উদ্দিন বিশ্বাস ও মোছা: সালেহা বেগমের সন্তান তিনি। ছোট থেকে খুব শান্ত স্বভাবের ছিলেন তিনি। এলাকার সবার সাথে ছোট থেকেই সুসম্পর্ক তাঁর। শহীদ মেহেদী হাসানের আরও তিন সহোদর ভাইয়ের ও দুই বোনের সাথে বেশ আনন্দঘন শৈশব কেটেছে তাঁর। এছাড়াও তাঁর আরও দুই বোন রয়েছে। পিতা কৃষি কাজের সাথে জড়িত থাকলেও মধ্যবিত্ত সংসারটিতে সুখের কমতি ছিল না।

অসীম সাহসী মেহেদী হাসান রাব্বির, সেদিনের বীরত্বগাঁথা

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বৈষম্য মূলক কোটা সংস্কারের দাবিতে '২৪ এর জুলাই মাসের শুরু থেকেই ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে থাকে। অল্প দিনের মধ্যেই কোটা সংস্কার আন্দোলন সারা দেশের বৈষম্যের শিকার সাধারণ মানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকায়, শহীদ মেহেদী হাসান রাব্বি এলাকার মানুষদের সংগঠিত করে মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। প্রতিদিন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করতেন এবং তাদের রাষ্ট্র সংস্কারের যৌক্তিকতা বুঝাতেন। পাশাপাশি ছাত্র-জনতার স্বৈরাচার বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল সহ সকল কর্মসূচিতে শহীদ মেহেদী হাসান রাব্বি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন।

৪ আগস্ট, ২০২৪। সেদিন সারা দেশের মতো মাগুরার সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার একদফা দাবির সাথে একাত্ম হয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। উত্তাল হয়ে উঠে মাগুরার রাজপথ। সমগ্র জেলার সংগ্রামী মানুষ সংগঠিত হয়ে মিছিল সহকারে মাগুরা শহরে দিকে অগ্রসর হয়। বিপুল সংখ্যক ছাত্র জনতার এই মিছিল সকাল ১১ টায় স্থানীয় পারনান্দুয়ালী এলাকায় ঢাকা-মাগুরা সড়কে উঠে শহরের দিকে আসতে থাকে। শহীদ রাব্বি এই বিক্ষোভ মিছিলের সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব প্রদান করছিলেন। বেলা তখন সাড়ে ১২টা, পুলিশ সাধারণ ছাত্র-জনতার বিশাল মিছিল দেখে প্রথমে পিছু হটে যায় তখন সমগ্র এলাকা আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার দখল। ঠিক এই সময় স্বৈরাচারী সরকারের যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা পুলিশকে সাথে নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় নিরীহ ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ-মিছিলে হামলা চালায় আর মুহুর্মুহু গুলি বর্ষন করতে থাকে। গুলিতে অনেক মানুষ আহত হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়তে থাকেন। শহীদ রাব্বি, তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সেসব আহত ছাত্র-জনতাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে। এমনই এক সময় পুলিশের গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হন শহীদ মেহেদী হাসান রাব্বির ভাতিজা কলেজ পড়ুয়া খালিদ। তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তিনি। পাশাপাশি আন্দোলনরত একজনের মাথায় ইটের আঘাতে জখম হলে, শহীদ রাব্বি নিজেই তাকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যান। আর ঠিক তারপর পরেই, মাগুরার দুই কুখ্যাত সাংসদ সাইফুজ্জামান শিখর ও বীরেন সিকদারের পালিত সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হামিদুলের নেতৃত্বে করা একটি গুলি এসে লাগে তাঁর পেটের বাম দিকে। তখনো ঘটনার ভয়াবহতা আঁচ করতে পারেননি তিনি, তবুও নিজ শরীরের রক্তক্ষরণ আর ব্যথার তীব্রতায় আহত অবস্থায় ঢাকা-মাগুরা মহাসড়ক থেকে ওয়াপদা ব্রীজ এলাকায় নিজেই হেঁটে আসার পর মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। এরপর স্থানীয়রা তাঁকে দ্রুত মাগুরা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শাহাদতের সুধাপান করেন তিনি। আর সেই সাথে রচিত হয় অসীম সাহসী মেহেদী হাসান রাব্বির, শহীদ হিসেবে নতুন বীরত্বগাঁথা।

> "বীরত্বগাঁথা লিখতে গিয়ে বিস্মিত হই আমি, শহীদ তোমার আত্মত্যাগ বড্ড ভীষণ দামী।"

জানাযা ও দাফন

পরবর্তীতে নিজ গ্রামে শহীদ মেহেদী হাসান রাব্বির জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে তাঁকে বারুনাতৈল পারিবারিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

শহীদ পরিবারের বর্তমান আর্থিক অবস্থা

শহীদ মেহেদী হাসান রাব্বির নিজস্ব ইন্টারনেট সরবরাহের ব্যবসা ছিল। সেখান থেকেই উপার্জিত অর্থ দিয়ে সংসার চলে তাঁদের। আগে তাঁর বাবা পরিবারে কিছুটা আর্থিক সহযোগিতা করলেও, বছর দুয়েক আগে বাবা মারা যাওয়ার পর তিনিই ছিলেন এই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁর পরিবারে এখন শুধু রইল মা মোসা: সালেহা বেগম আর নববিবাহিতা স্ত্রী মোসা: রুমি খাতুন। শহীদ মেহেদীর স্ত্রী এখন অন্তঃসত্তা, তাই অনাগত সন্তানকে নিয়ে সীমাহীন দুশ্চিন্তায় আছেন তিনি। মেহেদীর স্ত্রীর কাছে পরিবারের বর্তমান আর্থিক অবস্থার কথা জানতে চাইলে তিনি জানান, "মেহেদির ইন্টারনেট সরবরাহের ব্যবসা এখন ওর ছোট ভাই দেখাশুনা করছে। সেখান থেকে অল্প কিছু সহযোগিতা পাই।"

শুধু জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে অন্যান্য সকল শহীদ পরিবারকে দেয়া দুই লক্ষ টাকা আমরাও পেয়েছি। আমার স্বামী জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-সম্পাদক ছিল, প্রায় দুই মাস হতে চলল অথচ এখন পর্যন্ত কেউ ফোন করে খোঁজ-খবরও নিলো না।" পাশাপাশি সন্তান হারিয়ে শোকে কাতর হয়ে থাকা শহীদ জননী জানান, "আমার মেহেদী আমার খুব যত্ন করতো, আমার সব ওষুধের খরচ দিতো। আমার কখন কি লাগবে, তা শুনতো। আমাকে দেখার আর কেউ থাকলো না।"

একনজরে শহীদের পরিচয়

শহীদের পূর্ণনাম	: মো: মেহেদী হাসান রাব্বি
জন্ম তারিখ	: ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯১
পেশা বা পদবী	: ইন্টারনেট সংযোগ সমন্বয়কারী, ব্যবসায়ী
পিতার নাম	: মৃত মো: মইনুদ্দিন বিশ্বাস
মাতার নাম	: মোসা: সালেহা বেগম
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৫৫ বছর
স্ত্রীর নাম	: মোসা: রুমি খাতুন
স্ত্রীর পেশা ও বয়সা	: গৃহিনী, ২২ বছর, (স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা)
পরিবারের মাসিক আয়	: ২০০০০ টাকা
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন
আহত হওয়ার স্থান	: ঢাকা-মাগুরা মহাসড়ক
নিহত হওয়ার স্থান	: মাগুরা সদর হাসপাতাল
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৪ আগস্ট, ২০২৪
নিহত হওয়ার সময়কাল	: ৪ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর ১.৩০টা
শহীদের কবরের অবস্থান	: বারুনাতৈল পারিবারিক কবরস্থান
স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: বারুনাতৈল, উপজেলা: মাগুরা সদর, পৌরসভা: মাগুরা পৌরসভা, ওয়ার্ড নম্বর: ০১, জেলা: মাগুরা

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা
২। শহীদের স্ত্রীর জন্য একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
৩। শহীদের অনাগত সন্তানের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা

শহীদ মো: আল আমিন

ক্রমিক: ৪৩৫

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৫১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোহাম্মদ আল-আমিন ১৯৮৯ সালের ১০ জানুয়ারী মাগুরা জেলার ছবি মতো সুন্দর গ্রাম বারুনাতৈলে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটি মাগুরা পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পিতার নাম মোঃ আবু তালেব বিশ্বাস ও মাতার নাম মোছাঃ সূর্য বেগম। দরিদ্র সিএনজি চালক পিতার ঘরে জন্ম তাঁর। তাই ছোট থেকেই দরিদ্রতার সাথে লড়াই করে জীবনধারণ তাঁদের। তাঁর একমাত্র সহোদর ভাইয়ের নাম মোঃ রুহুল আমিন। তাঁর সাথেই আনন্দঘন পরিবেশে কেটেছে তার শৈশব।

শাহাদাতের সেই মহাক্ষণ
শহীদ আল আমীন খুব বেশী লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি। তাই তিনি রাস্তাঘাটে হকারী করে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। হকারী করে অল্প যা আয় হতো, তা দিয়ে অতি কষ্টে পরিবারের ব্যয়ভার বহন করতে হতো তাকে। সবার কাছে তিনি পরোপকারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্র জনতার আন্দোলন শুরু হলে শহীদ আল আমিন হকারীর পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। অল্পদিনের মধ্যেই কোটা সংস্কার আন্দোলন সারা দেশের মানুষের গণ আন্দোলনে পরিণত হয় এবং সারা দেশে তা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে।

ছাত্র জনতার স্বৈরাচার বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলেও শহীদ আল আমিন নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। হকারীর মাঝেই তিনি নিয়ম করে মিছিলে যোগ দিতেন। দিনটি ৫ আগস্ট, ২০২৪। সেদিন সারা দেশের মতো সাভারের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার লংমার্চ কর্মসূচির সাথে একাত্ম হয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। শহীদ আল আমীন সাভার থানার পাশে অনুষ্ঠিত ছাত্র জনতার স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। সাভারের আশে পাশের সকল মানুষ একত্রিত হয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেন এবং সমগ্র সাভার বাজার এবং অলি গলি সকল জায়গা লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে। মিছিলে মিছিলে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদী স্লোগানে উত্তাল হয়ে উঠে সাভার বাজার, থানা রোড এলাকাসহ সমগ্র অঞ্চল।

বেলা ১ টার দিকে স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক পুলিশ ও র‍্যাব হঠাৎ করে মিছিলে টিয়ার শেল, সাউন্ড গ্রেনেড ও গুলিবর্ষণ শুরু করে। শহীদ আল আমিনসহ শত-শত লোক মুহূর্তেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় ছাত্র-জনতার সহায়তায় মারাত্মক আহত অবস্থায় গুরুতর আল আমিনকে সাভারের স্থানীয় এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। বার বার চেষ্টা করেও তাঁর পালস পাওয়া যাচ্ছিল না। ডক্তাররা কয়েক বার বুকে চাপ দিয়ে চেষ্টা করেছেন কিন্তু শহীদ আল আমিনের আর জ্ঞান ফেরেনি। বিকাল ৩ টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুঃসহ বেদনার কণ্টক পথ বেয়ে
শোষণের নাগপাশ ছিঁড়লে যাঁরা,
আমরা তোমাদের ভুলবো না,
আমরা তোমাদের ভুলবো না।

জানাজা ও দাফন
স্ত্রী ও পরিবারের কিছু নিকটাত্মীয় ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় হাসপাতালের মর্গ থেকে তাঁর মরদেহ নিয়ে গ্রামের বাড়ি মাগুরার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পরদিন ৬ আগস্ট সকালে শহীদের জানাজার নামাজ নিজ গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সকল শ্রেণী পেশার মানুষ শহীদের জানাজায় অংশগ্রহণ করেন। জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে শহীদ আল আমিনকে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও মায়ের অনুভূতি
শহীদ আল আমিনের প্রতিবেশীরা বলেন, "তিনি সদালাপী ও বন্ধুবাৎসল ছিলেন। নিজের অল্প আয় রোজগার নিয়ে তার কোনো অভিযোগ বা আক্ষেপ ছিল না।"

শহীদের মা বলেন, "আমার ছেলে খুব সততার সাথে জীবন যাপন করতো এবং নিয়মিত আমার জন্য টাকা পাঠাতো। যখনই বাড়িতে আসতো আমার জন্য কত ফলফলাদি নিয়ে আসতো! এখন আমার পরিবারে দুরবস্থা। কে আমাদের দেখবে?"

শহীদের পরিবারের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা
শহীদ আল আমীনের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো না। তিনি সাভার এলাকায় হকারী ও দিনমজুরী করে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। বর্তমানে দৈনন্দিন আয়ের কোনো ব্যবস্থা নাই। পরিবারে অন্য কোনো উপার্জনক্ষম ব্যক্তি না থাকায় এখন তাদের অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে হয়।শহীদ আলা আমিনের পরিবারের অন্য সদস্যরা অর্থাৎ তাঁর মা-বাবা গ্রামের বাড়ি মাগুরাতে থাকেন। শহীদ আল আমিনের ষাটোর্ধ্ব বাবা এখনও সিএনজি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাই শহীদ আল-আমীনকে নিয়মিত গ্রামের বাড়িতেও আর্থিক সহযোগিতা করতে হতো। শহীদের স্ত্রী সুমি বেগম বর্তমানে অন্যের বাসা বাড়িতে কাজ করেন। দুই মেয়েকে নিয়ে তিনি অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। বড় মেয়েটি প্রতিবন্ধী হওয়ায় তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। ছোট মেয়ে নিয়মিত স্কুলে যায় কিন্তু টাকার অভাবে তার স্কুলে পড়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শহীদ আল আমিনের পরিবারে অন্য কোনো উপর্জনক্ষম ব্যক্তি না থাকায় এবং পরিবারের প্রধান ব্যক্তি শহীদ হওয়ায় পরিবারটি শোকে স্তব্ধ হয়ে আছে।

একনজরে শহীদের পরিচয়

শহীদের পূর্ণনাম	: মো: আল-আমীন
জন্ম তারিখ	: ১০ জানুয়ারী, ১৯৮৯
পেশা	: হকারী
পিতার নাম	: মো: আবু তালেব বিশ্বাস
পিতার পেশা ও বয়স	: সিএনজি চালক, ৬৫ বছর
মাতার নাম	: মোসা: সালেহা বেগম
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৫৫ বছর
স্ত্রীর নাম	: সুমী বেগম
স্ত্রীর পেশা ও বয়স	: গৃহিনী, ২৮ বছর
পরিবারের মাসিক আয়	: ৫০০০ টাকা
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন
সন্তানদের নাম, বয়স, পেশা-প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্ক	
	: ১. মোসা: সাথী খাতুন অন্তরা (১৬), (প্রতিবন্ধী তাই পড়াশোনা বন্ধ), শহীদের মেয়ে
	: ২. মোসা: স্বর্ণী খাতুন (১১), সাভার প্রাইমারি স্কুল, ২য় শ্রেণি, শহীদের মেয়ে
আহত হওয়ার স্থান	: ঢাকা-মাগুরা মহাসড়ক
নিহত হওয়ার স্থান	: মাগুরা সদর হাসপাতাল
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪
নিহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর ১.৩০টা
শহীদের কবরের অবস্থান	: বারুনাতৈল পারিবারিক কবরস্থান
বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বারুনাতৈল, উপজেলা: মাগুরা সদর, পৌরসভা: মাগুরা পৌরসভা ওয়ার্ড নম্বর: ০১, জেলা: মাগুরা

প্রস্তাবনা

১। শহীদের পরিবারের এতিম দুই শিশু ও তাঁর স্ত্রীর জন্য আয়ের কোনো ব্যবস্থা করে দেয়া

২। শহীদের এক মেয়ে প্রতিবন্ধী, তার জন্য বিশেষ সহযোগিতার ব্যবস্থা করা

৩। গ্রামে থাকা শহীদের সিএনজি চালক পিতা ও অসহায় মায়ের জন্য আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা

শহীদ মো: মারুফ হোসেন

ক্রমিক: ৪৩৬

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৫২

শহীদ পরিচিতি

মারুফ হোসেন ছিলেন কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মেধাবী ছাত্র, যিনি তার ইন্টার্নশিপের জন্য রাজধানী ঢাকায় এসেছিলেন। ২০২৪ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হলে, তিনি শুরু থেকেই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই আন্দোলনটি কোটা বৈষম্যের বিরুদ্ধে হলেও সময়ের সাথে তা শেখ হাসিনার সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। অবশেষে ৫ আগস্ট ২০২৪, এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। শহীদ মারুফ এই ঐতিহাসিক বিজয়ের অংশীদার, যদিও তিনি নিজে তা দেখে যেতে পারেননি।

জন্ম ও পরিচিতি

মারুফ হোসেন কুষ্টিয়ার খোকসা পৌর এলাকার থানা পাড়ার শরিফ উদ্দীনের বড় ছেলে। কুষ্টিয়া পলিটেকনিক থেকে শেষ বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়ে ইন্টার্নশিপ করতে তিনি ঢাকায় আসেন, যেখানে রামপুরা বনশ্রী এলাকায় বন্ধুদের সাথে একটি মেসে থাকতেন। মারুফের পরিবার তার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। মেধাবী ছেলে ইন্টার্নশিপ শেষে চাকরি করে পরিবারের হাল ধরবেন, এটাই ছিল তাদের আশা।

ব্যক্তিগত জীবন

মারুফের বাবা ছিলেন ফুটপাতে ফল বিক্রেতা, আর্থিক কষ্টের মাঝেও তিনি তার পরিবার চালানোর চেষ্টা করতেন। মারুফ ফ্রিল্যান্সিং করে বাবাকে আর্থিক সহযোগিতা করতেন এবং সবসময় বাবা-মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, "আর কিছুদিন ধৈর্য ধরো, চাকরি নিয়ে সব ঠিক করব।" মারুফ ছিলেন ভদ্র ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ। বাবা রাগ হলে তিনি চুপচাপ থাকতেন এবং মাকে বলতেন, "এখন বাবার সাথে কথা বলার দরকার নেই, রাগ কমলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে জনগণ নানান অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমের নির্মম ভুক্তভোগী। এদেশের মুক্তিকামী জনতা সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে এহেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই সাথে হুংকার দিয়ে সংগ্রামী জনতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ছাত্রবৃন্দ। উপরন্তু গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সাক্ষী, দেশের ক্রান্তিকালে বরাবরই ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে।

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতি, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ সালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয়। আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, পুলিশ ও RAB সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

আন্দোলনে যোগদান

কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। মারুফ শুরু থেকেই কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিয়মিত অংশ নিতেন।

শাহাদাত বরণ

১৯ জুলাই, ২০২৪, মারুফের জীবনের শেষ দিন ছিল। এর আগের দিন টিয়ারশেলের ধোঁয়া খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেদিন সকাল ১১টায় মায়ের সাথে তার শেষ কথা হয়। তখনো তিনি খাননি। মারুফ বলেছিলেন, ঢাকার অবস্থা ভালো না। এ কথা শুনে মা সতর্ক করে বলেছিলেন, বাপ বাইরে বার হবা না, সে সময় সায় দিয়েছিলেন মারুফ। তখন মাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এই কথা বলেছিলেন। বিকেল ৩টার দিকে রামপুরা বনশ্রীর সামনের আন্দোলনে অংশ নেন।

সেখানে স্বৈরাচারী ফ্যাসীস্ট সরকারের তবেদার ঘাতক পুলিশ, বিজিবি এবং র‍্যাব নির্বিচারে গুলি করতে থাকে। এসময় একটি গুলি তার পিঠে লেগে বুক দিয়ে বেরিয়ে যায়। বন্ধুরা তাকে উদ্ধার করে নিকটস্থ এডভান্স ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরদিন ২০ জুলাই, সকালে ময়নাতদন্ত ছাড়াই তার মরদেহ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাতে খোকসা পৌর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে শিক্ষকের বক্তব্য

খোকসা সরকারী পাইলট স্কুলের শিক্ষক বলেন, মারুফ হোসেন নম্র ভদ্র ও ধর্মভীরু ছিল। বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে সে ভূমিকা পালন করত। খোকসা থানা মসজিদে প্রতি বছর তার উদ্যোগে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করতেন। তাঁকে হারিয়ে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

স্মৃতি কথা

মারুফের বাবা শরিফ উদ্দীন ছেলের শহীদ হওয়ার ছয় ঘণ্টা আগে তার সাথে কথা বলেছিলেন। তিনি কখনো ভাবেননি যে সেটাই হবে তাদের শেষ কথা। তিনি ছেলের মুখ দেখে বিদায় জানান, কিন্তু ভীষণ কষ্টে থাকা শরিফ উদ্দীন, ছেলের ক্ষত চিহ্ন দেখতে পারেননি। ছোটবেলায় মারুফের প্রিয় সাইকেলটি এখনো ঘরে আছে, কিন্তু সাইকেলের মালিক আর নেই। মারুফের পরিবারের সদস্যরা এখনো সন্ধ্যার পর ফোনের অপেক্ষায় থাকেন, কিন্তু সেই ফোন আর আসে না। মারুফের স্কুলের শিক্ষকরা এবং প্রতিবেশীরা তাকে একজন নম্র, ভদ্র এবং ধর্মভীরু মানুষ হিসেবে স্মরণ করেন। তিনি সবসময় সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নিতেন এবং খোকসা থানা মসজিদে প্রতি বছর ইফতার মাহফিলের আয়োজন করতেন।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ মারুফ হোসেন এর বাবা খোকশা বাজারের পাশে নিজের ছোট্ট একটি জমিতে ঘর করে থাকেন। মারুফের মা এবং ছোট বোনসহ কোনো রকম জীবনযাপন করেন। ছোট মেয়ের পড়াশুনা এবং পরিবারের খরচ মেটাতে অনেক কষ্ট হয় তার। শহীদের বাবা ক্ষুদ্র ফল-ব্যবসায়ী। ফুটপাতে ফল বিক্রি করেন। ব্যাবসা থেকে যা আয় হয় তাই দিয়ে সংসারের খরচ পরিচালনা করেন। শহীদ মারুফ বেঁচে থাকতে ফ্রিল্যান্সিং করে বাবাকে আর্থিক সহযোগিতাও করতেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মো: মারুফ হোসেন
Name: MD MARUF HOSSAIN
Date of Birth: 15 Oct 2004
ID NO: 3774420578

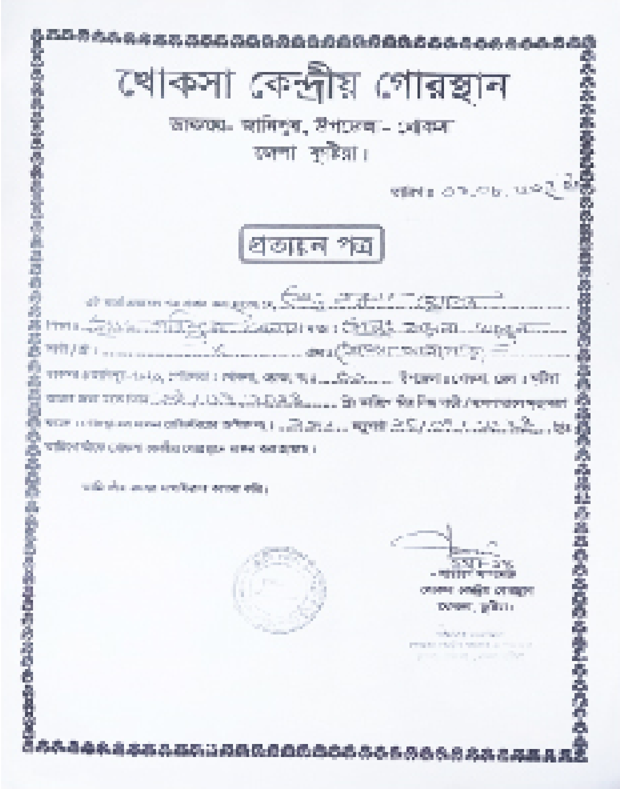
খোকসা কেন্দ্রীয় গোরস্থান
জেলা কুষ্টিয়া।
প্রত্যয়ন পত্র

সমকাল
সংঘাত প্রাণহানির দায় কার
আহতদের চিকিৎসার জন্য যা যা দরকার

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: মো: মারুফ হোসেন
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ	: ১৫-১০-২০০৪
ঘটনার স্থান	: রামপুরা, বনশ্রী
আক্রমণকারী	: বিজিবি'র গুলিতে
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই, ২০২৪, বিকাল ৩.০০টা
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯ জুলাই, ২০২৪, বিকাল ৪.৩০টা, রামপুরা, বনশ্রী, ঢাকা
দাফনের স্থান	: খোকসা কেন্দ্রী গোরস্থান
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: খোকসা থানা পাড়া, ইউনিয়ন: খোকসা পৌরসভা, থানা: খোকসা, জেলা: কুষ্টিয়া
পিতা	: মো: শরিফুল ইসলাম, ক্ষুদ্র ফল ব্যবসায়ী, ৪৭ বছর
মাতা	: মোসা: ময়না খাতুন, গৃহিনী, ৪০ বছর
ছোট বোন	: মোসা: আয়েশা খাতুন, বয়স: ১০ বছর

প্রস্তাবনা

১. ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য আর্থিক সহযোগিতা করা প্রয়োজন
২. ছোট বোনের ভালোভাবে পড়ালেখার যাবতীয় ব্যবস্থা করা
৩. এককালীন আর্থিক অনুদানের পাশাপাশি মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা

শহীদ মোঃ আহাদ আলী

ক্রমিক : ৪৩৭

আইডি : খুলনা বিভাগ ০৫৩

জন্ম ও পরিচিতি

৩৬ জুলাইয়ের আন্দোলনকে মূলত কিশোর বিদ্রোহ বললেও মনে হয় মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে। প্রায় ৭০ জন শিশু-কিশোর এই আন্দোলনে শহীদ হয়। তেমনই একজন বিদ্রোহী কিশোর শহীদ আহাদ আলী। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি আসে আগস্ট মাসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন ধীরে ধীরে সর্বাত্মক আন্দোলনে রূপ নেয়। ২০২৪ সালের ৩ আগস্ট ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হয় লাখ লাখ তরুণ-তরুণী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, আলেমসহ সকল শ্রেণি পেশার মুক্তিকামী জনতা। সবাই চোখে মুখেই ছিল আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা আর প্রতিবাদের ঝাঁঝালো শ্লোগান। সবাই একই দাবীতে একাট্টা হয়। যে করেই হোক ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে আওয়ামী লীগ সরকারকে।

৩ আগস্ট ব্যান্ডদলগুলো প্রতিবাদী কর্মসূচি "গেট আপ স্ট্যান্ড আপ" পালন করে রবীন্দ্র সরোবরে। বিকাল ৩ টায় সেখান থেকে তারা সংহতি জানাতে চলে আসে শহীদ মিনারে। শহীদ মিনার পর্যন্ত আসতে তাদের পোহাতে হয় অনেক ধকল। পথে পথে অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ, যুবলীগ আর পুলিশের বাঁধার মুখোমুখি হতে হয় শিল্পীদের। গণদাবীর ভিত্তিতে ঐ দিন দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করা হয়। ৪ আগস্টে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ৬৪ জেলায়। মগুরা জেলার সদর, শ্রীপুর ও মহম্মদপুর উপজেলায় হয় ব্যাপক সংঘর্ষ। মোট চারজন শহাদাত বরণ করে পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলায়। তারমধ্যে ছিলেন শহীদ মো: আহাদ আলী। শহীদ আহাদ আলীর জন্ম ২০০৭ সালের আগস্ট মাসের ৭ তারিখে মহম্মদপুরে। পিতা মো: ইউসুফ আলী একজন ভ্যান চালক এবং মাতা পাখি খাতুন ছিলেন গৃহিণী। শহীদ মো: আহাদ আলী মহম্মদপুর বরকতিয়া দাখিল মাদরাসা থেকে দাখিল পাশ করে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে মহম্মদপুরের স্বনামধন্য আমিনুর রহমান ডিগ্রি কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হন। শহীদ আহাদ আলী মানবিক বিভাগের প্রথম বর্ষের একজন নিয়মিত ছাত্র ছিলেন। তার ছোট ভাই মো: ইসাহাক আলী মুহাম্মদপুর সরকারি প্রাইমারি স্কুলের ৫ম শ্রেণির ছাত্র।

যেভাবে শহীদ হয়

কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্র জনতার আন্দোলন সারা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমেই এই দাবির সাথে সাধারণ জনতা একত্রিত হতে থাকে। এক সময় বৈষম্য বিরোধী এই আন্দোলন সকলের প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়। ছাত্র জনতার স্বৈরাচার বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেয়ার জন্য শহীদ আহাদ আলী বন্ধুদের উৎসাহ দিতেন এবং প্রতিদিন কলেজে যেয়ে কখন কিভাবে মিছিলে যোগ দিতে হবে সেই বিষয়ে সকলকে একত্রিত করে উদ্বুদ্ধ করতেন।

৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখ সকাল ১১ টায় তিনি সহপাঠি ও বন্ধুদের সাথে নিয়ে মাগুরা জেলার মহম্মদপুর থানার পাশে অবস্থিত আমিনুর রহমান ডিগ্রী কলেজের সামনের প্রধান সড়কে বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। কিছুক্ষণ পর শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল থেকে মহম্মদপুর থানা পুলিশ ৪ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করলে বিক্ষোভ মিছিলটি প্রতিবাদ মিছিলে পরিণত হয়। চতুর্দিক থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্র জনতা এসে মিছিলে যেগে দেয়। মিছিলকারীরা গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের ছেড়ে দেয়ার জন্য থানা পুলিশকে বার বার অনুরোধ করেন কিন্তু পুলিশ তাদের না ছেড়ে বরং ছাত্র জনতার মিছিলের উপর টিয়ারসেল ও গুলি বর্ষন শুরু করে। গুলিতে অনেক ছাত্র জনতা মারাত্মক আহত হন।

জনতার প্রতিরোধে এক পর্যায়ে পুলিশ থানা থেকে পালিয়ে যায়। সাধারণ মানুষ থানা ঘেরাও করে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের থানা হাজত থেকে বের করে আনে। পরবর্তিতে সাধারণ জনতা আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেন। দুপুর ১ টায় ডাক্তার চিকিৎসারত অবস্থায় শহীদ আহাদ আলীকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রিয় আহাদ আলীকে হারিয়ে শোকে স্তব্দ হয়ে যায় মহম্মদপুরের সর্বস্তরের জনতা।

৫ আগস্ট সকালে শহীদ আহাদ আলীর জানাজা সম্পন্ন হয়। জানাজায় হাজার হাজার মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। তারা শহীদ আহাদ আলীর কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকেন। জানাজা শেষে স্থানীয় পারিবারিক কবরস্থানে শহীদ আহাদ আলীকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। প্রিয় আহাদ আলীর মৃত্যুতে তার সহপাঠিরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। শহীদ আহাদ আলীর রক্তভেজা টুপি পাঞ্জাবীটা এখানো শহীদের স্মৃতি বহন করে আছে। এই আন্দোলনে ইসলামি ভাবাদর্শের সকল মানুষের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছাত্ররা ছিলেন বুনিয়ানুন মারসুস বা শিশা ঢালা প্রাচীরের ন্যায়। তাইতো এ আন্দোলন পৃথিবীর বিস্ময় হিসেবে আলোচিত হতে থাকবে।

শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য

শহীদের চাচা ও স্থানীয় মেম্বার বলেন-শহীদ মো: আহাদ আলী খুব মেধাবী ছাত্র ছিল। সে সব সময় মসজিদে যেয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতো। শহীদের বাবা বলেন-আহাদ আলী খুবই সৎ ছিলো, সে ইতিমধ্যে তাবলীগ জামাতের তিন চিল্লা সমাপ্ত করেছে। শহীদের মা বলেন- আমার ছেলে কখনো কারো উপর চোখ তুলে কথা বলেনি, কিন্তু আমার নিরপরাধ ছেলেকে পুলিশ অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে। আমরা হত্যাকান্ডের বিচার চাই।

একনজরে শহীদের পরিচয়

শহীদের পূর্ণ নাম	: শহীদ মো: আহাদ আলী (১৭)
পেশা	: শিক্ষার্থী
ঠিকানা	: মহম্মদপুর, মাগুরা
জন্ম তারিখ	: ০৭/০৮/২০০৭
পিতা	: মো: ইউনুস আলী (৬০)
পিতার পেশা	: ভ্যান চালক
মাতার নাম	: মোসা: পাখি খাতুন (৫০)
মাতার পেশা	: গৃহিণী
শহীদের ভাই	: মো: ইসলাম আলী (১০)
পেশা	: শিক্ষার্থী, পঞ্চম শ্রেণি, মোহম্মদপুর সরকারি প্রাইমারি স্কুল
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৩ জন
মাসিক আয়	: ১০০০ টাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৪ আগস্ট, ২০২৪, বেলা ১১:৩০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ৪ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর ১টা
শহীদের কবরের অবস্থান	: মোহাম্মদপুর থানার পৌর কবরস্থান

পরামর্শ

১। ছোট ভাইকে লেখাপড়ায় সহযোগিতা

২। দুধ উৎপাদনের জন্য গাভী কিনে দেয়া

৩। ঈদে শুভেচ্ছা উপহার পাঠানো

শহীদ মোঃ সুমন মিয়া

ক্রমিক: ৪৩৮

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৫৪

শহীদ পরিচিতি

৩ আগস্ট ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারীরা ঘৃণিত আওয়ামী লীগ সরকারকে পদত্যাগের এক দফা দাবিতে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করেন তাছাড়া একে এক দফা আন্দোলন নামেও ডাকা হয়ে থাকে। আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপামর জনতা অংশগ্রহণ করা ও ব্যাপক গণহত্যার মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন নিশ্চিত হওয়ায় একে বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলেও অভিহিত করা হয়। ৩ আগস্ট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হয় অগণিত মানুষ, এই অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল এখান থেকেই। ২০২৪-এ বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের হয়রানি, গণ-গ্রেফতার, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে শত শত শিক্ষার্থী ও জনসাধারনের মৃত্যু এবং হাজার হাজার ছাত্র-জনতা আহত হওয়ার প্রেক্ষিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সরকারের কাছে নয় দফা দাবি পেশ করে।

উক্ত দাবিগুলো না মেনে গ্রেফতার ও আন্দোলনে বলপ্রয়োগ অব্যহত রাখায় বাংলাদেশের জাতীয় শহীদ মিনারে এক দফা হিসাবে শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবি করে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ৩ আগস্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দেয়া হয় অসহযোগ আন্দোলনের রূপরেখা। রূপরেখাগুলো ছিল:

১। কেউ কোনো ধরনের ট্যাক্স বা খাজনা প্রদান করবেন না।

২। বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, পানির বিলসহ কোনো ধরনের বিল পরিশোধ করবেন না।

৩। সকল ধরনের সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত ও কল কারখানা বন্ধ থাকবে। আপনারা কেউ অফিসে যাবেন না, মাস শেষে বেতন তুলবেন।

৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

৫। প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে কোনো ধরনের রেমিটেন্স দেশে পাঠাবেন না।

৬। সকল ধরনের সরকারি সভা, সেমিনার, আয়োজন বর্জন করবেন।

৭। বন্দরের কর্মীরা কাজে যোগ দেবেন না। কোনো ধরনের পণ্য খালাস করবেন না।

৮। দেশের কোনো কলকারখানা চলবে না, গার্মেন্টকর্মী ভাই বোনেরা কাজে যাবেন না।

৯। গণপরিবহন বন্ধ থাকবে, শ্রমিকরা কেউ কাজে যাবেন না।

১০। জরুরি ব্যক্তিগত লেনদেনের জন্য প্রতি সপ্তাহের রোববারে ব্যাংকগুলো খোলা থাকবে।

১১। পুলিশ সদস্যরা রুটিন ডিউটি ব্যতীত কোনো ধরনের প্রটোকল ডিউটি, রায়ট ডিউটি ও প্রটেস্ট ডিউটিতে যাবেন না। শুধু থানা পুলিশ নিয়মিত থানার রুটিন ওয়ার্ক করবে।

১২। দেশ থেকে যেন একটি টাকাও পাচার না হয়, সকল অফশোর ট্রানজেকশন বন্ধ থাকবে।

১৩। বিজিবি ও নৌবাহিনী ব্যতীত অন্যান্য বাহিনী সেনানিবাসের বাইরে ডিউটি পালন করবে না। বিজিবি ও নৌবাহিনী ব্যারাক ও কোস্টাল এলাকায় থাকবে।

১৪। আমলারা সচিবালয়ে যাবেন না, ডিসি বা উপজেলা কর্মকর্তারা নিজ নিজ কার্যালয়ে যাবেন না।

১৫। বিলাস দ্রব্যের দোকান, শো রুম, বিপণিবিতান, হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট বন্ধ থাকবে। তবে হাসপাতাল, ফার্মেসি, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পরিবহন, অ্যাম্বুলেন্স সেবা, ফায়ার সার্ভিস, গণমাধ্যম, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পরিবহন, জরুরি ইন্টারনেট সেবা, জরুরি ত্রাণ সহায়তা এবং এই খাতে কর্তব্যরত কর্মকর্তা-কর্মচারী পরিবহন সেবা চালু থাকবে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

ঘোষিত এই কর্মসূচি পালনে সারাদেশের মুক্তিকামী জনতা যে যার মত করে আন্দোলনে শরীক হয়। মাগুরা জেলায় ঐদিন শাহাদাতের নাজরানা পেশ করে কয়েকজন বীর যোদ্ধা। তাদের মধ্যে একজন শহীদ সুমন মিয়া। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিলেও শহীদ সুমন মিয়া ছিলেন অসীম সাহসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শহীদ সুমন মিয়া ছিল সকলের প্রিয় মুখ। কিশোর এই শহীদ ১১.১২.২০০৪ তারিখে মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার বালিদিয়া গ্রামে মা-বাবার কোল আলো করে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় বালিদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করার পর তিনি মহম্মদপুর বি এম কলেজে ১ম বর্ষ মানবিক শাখায় ভর্তি হন। তিনি স্কুল ও কলেজে বন্ধুদের সকলের প্রিয় ছিলেন। খেলা ধুলায় পারদর্শি হওয়ার কারনে ছাত্র-শিক্ষক সকলেই তাকে ভালোবাসতেন।

যেভাবে শহীদ হয়

ছাত্র জনতার আন্দোলন কোটা সংস্কারের আন্দোলন সারা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমেই বৈষম্যবিরোধী এই আন্দোলন সকলের প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়। ছাত্র জনতার স্বৈরাচার বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেয়ার জন্য শহীদ সুমন মিয়া মায়ের কাছে যেয়ে বিদায় নিয়ে আসেন। তিনি বন্ধুদের আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে উদ্বুদ্ধ করতেন।

৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখ সকাল ১১ টায় তিনি সহপাঠি ও বন্ধুদের সাথে নিয়ে মাগুরা জেলার মহম্মদপুর থানার পাশে অবস্থিত আমিনুর রহমান ডিগ্রী কলেজের সামনের প্রধান সড়কে বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল থেকে মহম্মদপুর থানা পুলিশ ৪ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করলে বিক্ষোভ মিছিলটি প্রতিবাদ মিছিলে পরিণত হয়।

চতুর্দিক থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্র জনতা এসে মিছিলে যোগ দেয়। মিছিলকারীরা গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের ছেড়ে দেয়ার জন্য থানা পুলিশকে বার বার অনুরোধ করতে থাকেন কিন্তু পুলিশ তাদের না ছেড়ে বরং ছাত্র জনতার মিছিলের উপর টিয়ারসেল ও গুলি বর্ষন শুরু করে। গুলিতে অসংখ্য লোক আহত হয়ে রাস্তার উপর পড়ে যান।

জনতার প্রতিরোধে এক পর্যায়ে পুলিশ থানা থেকে পালিয়ে যায়। সাধারণ মানুষ থানা ঘেরাও করে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের থানা হাজত থেকে বের করে আনে। পরবর্তিতে সাধারণ জনতা আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেন। দুপুর ১ টায় ডাক্তার চিকিৎসারত অবস্থায় শহীদ সুমন মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। সুমন মিয়াকে হারিয়ে শোকে স্তব্দ হয়ে যায় সর্বস্তরের জনতা।

৫ আগস্ট সকালে শহীদ সুমন মিয়ার নামাজে জানাজা সম্পন্ন হয়। জানাজায় হাজার হাজার মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। জানাজা শেষে স্থানীয় বালিদিয়া কবরস্থানে শহীদ সুমন মিয়াকে দাফন করা হয়। শহীদ সুমন মিয়ার জন্য এখনো পথ চেয়ে বসে থাকেন শহীদের মা ও প্রিয় বন্ধুরা। তাদের চোখের পানি যেন শেষ হয় না।

শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য

শহীদের প্রতিবেশীরা বলেন সুমন মিয়া খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। লেখা পড়ার পাশাপাশি তিনি অন্যের বাড়িতে মাঝে মাঝে দিনমজুরীর কাজ করতেন। শহীদ সুমন মিয়ার মা-বাবার বিচ্ছেদের পর উভয়ের পৃথক সংসার আছে। শহীদ সুমন বেশির ভাগ সময় মায়ের কাছে থাকতেন। মাকে বলতেন-আমি লেখা পড়া শেষ করে চাকুরী পেলে তোমার আর কোনো কষ্ট থাকবে না। আমি তোমার ঋণকৃত সব টাকা পরিশোধ করে দিবো।

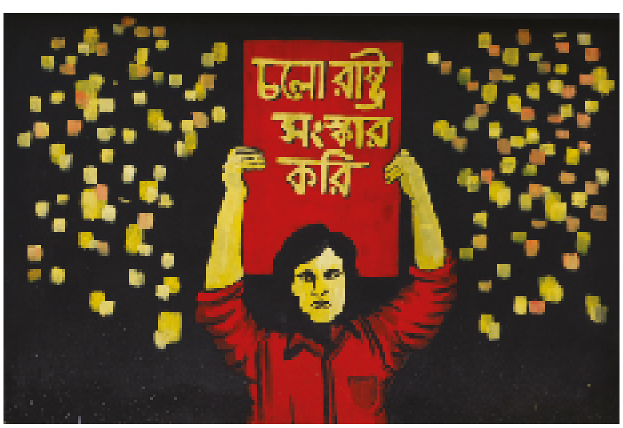

একনজরে শহীদের পরিচয়

শহীদের পূর্ণ নাম	: শহীদ মো: সুমন মিয়া (২০)
পেশা	: শিক্ষার্থী, বিএম কলেজ, মোহম্মদপুর
ঠিকানা	: বালিদিয়া, মোহম্মদপুর, মাগুরা
জন্ম তারিখ	: ১১/১২/২০০৪
পিতা	: মো: কানুর রহমান (৫০)
পিতার পেশা	: কৃষি
মাতার নাম	: মোসা: খাদিজা বেগম (৪৫)
মাতার পেশা	: গৃহিণী
শহীদের ভাই বোন	: সুমাইয়া খাতুন (২০), মারিয়াম (১৩), হুসাইন (০৮), সিনহা (০২)
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৬ জন
পারিবারিক আয়	: ১০০০০ টাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৪ আগস্ট ২০২৪, বেলা ১১:৩০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১টা
শহীদের কবরের অবস্থান	: বালিদিয়া কবরস্থান, মোহম্মদপুর

পরামর্শ

১। শহীদদের মা ঋণগ্রস্ত, ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে সহযোগিতা করা
২। ছোট ভাই বোনদের পড়ালেখায় সহযোগিতা করা
৩। এককালীন সহযোগিতা

শহীদ মোঃ রাজু আহমেদ

ক্রমিক : ৪৩৯

আইডি : খুলনা বিভাগ ০৫৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ রাজুর পিতা মো: আবুল কালাম মোল্লা (৬০) ও মাতা মোসা: নাছিমা খাতুন (৫৮)। শহীদ জনয়িতা পেশায় কৃষক আর জননী একজন চিরাচরিত বাঙালি গৃহিণী। কালাম-নাছিমা দম্পতি দুজনেই অসুস্থ। এই পরিবারে সদস্য সংখ্যা ৬ জন। রাজুর বড়ভাই নাজিম উদ্দিন মালয়েশিয়া প্রবাসী। তাঁর আয়েই মূলত রাজুদের সংসার চলতো। বাবা-মাকে দেখাশোনা করতেন রাজুই। অসুস্থ বাবা-মাকে নিয়ে মাঝেমাঝেই ছোটাছুটি করতে হতো তাঁকে। তিনি ছিলেন বয়সের ভারে নুব্জ বাবা-মায়ের একমাত্র হাতেখড়ি অবলম্বন। এখন কে দেখবে শহীদের অসুস্থ অসহায় বৃদ্ধ মা-বাবাকে?

শিক্ষা ও ব্যক্তিজীবন

শহীদ রাজু মাগুরা আদর্শ কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। রাজু আহমেদ জগদল সম্মিলনী কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে মাগুরা আদর্শ কলেজে ডিগ্রিতে ভর্তি হন। অভাবের সংসার ছিল তাঁদের। মাসিক আয় বিশ হাজার টাকা মাত্র। পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারণে লেখাপড়ায় নিয়মিত হতে পারেননি ২৪ এর শহীদ রাজু আহমেদ।

সংসারের হাল ধরার জন্যও সংগ্রাম করতে হয়েছে রাজুকে। হয়তো রাজুদের পরিবারের গল্পও আর দশটা পরিবারের মতোই। ধার করে বড়ভাইকে বিদেশ পাঠিয়েছিল শহীদ পরিবার। যে কারণে মাথার ওপর ছিল পাহাড় সম ঋণের বোঝা। পরিবারকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য ঢাকার মোহাম্মদপুরে বাঁশবাড়ি এলাকায় মেসে থাকতেন রাজু। ছোটখাটো কাজ করে নিজের লেখাপড়া এবং সংসারের খরচে শামিল হওয়ায় ছিল তাঁর কাজের উদ্দেশ্য। মনে মনে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন বড়ভাইয়ের মতো প্রবাস যাওয়ার। সংসারে সবার মুখে হাসি ফোটানো যার প্রাণান্ত চেষ্টা ছিল, ঘাতকের বুলেট সেই চেষ্টাকে ক্ষতবিক্ষত করে দুমড়ে মুচড়ে দিল। সকল সোনালী স্বপ্ন মুহূর্তে ফিকে হয়েছে আজ। কে করবে স্বৈরাচারীর বিচার? কে দাঁড়াবে অসহায় পরিবারের পাশে?

২৪ এর আন্দোলন

শহীদ রাজ্জুর দিন যেন কোনো রকমে কেটে যায়। এরমধ্যে শুরু হয় কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। পরে যা ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পরিণত হয়। এ গণ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত এক দফায় গিয়ে ঠেকে। রাজধানী ঢাকা তখন উত্তাল। সাধারণ মানুষের মনে ছাইচাপা আগুন। ছাত্র-জনতা বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত থাকা বারুদ। আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয় নানারকম স্লোগানে স্লোগানে। চারিদিকে মুখরিত হয় বিপ্লবী সব হুংকার।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের শুরু থেকেই রাজ্জু ছিলেন তৎপর। প্রতিদিন কাজের ফাঁকে আন্দোলনে অংশ নিতেন তিনি। একপর্যায়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন সরকার পতনে রূপ নেয়। ১৬ জুলাই রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ আবু সাঈদকে নির্মমভাবে গুলি করে মারার পর কেউ আর তখন ভয় পায় না রাজপথে দাঁড়াতে। বুক পেতে দেয় ঘাতকের বুলেটের সামনে। ১৬, ১৭ তারিখ নাম না জানা অনেককেই গুলি করে মারা হয়। ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাঁরা জানায় কিছুতেই এ আন্দোলন শুধু মাত্র কোটার আন্দোলন হতে পারে না। তাহলে শহীদদের রক্তের সাথে বেঈমানি করা হবে।

১৮ তারিখ রাত থেকে সারাদেশে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেয় হাসিনা সরকার। কাপুরুষ পুলিশ বাহিনী কর্তৃক নাটকীয় হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। ১৯ জুলাই, শুক্রবার; কারফিউ ঘোষণা করে খুনি হাসিনা।

ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়া পুরো দেশ তখন বিচ্ছিন্ন। কেউ কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না। কেউ কারো খবর জানে না। ঐদিন রাজ্জু কালো পাঞ্জাবি গায়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সাথে ছিল তাঁর মেসের চার বন্ধু। ঘড়িতে তখন বিকাল চারটা। মিছিলে যোগ দেয়ার জন্য রাস্তায় হাঁটছিলেন রাজ্জু। পুলিশের গাড়ি দেখে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দৌড়ানো শুরু করেন। অন্যরা দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছালেও রাজ্জু পারেননি। খুনী হাসিনার ঘাতক পুলিশ প্রথমে রাজ্জুর পায়ে গুলি চালায়। পায়ে গুলি লাগার সাথে সাথে রাজ্জু রাস্তায় পড়ে যান।

আহারে! তখনও ঐ নির্মম নিষ্ঠুর বাহিনীর মনে কোনো দয়া হয় নি। পুলিশ কাপুরুষের মতো রাজ্জুর কাছে এসে পেটে গুলি করে। মারাত্মক আহত হয়ে রাজপথে পড়ে ছিলেন রাজ্জু। ঘাতক পুলিশ চলে গেলে রাজ্জুর বন্ধুরা স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় রাজ্জুকে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে ভর্তির পরই কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজ্জুকে মৃত ঘোষণা করেন। 'বিদেশ যাওয়ার পাসপোর্ট ভিসার বদলে রাজ্জুর কবরের এপিটাফ তৈরী হয়।'

স্বপ্নের মৃত্যু

সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ফোন করে রাজ্জুর শহীদ হওয়ার খবর জানানো হয় তাঁর বাবাকে। রাজ্জু হয়তো প্রতিদিন সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে বাড়িতে কথা বলতেন। ১৯ জুলাইও প্রিয় রাজ্জুর ফোনকলের অপেক্ষায় ছিলেন রাজ্জুর মা-বাবা। ফোনকল এসেছিল ঠিকই। ফোনকলটা বয়ে নিয়ে এসেছিল রাজ্জুর পরিবারের জন্য সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ। সে রাতেই ঢাকা গিয়ে শহীদ রাজ্জুর লাশ গ্রহণ করে তাঁর ভগ্নিপতিসহ অন্য স্বজনেরা। ২০ জুলাই সকালে জানাযা শেষে মাগুরা জেলার আজমপুর চরপাড়া পারিবারিক কবরস্থানে রাজ্জুর শেষ ঠিকানা রচিত হয়। হায়রে জীবন! বিদেশ যাওয়ার পাসপোর্ট ভিসার বদলে রাজ্জুর কবরের এপিটাফ তৈরী হয়। কিন্তু রাজ্জুরা মারা যান না কখনোই। শহীদ রাজ্জু বেঁচে থাকবেন আমাদের শ্রদ্ধায়, স্বাধীনতায়, দেশের প্রতিটি মুক্ত বাতাসে, জনতার স্বাধীন নিঃশ্বাসে।

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: মো: রাজু আহমেদ
পেশা	: ছাত্র
প্রতিষ্ঠান	: আদর্শ কলেজ, মাগুরা
পিতা	: আবুল কালাম মোল্লা (৬০), কৃষক
মাতা	: নাসিমা খাতুন (৫৮), গৃহিণী
বয়স	: ২৪
জন্মস্থান	: মাগুরা
মৃত্যু	: ১৯. ০৯. ২০২৪, বিকাল ৪.০০টা
মৃত্যুর কারণ	: পুলিশের গুলিতে
কবর	: আজমপুর চরপাড়া কবরস্থান, সদর থানা, মাগুরা
মৃত্যুর স্থান	: মোহাম্মদপুর
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৬ জন

প্রস্তাবনা

১. পরিবারকে এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে

২. শহীদের পিতাকে কৃষি কাজের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করা যেতে পারে

শহীদ মুত্তাকিন বিল্লাহ

ক্রমিক : ৪৪০
আইডি : খুলনা বিভাগ ০৫৬

শহীদ পরিচিতি

বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের ২৪ এর স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা অমূল্য। ২৪ এর অন্যতম বীর দেশপ্রেমিক শহীদ মুত্তাকিন বিল্লাহ। তিনি ছিলেন একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট। মুত্তাকিনের জন্ম ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখ। জন্মস্থান মাগুরা জেলার দাড়িয়াপুর ইউনিয়নের শ্রীপুর থানার বরইচরা গ্রামে।

পারিবারিক জীবন

শহীদ মুত্তাকিন বিল্লাহর পিতার নাম মৃত মো: আক্কাস আলী এবং মাতা মোসা: রহিমা বেগম। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন শহীদ জননী। তিনি একজন পুত্রাদক্ষ গৃহিণী। জনপিতার মৃত্যুর পর মুত্তাকিনদের সংসারের হাল ধরেন তাঁর বড় ভাই। একমাত্র অবলম্বন জনাব মো. শিহাবুল ইসলাম (৩৫) একজন মালয়েশিয়া প্রবাসী। পিতার হঠাৎ মৃত্যুতে সংসারের সকল দায়িত্ব তাঁর উপরে বর্তায়। শহীদ পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা সাতজন। মহাবীর মুত্তাকিন সংসারের সহযোগিতা করতে একটি প্রাইভেট মেডিকেল হাসপাতালে যুক্ত হন। কিছুদিন পর স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে ঢাকার মিরপুরে ভাড়া বাসায় ওঠেন। এভাবেই চলছিল তাঁদের সংসার জীবন।

ব্যক্তিজীবন

শহীদ মুত্তাকিন বিল্লাহ চিকিৎসা সমবায় ক্যারিয়ার গড়ার জন্য মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে ক্যারিয়ার গড়েন। মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে কাজ করছিলেন মিরপুর-১৪ রাজনীগন্ধা টাওয়ারের ইনোভা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। সংসার পেতেছিলেন রাজধানীর মিরপুর-১ সংলগ্ন এলাকায়। ছোট্ট সেই সংসারে ছিলেন শহীদ মুত্তাকিনের স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে আন নাফিয়ান হোসেন (৪) পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে জানা যায় শহীদ প্রচণ্ড যত্নবান একজন মানুষ ছিলেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও খোঁজ রাখতেন তাঁর আপনজনদের। মা ঠিকমতো ওষুধ খেলেন কিনা, কে কেমন আছে সকল খোঁজই তিনি রাখতেন। তেজস্বী বীর পরিবারের সবচেয়ে প্রিয়মুখ ছিলেন। রাজধানী শহরের যান্ত্রিক খরচাদির পরও কিছু টাকা মায়ের হাতে পাঠাতে ভুল করতেন না মুত্তাকিন।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

মাত্র ২৫ বছরের জীবন। সবাই তো এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চায়। অথচ মুত্তাকিনকে মাত্র ২৫ বছর বয়সে প্রিয়তমা স্ত্রী, আদরের সন্তান ছোট্ট নাফিয়ান, মা আর পরিবারের বাকি সদস্যদের রেখে সুন্দর এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হলো। অথচ মুত্তাকিন তো স্বার্থপর হতে পারতেন আরো। স্ত্রী সন্তানের কথা ভেবে আন্দোলনে নাও যেতে পারতেন। কিন্তু মুত্তাকিনরা পিছুটানে আটকান না, মৃত্যুভয়ে ভীত হন না।

কারণ তাঁরা জানেন- 'আল্লাহ তা'আলার বাণী,'আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।' (আত তাওবাহ : ৯: ১১১-১১২)

শহীদের স্ত্রী নাঈমা এরিন নিতুর বর্ণনায় শাহাদাতের পটভূমি

"৪০ মিনিট আগেও যে আমাকে বলছিল "টেনশন করো না, আমি ঠিক আছি," সে এখন নেই–এটা কীভাবে বিশ্বাস করি, বলেন?"

পেশায় আমার হাসবেন্ড একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, উনি কাজ করতেন ইবনে সিনাতে। আমিও পেশায় একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট। জুলাইয়ের আন্দোলন শুরুর পর থেকেই আমার স্বামী এই আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। প্রতিদিন ডিউটি শেষে তিনি আন্দোলনে যোগ দিতেন।

১৮ জুলাই রাতে ১১টার সময় ডিউটি শেষ করে যখন তিনি বাসায় ফিরছিলেন, তখন মিরপুর ১০ নম্বর থেকে তাঁর উপর আক্রমণ করা হয়। তিনি আমাকে কিছু জানাননি কারণ জানালে আমি তাঁকে আন্দোলনে যেতে নিষেধ করতাম, কারণ আমাদের একটি ছোট বাচ্চা আছে,তাই তিনি প্রাথমিকভাবে ব্যাপারটা আমার কাছে হাইড করেন । তাঁর শরীরের নানা জায়গায় রাবার বুলেট লাগে। তিনি বাসায় আসার পর বিষয়টি লুকানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু আমি তা দেখে ফেলি এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেই সেদিন।

তারপরের দিন সকালে তিনি ডিউটিতে যান। তাঁর ডিউটি ছিল সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত। ২টায় কাজ শেষ করে তিনি মিরপুর ১০ নম্বরে আন্দোলনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তখন থেকেই আমি তাঁর সঙ্গে বারবার ফোনে কথা বলছিলাম। শেষবার বিকেল ৪টার দিকে, আসরের আজানের সময়, তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়। তখন তাঁর গলা একদম বসে গিয়েছিল। আন্দোলনের প্রথম সারিতে থেকে স্লোগান দেওয়ার কারণে আর অতিরিক্ত ঘামে গরমে তাঁর গলা বসে যায়। তিনি আমাকে শেষ কথোপকথনে বলেন, "টেনশন করো না, আমি ঠিক আছি। আজ তো সবাই আন্দোলন করছে–মহিলা থেকে শুরু করে বাচ্চা, বৃদ্ধ সবাই নেমেছে রাস্তায়। আমি কিভাবে ঘরে বসে থাকি? নিজের কাছে নিজে কী জবাব দেব?" এটাই ছিল তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথা। সেদিন এই কথা বলার কিছু মুহূর্ত পরেই মিরপুর ১০ নম্বর গোল চত্বর থেকে তাঁর মাথায় গুলি লাগে সরাসরি। একটি গুলি তাঁর মাথা ভেদ করে আরেক পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, আর দ্বিতীয় গুলি তাঁর মাথাতেই আটকে যায়। আমার কাছে সঙ্গে সঙ্গেই ফোন আসে, এবং আমি সেখানে চলে যাই। কিন্তু আমি তাঁকে সেখানে পাইনি। সেখানকার এক ভাই তাঁকে মিরপুর আল-হিলাল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়, মাথায় ব্যান্ডেজ করা হয়। কিন্তু তাঁর অবস্থার অবনতি দেখে তাঁকে ইবনে সিনা কল্যাণপুর ব্রাঞ্চে স্থানান্তর করা হয়। পরে জানতে পারি, সেখানে যাওয়ার পর অনেক ভালো ভালো ডাক্তার তাঁর ট্রিটমেন্টে এগিয়ে এসেছিলেন। অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। কোনোভাবেই তাঁর আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। তাঁর ইবনে সিনাতে থাকার খবর পেয়ে আমি সেখানে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু ছাত্রলীগ ইবনে সিনায় যাওয়ার এবং হাসপাতালের মুখে তৎপর ছিল। কোনোভাবেই যেতে দেবে না। আমি সেখানে তাদের হাত-পায়ে ধরে কাঁদছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে ঢুকতে দেয়নি। তার মধ্যে আমার কাছে আরেকটা কল আসে। বলা হয় আমার স্বামী নাকি সোহরাওয়ার্দীতে। আমি আবার ওখান থেকে সোহরাওয়ার্দীতে যাই। ২ তলা থেকে ৫/৬ তলা আমি পাগলের মতো কতবার ছোটাছুটি করেছি, আমার হিসাব নেই।

সেদিন আমি যতগুলো লাশ দেখেছি, জীবনে এত লাশ দেখিনি। আমি সব লাশ উল্টে উল্টে দেখছিলাম আমার স্বামী কিনা। সেখানেও আমি তাঁকে খুঁজে পাইনি। পরে আবার কল করি ওই নম্বরে। তখন বলা হয় নিউরো সায়েন্স বিভাগে যেতে হবে আমাকে। পরে সেখানেও যাই। কিন্তু ওখানেও কোনো এন্ট্রি নেই, কোনো তথ্য নেই, কিছুই নেই। সেদিন শুধু লাশ আর লাশ। এত রেকর্ড রাখাও কি সম্ভব, আমি জানি না। ডাক্তাররা শুধু রোগী পাচ্ছিল আর যেভাবে পারছিল চিকিৎসা দিচ্ছিল। আর যারা মারা যাচ্ছিল, সবাইকে আলাদা রুমে সরিয়ে দিচ্ছিল।

ওই দৃশ্য আমি এখনো ভুলতে পারি নাই। শেষে আরেকটা কল আসে। বলা হয় তিনি ইবনে সিনাতেই আছেন, আইসিইউ-তে ৯ তলায় আছেন। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে সেখানেই খুঁজে পাই। সেখানেই তাঁর সার্জারি চলছিল। কিন্তু ইবনে সিনায় সেদিন ছাত্রলীগ ঢুকে পড়ে এবং অনেক সমস্যা করছিল। ট্রিটমেন্ট করতে দেবে না। ডাক্তাররাই পরে আমার হাসব্যান্ডকে আমার কাছে হ্যান্ডওভার করে

বললেন, এখানে রাখা যাবে না। তাঁকে নিউরোসার্জারি ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যেতে হবে, কারণ তাঁর মাথায় বুলেট লেগেছে। এই সমস্যার ভালো চিকিৎসা সেখানেই হবে। তাই আমি তাঁকে নিয়ে নিউরো সায়েন্সে যাই। কিন্তু সেখানেও তারা মানা করে দেয় যে ট্রিটমেন্ট করাবে না। কারণ ততোক্ষণে ওখানেও লীগ-এর হামলা শুরু হয়ে যায়। পরে যখন রাত ১০টা বাজে, আর কোনো উপায় না পেয়ে আমি যেখানে চাকরি করি, সেখানে তাঁকে ভর্তি করাই ইমার্জেন্সিতে। ফজর পর্যন্ত আমার স্বামী বেঁচে ছিল। সারারাত তাঁকে ব্লাড দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁর শরীর কোনো ব্লাড নিচ্ছিল না। নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে, কান দিয়ে সব রক্ত বের হয়ে যাচ্ছিল। পুরো রাত তাঁর ব্লিডিং হয়েছে। আমি শুধু এই আশায় ছিলাম যে তাঁর একবার জ্ঞান আসবে। কিন্তু তাঁর জ্ঞান আসেনি। একবারও চোখ খোলেনি। একটুও রেসপন্স করেনি। শেষে ফজরের আজানের সময় আমার স্বামী মারা যায়।

ঠিক সময়ে চিকিৎসা পেলে হয়তো আমার স্বামী বেঁচে থাকত। এই একটা কষ্ট আমি নিজেকে বুঝাতে পারি না। আমি হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ছুটেছি, কিন্তু নিজের স্বামীকে চিকিৎসা দিতে পারিনি। আমার তিন বছরের একটা বাচ্চা আছে। সে তো বুঝে না যে তার বাবা আর নেই। আমি আমার ছেলেকে কী বলবো বলেন? যে আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম, কিন্তু তারা চিকিৎসা দিতে পারেনি? যে দেশের জন্য তাঁর বাবা জীবন দিতে রাজি ছিল, সেই দেশের হাসপাতালগুলোর সামনে গুণ্ডা বাহিনী দাঁড়িয়ে থাকে যাতে রক্ত ঝরানো মানুষ চিকিৎসা নিতে না পারে? আমার ছেলে এখনো কাগজের প্লেন বানায়। ভাবে তার বাবা আসবে, তার সাথে খেলবে। আমি উত্তর দিতে পারি না।দেখি আর নিজের কান্না লুকাই।

আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় না, যে মানুষটা সকালে আমার সাথে কথা বলে নাস্তা খেয়ে আমার সামনে দিয়ে বের হলো, যার সাথে আমার এতবার ফোনে কথা হলো, ৪০ মিনিট আগেও যে আমাকে বলছিল "টেনশন করো না, আমি ঠিক আছি," সে এখন নেই–এটা কীভাবে বিশ্বাস করি, বলেন? তবে যাই হোক, দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে আমার স্বামী। সে এখন এই দেশের শুধু আমার একার না। এটা ভাবলেও গর্ব হয়। সে আমাকে আজীবনের কষ্ট আর গর্ব একসাথে দিয়ে গেল। আমি একজন শহীদের স্ত্রী। একজন শহীদের ছেলে বড় করছি। এটাই আমার সম্বল।

ছোট্ট নাফিয়ানের কী ওর বাবার কথা মনে থাকবে? বাবার কোনো স্মৃতি নিয়ে নাফিয়ান স্মৃতিচারণ করবে? মুত্তাকিনের স্ত্রী কয়দিনই বা সংসার করতে পারলেন স্বামীর সাথে? সারাজীবন কেবল অল্প কিছু সুখস্মৃতি আঁকড়েই তো বেঁচে থাকতে হবে তাকে। বাবার স্মৃতি মনে করতে না পারলেও বাবাকে নিয়ে অনেক গর্ব করতে পারবে শহীদ মুত্তাকিন বিল্লাহ পুত্র আন নাফিয়ান।

একনজরে শহীদের পরিচয়

শহীদের নাম	: শহীদ মুত্তাকিন বিল্লাহ
জন্ম	: ১৫.১২.১৯৯৯
মৃত্যু	: ১৯ জুলাই, ২০২৪
কবর	: বড়ইচারা মসজিদ কবরস্থান, মাগুরা
জন্মস্থান	: মাগুরা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বরইচারা, ইউনিয়ন: দাড়িয়াপুর, থানা: শ্রীপুর, জেলা: মাগুরা
পেশা	: মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, ইনোভা ডায়াগনস্টিক সেন্টার রজনীগন্ধা টাওয়ার, মিরপুর-১৪, ঢাকা
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯.০৭.২০২৪
পিতা	: মো: আব্বাস আলী
মাতা	: রহিমা বেগম
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৭ জন
	: মো: শিহাবুল ইসলাম (৩৫), প্রবাসী, (বড় ভাই)

প্রস্তাবনা

১. শহীদের স্ত্রীকে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে

২. শহীদ পুত্রকে লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে

ঘটনার দিন সকালে আমাকে বলল,
'ভাই, চলেন শহীদ হয়ে আসি।'

শহীদ ফরহাদ হোসেন

ক্রমিক : ৪৪১

আইডি : খুলনা বিভাগ ০৫৭

শহীদ পরিচিতি

শহীদ ফরহাদ হোসেন-২৪ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝরে যাওয়া একটি তরুণ প্রাণ। মাত্র ২২ বছরের ছোট্ট জীবন অথচ দেশের জন্য কী চরম আত্মত্যাগ! শহীদ ফরহাদ হোসেনের জন্ম ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি। বছরের শুরুর দিনেই ফরহাদের জন্মদিন। ফরহাদের জন্মস্থান খুলনা বিভাগের মাগুরা জেলার নাকোল ইউনিয়নের শ্রীপুর থানা, রায়নগর গ্রাম। শুধু মাগুরাবাসীর গর্ব নয় শহীদ ফরহাদ আজ দেশবাসীর গর্ব।

পারিবারিক জীবন

শহীদ ফরহাদের পিতা জনাব মো. গোলাম মোস্তফা (৫৮) পেশায় গাড়ি চালক। বাসের ড্রাইভার। মাসিক আয় ত্রিশ হাজারের মতো। এই অতি সাধারণ পরিবারে জন্ম হওয়া ফরহাদ এখন কতটা অসাধারণ,সবার চেয়ে আলাদা। শুধু কী ফরহাদ? কিছুটা আশ্চর্য হতে হয়, আশ্চর্য না বরং আনন্দিত হই ফরহাদের ভাইবোনদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখে। ফরহাদরা দুই ভাই দু বোন। বড় বোন রোকেয়া বেগম (২৮) বিবাহিত। ছোট বোন মোসা: রিক্তা (২৫) খাতুন স্নাতকোত্তর পাশ করে চাকরির জন্য অপেক্ষা করছেন। ছোট ভাই মোসা: গোলাম কিবরিয়া (২৩) পড়ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর ফরহাদ পড়ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগ, স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষে। কোনো বাবার পক্ষে গাড়ি চালানোর স্বল্প আয় দিয়ে তিনটি সন্তানকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা কম কথা নয়। সত্যিই গোলাম মোস্তফা একজন গর্বিত পিতা। আর এখন তো তিনি শহীদের জনক। ফরহাদ তাঁর বাবার জন্য সবচেয়ে সম্মানিত হওয়ার কাজটিই করে গিয়েছেন।

ব্যক্তিজীবন

মাগুরার মতো একটি ছোট্ট জেলা থেকে মেধার স্বীকৃতি রেখে ফরহাদ গিয়েছিলেন সুদূর চট্টগ্রামে। ভর্তি হয়েছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ইতিহাস বিভাগে। ২০২১-২২ ওঁর সেশন। চোখ ভরা স্বপ্ন, আবেগ আর উদ্যম নিয়ে চবির ২৩০০ একরে পা রেখেছিলেন মাগুরার ফরহাদ। তখন কী ফরহাদ জানতেন প্রিয় ইতিহাস বিভাগে ওঁর দ্বিতীয় বর্ষ শেষ করাটাও হয়ে উঠবে না? ফরহাদের বন্ধুরা কখনো কী কল্পনাও করেছিল ডিপার্টমেন্টের শান্তশিষ্ট ছেলেটি তাদের সাথে আর কখনোই ক্লাসে বসবে না?

পরিবারের ছোট সন্তান ছিলেন ফরহাদ। বাব-মা সবাইকে ভালোবাসেন। তবুও ছোট সন্তান হিসেবে একটু কী বেশি আহ্লাদ দিতেন ফরহাদকে? আদরের সবচেয়ে ছোট সন্তানটিই সবার আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল ঘাতক বুলেটে। ফরহাদের পরিবারে এখন কেবল হাহাকার। ফরহাদের মা হারিয়েছেন তাঁর নাড়ি ছেঁড়া ধন। আহা ছিন্ন মুকুল জীবন! যেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছিন্ন মুকুল কবিতার মতো-

> "সব-চেয়ে যে শেষে এসেছিল
> সে গিয়েছে সবার আগে সরে
> ছোট্ট যে জন ছিল রে সবচেয়ে
> সে দিয়েছে সকল শূন্য করে"

উত্তাল সময়

জুলাইয়ের ঐদিনগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় উত্তাল। স্লোগানে মুখর দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। উত্তাল দেশের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারের পোষ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সবরকম ভাবে কোটা সংস্কারের যৌক্তিক আন্দোলন বন্ধ করতে না পেরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। হলে তালা লাগানো হয়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের ছাত্রাবাসগুলোতেও পুলিশ-ছাত্রলীগ হানা দেয় সে সময়ে। মেস মালিকেরা মেস বন্ধ করে দিয়েছিল। ফরহাদ সম্ভবত বাধ্য হয়েই চট্টগ্রাম ছেড়েছিলেন। নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনে যোগ দিতে না পারার দুঃখ নিয়েই নিজের এলাকা মাগুরায় আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। সারা দেশ তখন উত্তাল। স্বৈরাচার হাসিনা সরকার তার গোপন কিলিং মিশন পরিচালনা আর আন্দোলনের গতি রুখতে সারা দেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়।

৩৫ জুলাই, ২০২৪

রক্তাক্ত জুলাইয়ের দিনের হিসাবে সেদিন ছিল ৩৫ জুলাই, ২০২৪। পঞ্জিকার হিসাবে ৪ অগাস্ট ২০২৪। ৩৫ জুলাইয়ের কর্মসূচি ছিল স্বৈরাচার পতনের ২ দফা দাবিতে বেলা ১১ টা থেকে রাজধানীতে সারাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে বিক্ষোভ ও গণসমাবেশ। সারাদেশ ইন্টারনেট শাটডাউন এবং কখনও থাকলেও অতি ধীর গতি। ঢাকায়, কুমিল্লায়, খুলনায় গুলি চললো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাশ নিয়ে মিছিলে হলো। মাঠে তখন মরণ কামড় দেয়ার জন্য ফ্যাসিস্ট সরকারের লেলিয়ে দেয়া পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, আনসার, সেনাবাহিনীর পাশাপাশি বিতর্কিত সংগঠন ছাত্রলীগ, সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ ও ক্যাডার যুবলীগ বাহিনী সক্রিয়।

৪ তারিখের স্লোগান ছিল-

> "বাঁশের লাঠি তৈরী করো
> বাংলাদেশ স্বাধীন করো"

মাগুরায় নিয়মিত আন্দোলনে সক্রিয় থাকা ফরহাদ গিয়েছিলেন ৩৫ জুলাইয়ের বিক্ষোভ মিছিল ও গণসমাবেশ কর্মসূচিতে। শ্রীপুরের রায়নগর থেকে মাগুরা শহরের দূরত্ব প্রায় ১৫ কিলোমিটার। ঘটনার দিন রায়নগর থেকে একটি ইজিবাইকে করে সাতজন কয়েক দফা বাধা পেরিয়ে পারনান্দুয়ালী এলাকায় আসেন। বেলা তখন ১১ টা। শহীদের সাথে ঐদিন আন্দোলনে যোগ দেয়া সহযোদ্ধাদের কাছে জানা যায় রণক্ষেত্র দেখেও সেদিন ভয় কাজ করেনি ফরহাদের মনে। বরং ছিলেন সম্মুখ সারিতে। মিছিলের এক পর্যায়ে বেলা ১২:৩০ এর দিকে পুলিশ পিছু হটে যায়। এরপরই ঘাতক আওয়ামী লীগ, যুবলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা মিছিলের ওপর হামলা চালায়। তখন বিপরীত থেকে একটি বুলেট এসে ফরহাদের মাথায় লাগে। তাৎক্ষণিকভাবে একটি নছিমন গাড়িতে হাসপাতালে নেয়া হয়। চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক পরীক্ষা করে মহাবীরকে মৃত ঘোষণা করেন। ইতিহাসের রচনা শুরু হয়। ২৪ এর শহীদ ফরহাদ অমর হয়ে রয়!

জানা যায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার দিন সকালেও আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে ফরহাদ আলাপ করেছিলেন স্বজনদের সাথে।

ফরহাদের বড় ভাই গোলাম কিবরিয়া জাতীয় দৈনিক 'প্রথম আলোকে' বলেন, "সে ছোট হলেও ম্যাচিউরিটি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করত। এ কারণে কেউ তাকে আটকাতে পারেনি। ঘটনার দিন সকালে আমাকে বলল, ভাই, চলেন শহীদ হয়ে আসি।"

শূন্যতা

৩৬ জুলাই অর্থাৎ ৫ অগাস্ট স্বৈরাচারের পতন হলো। খুনী হাসিনা পালিয়ে গেল কিন্তু তার আগে কেড়ে নিলো কত শত তাজা প্রাণ। বাংলার মাটি রঞ্জিত হলো শহীদের রক্তে। শহীদ ফরহাদের মতো দেশপ্রেমী দৃঢ়চেতা তরুণদের আত্মত্যাগে আমরা স্বাধীন হলাম দ্বিতীয়বারের মতো। সদা বিনয়ী, নামাজী, এলাকার সবার প্রিয় নম্র-ভদ্র আর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে কাটানো ছেলেটি ৪ তারিখ বোধহয় শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই মিছিলে গিয়েছিল। শহীদি মৃত্যুই তো তিনি চেয়েছিলেন। তাঁর মনে তখন কেবল Patria o Muerte জন্মভূমি অথবা মৃত্যু !

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: মো: ফরহাদ হোসেন, পেশা: ছাত্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০১-০১-২০০২ ও (২২)
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫-০৮-২০২৪, দুপুর ২টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: ওয়াপদা ব্রিজ, ঢাকা-মাগুরা-রোড, মাগুরা
দাফন করা হয়	: রায়নগর কবরস্থান
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রায়নগর, নাকোল, শ্রীপুর, মাগুরা
পিতা	: গোলাম মোস্তফা, পেশা: গাড়ি চালক, বয়স: ৫৮
মাতা	: শিরিনা বেগম পেশা : গৃহিণী, বয়স: ৫৫
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: পৈতৃক বাড়ি ও সামান্য আবাদি জমি আছে

ভাই বোনের বিবরণ

১. রোকেয়া বেগম (বোন), বয়স: ২৮, বিবাহিতা
২. মিতা খাতুন (বোন), বয়স: ২৫, মাস্টার্স পাশ, বেকার
৩. গোলাম কিবরিয়া (ভাই), বয়স: ২৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মাস্টার্স, বেকার

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারকে এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে
২. শহীদের বোনকে চাকরি অথবা কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে
৩. শহীদের ভাইকে চাকরি অথবা কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে

‘শুক্রবারের দিন তুমি আমাকে একশ গুন টাকা দিলেও আমি কাজ করব না’

শহীদ আউয়াল মিয়া
ক্রমিক : ৪৪২
আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০০১

শহীদ পরিচিতি

আউয়াল মিয়া ৫ জুন সোমবার কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার যাত্রাপুর ইউনিয়নের মোচপাড়া গ্রামে ১৯৬৭ খ্রি: জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মৃত মোহর আলী। মাতা মৃত আনোয়ারা বেগম। তিনি বাল্যকাল থেকে হত দরিদ্র পরিবারে বেড়ে ওঠেন। শহীদের পরিবারে স্ত্রী, ছয় কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রয়েছে। ছয় মেয়েকে অত্যন্ত ভালবাসতেন আওয়াল মিয়া। মেয়েদেরকে বলতেন- তোমরা আমার সবচেয়ে প্রিয়। তোমাদের সাথে একত্রিত মুহূর্ত পরিবারের জন্য সবচেয়ে মহামূল্যবান। ছোট মেয়ে আফসানা বলেন- ‘বাবা শহীদ হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার সাথেই থাকতেন। প্রতিবার খাওয়ার সময় আমার জন্য প্লেটে একটু হলেও খাবার রেখে বলতেন- ‘এইটা আমার মেয়ের জন্য। তুমি কি খেয়েছো জানিনা। আমার সামনে বসে একটু খাওতো মা। বাবা ছিলেন আমাদের পরিবারের জন্য একমাত্র অবলম্বন। আমরা ছয় বোন। সকলের জন্য বাবার অনেক মায়া ছিল। বাবা প্রায় বলতেন- আমি শেষ বয়সে যখন কাজ করতে পারব না, তখন আমার মেয়েরা আমাকে দেখবে। আমার ছেলে হাবিবকে তোমরা দেখে রেখ। মায়ের খেয়াল রেখ।’ পরিবারের একমাত্র আয় উপার্জের ব্যক্তি ছিলেন শহীদ আওয়াল মিয়া। শহীদ সম্পর্কে তাঁর প্রতিবেশী বলেন- ‘চাচা অনেক ভাল মানুষ ছিল। রোদ বৃষ্টি শীত গরম কোন কিছু উপেক্ষা করতেন না তিনি। ভাল মানুষরা নাকি দ্রুত পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, তারই হয়তো প্রমান শহীদ আওয়াল মিয়ার শাহাদত বরণ।

‘মহাজন বলেন- চাচা কাজের প্রতি ভীষণ দায়িত্ববান ছিলেন’

কর্মজীবন

শহীদের আয় রোজগার বলতে দিন এনে দিন খাওয়া। আওয়াল মিয়া পেশায় রাজমিস্ত্রীর যোগালি ছিলেন। আজান হয়ে গেলে তাঁকে আর কাজ করানো যত না। শহীদ সম্পর্কে তাঁর মহাজন বলেন- চাচা কাজের প্রতি ভীষণ দায়িত্ববান ছিলেন। তবে ধর্মীয় ভাবে তিনি ছিলেন অনেক কঠোর। মসজিদ থেকে আজানের আওয়াজ চাচার কানে আসলে তাঁকে দিয়ে আমরা কাজ করাতে পারিনি। সাথে সাথে মসজিদে চলে যেত। শুক্রবার জুম্মার নামাজ থাকায় কোনভাবে কাজ করতেন না তিনি। আমি একবার পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে বলেছিলাম আপনাকে দিগুন-তিনগুন টাকা দেব। আজান হলে মসজিদে যেতে দেব। তবে তিনি রাজি হননি। আমাকে বলেছিলেন- শুক্রবারের দিন তুমি আমাকে একশ গুন টাকা দিলেও আমি কাজ করব না। কারণ- শুক্রবার মুমিনদের জন্য ঈদের দিন। ইবাদত বন্দেগী করার দিন। আমি এই দিন শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে দিতে চাই।' শহীদের পরিবারে আবাদি কোন জমি নেই। তবে স্বল্প পরিমাণে পৈতৃক বসতি জমি রয়েছে। যার উপর টিনের বেষ্টনী দিয়ে পরিবারের জন্য স্থায়ী নিবাস তৈরি করেছেন শহীদ আওয়াল মিয়া। পারিবারিক ভাবে তেমন স্বচ্ছলতা না থাকায় তারুণ্যের শুরুতে রাজধানী এসেছিলেন। মাঝে মাঝে সিমেন্টের দোকানে বস্তা বহনের কাজ করে বাড়তি উপার্জন করতেন।

খুনি হাসিনা ও তার দলবল আদৌ কি কোনদিন মানুষ ছিলেন? না মানুষ হবেন?

যেভাবে শহীদ হলেন শহীদ আউয়াল মিয়া

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গত ১ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। এক মাসের মাথায় তারা ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটায়। দীর্ঘ এক মাস ব্যাপক সহিংসতায় প্রায় ৮০০ জনের মৃত্যু হয়। প্রবল গণআন্দোলনের মুখে তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খুনি শেখ হাসিনা ৫ আগস্ট সোমবার পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

১৯ জুলাই শুক্রবার ২০২৪। আন্দোলন তখন প্রবল গতিতে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। খুনি হাসিনার নির্দেশে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা আন্দোলন রুখে দিতে আরও বেশি তৎপর হয়ে উঠেপড়ে লাগে। চারিদিকে ভাঙচুর, ফায়ারিং, হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি ঘোলাতে করার প্রাণপণ চেষ্টা চালায় তারা। আন্দোলনকে প্রতিহত করতে ঢাকার একটি মেট্রোরেল স্টেশনে আগুন ধরিয়ে দেয় আওয়ামী ক্যাডাররা। গণপরিবহন কর্তৃপক্ষের ভবন ভাঙচুরও করে তারা। ঐ দিন ঘাতক পুলিশের গুলিতে অন্তত ৬৬ জন নিহত হয়। নরসিংদীর একটি কারাগার 'দখল' করে প্রায় ৯০০ বন্দিকে ছেড়ে দেয়া হয়, প্রায় ৮০ টি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক হাজারের বেশি রাউন্ড গোলাবারুদ লুট করা হয়। একপর্যায়ে স্বৈরাচার এর তাবেদারি পুলিশ ও ছাত্রলীগের হেলমেট বাহিনী কর্তৃক সারা দেশে শিক্ষার্থীদের উপর নৃশংস ভাবে গুলাগুলি ও হত্যালিলা কার্যক্রম চালানো হয়। বিশেষ করে নরখাদক গুলো ঢাকার যাত্রাবাড়ি এলাকায় বিভিন্ন পয়েন্টে বিভিক্ত হয়ে ছাত্র, মুসল্লি এবং আম-জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। দেশীয় অস্ত্র হাতে নিয়ে অলিগলি টহল দিতে দেখা যায় আওয়ামীলীগ বাহিনী নামের নরপিশাচদের। শহীদ আউয়াল মিয়া জুম্মার নামাজের পর খাওয়া দাওয়া শেষ করে রাস্তায় হাটতে বের হয়। গুলাগুলি চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ শুনে কুতুবখালি উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের টহল দেয়া দেখে ঘাবড়ে যান। খেয়াল করেন পুলিশ পাখির মত গুলি চালিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে হত্যা করছে। ঘড়িতে বেলা ৩ ঘটিকা। হঠাৎ শহীদকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে ঘাতক পুলিশ দূর থেকে গুলি চালায়। কিছু বুঝে উঠার আগেই নরখাদকদের তিনটি গুলি আওয়াল মিয়ার শরীরে এসে বিদ্ধ হয়। জীবনের ঝুকি নিয়ে আশে পাশের মানুষ তাঁকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে বাসায় নিয়ে যায়।

প্রথম অবস্থায় আওয়াল মিয়া বা তাঁর ছোট মেয়ে আফসানা কেউই বুঝতে পারিনি শরীরে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। প্রতিবেশীদের কথা শুনে ভেবেছিলেন শরীরে ছররা গুলি বিদ্ধ হয়েছে। যে কারণে স্থানীয় ফার্মেসি থেকে প্রাথমিক সেবা নিয়ে নিজের বাসায় অবস্থান করছিলেন শহীদ আওয়াল। ধীরেধীরে তাঁর পেট ফুলে যায়। একপর্যায়ে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত হলে ছোট মেয়ে ও তাঁর প্রতিবন্ধী জামাই নিকটস্থ ইউনিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকেরা তবুও শরীরে বিদ্ধ হওয়া গুলি চিহ্নিত করতে পারে না। এদিকে অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে ধাবিত হতে থাকে। সর্বশেষ আওয়াল মিয়াকে নিয়ে যাওয়া হয় মুগদা মেডিকেলে। সেখানে গিয়ে পরীক্ষা করে জানা যায় শরীরে বিদ্ধ হওয়া গুলিটি আওয়াল মিয়ার পেটেই রয়েছে। তবে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ায় অপারেশন করা বেশ কষ্টসাধ্য। পরিবার থেকে অনুমতিক্রমে শহীদকে অপারেশন থিয়েটারে নেয়া হয়। অপারেশনের পর প্রজ্ঞাবান দেশপ্রেমিক আওয়াল মিয়া বুঝতে পারেন তাঁর হাতে হয়তো আর বেশি সময় নেই। ছোট মেয়ে ও স্ত্রীকে ডাক দিয়ে বলেন- আমার একমাত্র ছেলে হাবিবকে (১৮) তোমরা দেখে রেখ। আমি হয়তো আর বাঁচব না। তাঁর অল্প কিছুক্ষণ পর চিকিৎসারত অবস্থায় ২১ জুলাই ২০২৪ খ্রি রোজ রবিবার সকাল ৬:৩০ টায় শহীদি কাফেলায় যোগ দেন মহাবীর, দেশপ্রেমিক তেজস্বী শহীদ মো: আওয়াল মিয়া। লাশ পরবর্তীতে গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা জেলায় পৌঁছে। সকলের অশ্রুসিক্তে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত হন শহীদ আওয়াল মিয়া। পরিবারের একমাত্র অবলম্বন কে হারিয়ে নিস্ব হয়েছেন শহীদ পত্নী ও তাঁর পুত্র হাবিব মিয়া। ঘাতকের গুলিতে নিভে গেল এক প্রজ্বলিত পরিবার প্রদিপ। কি নিষ্ঠুর ওরা! একজন সাধারণ বৃদ্ধকে হত্যা করে কি লাভ ওদের? ঘতাকদের অন্তরে কোন সহানুভূতি কি নেই! খুনি হাসিনা ও তার দলবল আদৌ কি কোনদিন মানুষ ছিলেন? না মানুষ হবেন?

কেমন আছে শহীদে আউয়ালের মিয়ার পরিবার

শহীদ আওয়াল মিয়াকে হারিয়ে তাঁর পরিবার এখন দিশেহারা। একমাত্র উপার্জন ক্ষম ব্যক্তি শহীদ হওয়াতে পরিবারটি এখন সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। একমাত্র ছেলে হাবিবের বয়স আঠারো বছর। সে এখনো কোনো কর্মে যোগ দিতে পারেনি। তার স্ত্রী বলেন, আমাদের পরিবারের আর কিছু বাকি রইল না। আমরা কি করে খাব? কিভাবে চলবো? বুঝতে পারছি না!

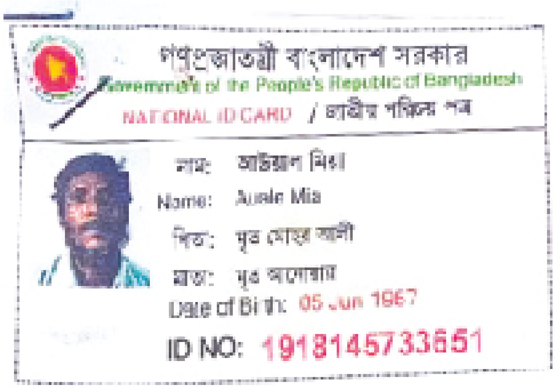
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: আউয়াল মিয়া
Name: Auale Mia
পিতা: মৃত মোহর আলী
মাতা: মৃত আনোয়ারা
Date of Birth: 05 Jun 1967
ID NO: 1918145733651

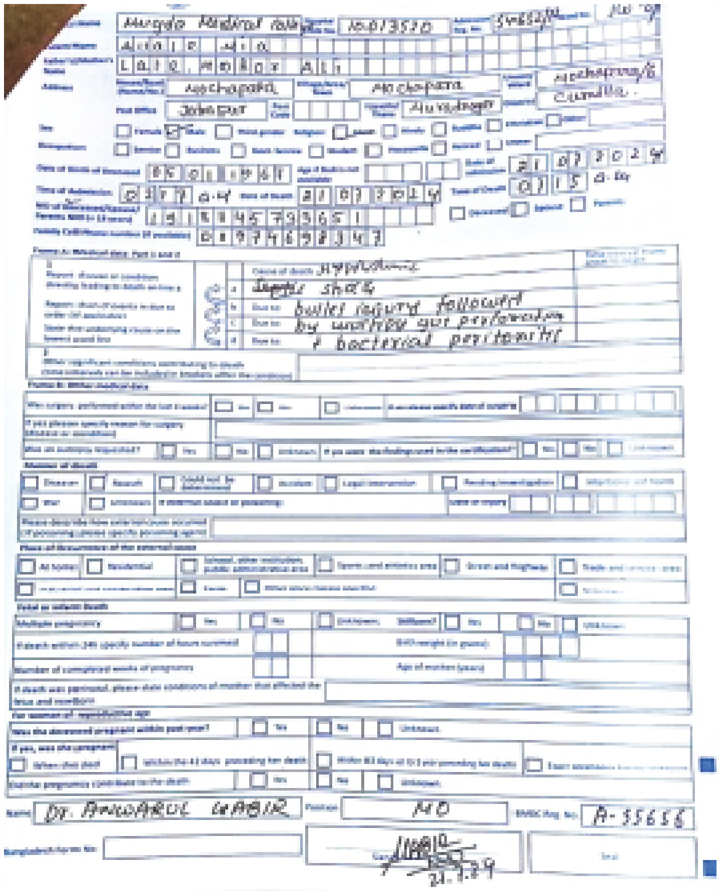

এক নজরে শহীদ আওয়াল মিয়া

নাম	: আওয়াল মিয়া
পেশা	: দিন মজুর
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০৫-০৬-১৯৬৭
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৩.০০ টা
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২১-০৭-২০২৪, সকাল ৬.৩০
শাহাদাত বরণের স্থান	: মুগদা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল
দাফন করা হয়	: নিজ গ্রামে
কবরের জিপিএস লোকেশন	: https://maps.app.goo.gl/xiW2LPmafzoMBSNJ8
স্থায়ী ঠিকানা	: মোচাগড়া, যাত্রাপুর, কুমিল্লা
পিতা	: মোহর আলী
মাতা	: আনোয়ারা
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: একটি টিনের বাড়ি আছে। অল্প ভিটা জমি আছে
সন্তানের বিবরণ	: ছয় মেয়ে ও এক ছেলে। মেয়েরা সবাই বিবাহিতা। একমাত্র ছেলে হাবিব (১৮) বেকার
প্রস্তাবনা	

১. শহীদ পুত্রকে কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে।
২. শহীদ পত্নীকে মাসিক বা এককালীন সাহায্য করা যেতে পারে

“একজন জাতীয় বীর ও ত্যাগী তারুণ্য একজনকে মারতে কতগুলো গুলি লাগে স্যার?”

শহীদ ইমাম হাসান তায়িম ভূঁইয়া

ক্রমিক : ৪৪৩

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০০২

শহীদ পরিচিতি

২০০৪ সালের ২ ডিসেম্বর রাজধানী শহরে জন্মগ্রহণ করেন শহিদ তায়িম ভূঁইয়া। তিনি ছিলেন বাবা মায়ের আদরের সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান। চারিত্রিক মাধুর্যতা এবং ব্যাক্তিজীবনের চালচলনে ছিলেন অন্যদের চেয়ে আলাদা। মাধ্যমিক শেষ করে ২০২২ সালে আদমজী নগর এম ডব্লিও কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হন তাঈম। শাহাদত বরণ করার পূর্বে দ্বাদশ শ্রেণির বানিজ্য বিভাগের ছাত্র ছিলেন তিনি। জীবনে অনেক বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। শহীদ পিতা বাংলাদেশ পুলিশের একজন সৎ অফিসার। এস আই পদে কর্মরত রয়েছেন। তাঁর মা চিরচারিত বাঙালি বধূ। সংসারের সকল কাজ নিজ হাতেই করেন। যাকে বলা হয় গৃহিনী। তাঈমের বড় দুই ভাই দেশ এবং বিদেশে উচ্চ শিক্ষা অর্জনে লেখাপড়া করছেন।

গত ২০ জুলাই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে সরকার কারফিউ জারি করে। ওইদিন দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল ছিল। সে সময় তাঈম ও তাঁর দুই বন্ধু একসঙ্গে যাত্রাবাড়ীর কাজলা এলাকায় চা খেতে যায়। যাওয়ার সময় তাহিম তাঁর বন্ধুকে বলে চা খাওয়া শেষ করে আমরা আন্দোলনে যাব। এরপর চায়ের দোকানে গিয়ে চা হাতে দুজনে গল্প করতে থাকে। কাজলা তখন উত্তাল। চারিদিকে ছাত্র আন্দোলনের তীব্র রণ হুংকারে আন্দোলিত হয় চারপাশ। আওয়ামী সন্ত্রাসী ও ঘাতক পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে ছাত্র- জনতার ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। একপর্যায়ে তৎকালীন যাত্রাবাড়ীর আওয়ামী সন্ত্রাসীরা যথাক্রমে ইকবাল হোসেন, শামীম, তানজিল আহমেদ প্রমুখের নির্দেশে ওয়ার্ড কর্মী জাকির হোসেন ও তার সঙ্গীরা বিক্ষোভকারীদের ওপর টিয়ারশেল, সাউন্ড গ্রেনেড, রাবার বুলেট, ছররা গুলি চালায়।

প্রাণ ভয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা হন্য হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। তাঈম ও তাঁর দুই বন্ধু টিটন চা স্টোরের ভেতর ঢুকে দোকানের সাটার টেনে দেয়। সাটারের নিচের দিকে আধা হাত খোলা ছিল। ভিতরে অবস্থানরত সকলকে পুলিশ টেনে বের করে। ক্যাডার জাকির হোসেন গুলি থেকে বাঁচতে চাইলে দৌড় দিতে বলে। প্রাণে বাঁচতে শহীদ তাহিম সবার আগে দৌড় দেয়। জাকির হাসতে হাসতে তাঁর উপর গুলি চালায়। সন্ত্রাসীরা চারপাশে ঘিরে রাখে। কেউ উদ্ধার করতে যাওয়ার সাহস করতে পারেনা। বিনা চিকিৎসায় রাস্তার উপর শাহাদত বরণ করেন শহীদ ইমাম হোসেন তাহিম। কয়েকজন জোর করে হাসপাতালে নিতে যায়। তাঁদেরকে শাসিয়ে জাকির জানায়- সাহস থাকলে সামনে আয়। অতঃপর মানুষরূপী জানোয়ার নরপিশাচ জাকির ও তার রক্তখেকো আওয়ামী পেটুয়া বাহিনী সেখান থেকে গেলে স্থানীয় জনতা শহীদের লাশকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায়। শহীদের মোবাইল থেকে এস আই পিতার মুঠোফোনে হাসপাতাল কর্মী ঘটনার বিবরণ জানায়। ছেলের মরদেহে গুলি দেখার পর মোবাইলে একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন 'একজনকে মারতে কতগুলো গুলি লাগে স্যার'।

উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন বুলেটের আঘাতে তছনছ

শহীদ তাহিমের উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন ছিলো। স্বপ্ন দেখতেন পছন্দের সাবজেক্টে দেশের বাইরে পড়তে যাবেন। সে অনুযায়ী ফ্রান্সের ভিসা ও পাসপোর্ট রেডি করেছিলেন। কিন্তু বর্বর হাসিনার পালিত দেশদ্রোহী গুন্ডা জাকির ও তার দলবলের বুলেট সকল স্বপ্ন মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায় শহীদ ইমাম হোসেন তাহিমের। পাসপোর্ট ভিসা রেডি থাকলেও ঘাতকের গুলি কেড়ে নিল মেধাবী এই শিক্ষার্থীর জীবন।

পাগলপ্রায় মা

শহীদ তাহিমের বাবা পুলিশ কর্মকর্তা। ঢাকা জেলাস্থ যাত্রাবাড়ীর রসুলপুর এলাকায় স্ব-পরিবারকে নিয়ে একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করেন। শহীদ পুত্রকে হারিয়ে তাঁর মা জননী আজ পাগলপ্রায়। তিনি বলেন, "আমার ছেলে আমার হাতের বানানো রুটি খেয়ে বের হয়। কিছুক্ষণ পর আমার কাছে খবর আসে, আমার ছেলেকে গুলি করা হয়েছে। তাকে ওরা টার্গেট করে হত্যা করেছে। আমার ছেলে প্রতিদিন ছাত্র আন্দোলনে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিত। আমার ছেলে অনেক মেধাবী ছিল। তার স্বপ্ন ছিল বিদেশ গিয়ে পড়াশোনা করা। যারা আমার ছেলেকে মেরেছে, তাদেরকে সবাই চেনে। আমি তাদের ফাঁসি চাই।"

"একটা ছেলেকে মারতে কয়টা গুলি লাগে স্যার?"

কোটা আন্দোলন চলাকালীন এই শিরোনামের নিউজটি সোস্যাল মিডিয়ায় প্রচার হয়। নিচে নিউজটি হুবহু তুলে ধরা হলো-

গত শনিবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ছোটাছুটি করছিলেন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উপপরিদর্শক ময়নাল হোসেন ও তার স্ত্রী। তাদের হাতে ছিল ১৭ বছরের ছেলে ইমাম হোসেন তাঈমের একটি ছবি। যাকেই পাচ্ছিলেন ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন, এই ছেলেকে তারা কি কোথাও দেখেছেন? বিকেল ৫টা থেকে পরের দুই ঘণ্টা তারা হতাহতদের তালিকায় তাঈমের নাম খোঁজেন। পরে ছবি দেখে একজন সাংবাদিক তাহিমের বাবাকে মর্গে খোঁজ নিতে বলেন। সঙ্গে সঙ্গে জরুরি বিভাগের লাশঘরের উদ্দেশে দৌড় দেন তিনি। একজন লাশঘরের দরজা খুলে দিলে ভেতরে ঢোকেন তারা। সেখানে পড়ে ছিল রক্তে ভেজা ছররা গুলিবিদ্ধ তাঈমের নিথর দেহ। ছেলের মরদেহ দেখে স্তব্ধ হয়ে যান ময়নাল হোসেন। তার স্ত্রী মেঝেতে পড়ে মূর্ছা যাওয়ার আগে চিৎকার করে বলছিলেন, 'ও আল্লাহ! আমার পোলারে কে মারল! তুই আমারে না কইয়া কেন বাইর হইছিলি?' কোটা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দিতে কলেজ শিক্ষার্থী তাহিম শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে তাদের যাত্রাবাড়ীর বাসা থেকে বেরিয়ে যান। এর আগে তিন দিন ধরে যাত্রাবাড়ীতে সংঘর্ষ চললেও তাহিমকে ঘরে আটকে রাখা যায়নি।

ঘণ্টাখানেক পর তাঈমের বাবা-মাকে কেউ ফোন করে জানায় যে তাদের ছেলেকে গুলি লেগেছে; তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। ময়নাল বলেন, 'কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে আমার ছোট ছেলে তাতে যোগ দেয়। তাকে শুরু থেকেই না করেছিলাম আন্দোলনে যেতে। কারফিউয়ের মধ্যে তাকে বের হতেও না করেছিলাম। কিন্তু আমার কথা শোনেনি।' মর্গে তাঈমের মরদেহ খুঁজে পাওয়ার পর ফোনে ময়নালকে বলতে শোনা যায়, 'স্যার, আমার ছেলেটা মারা গেছে। বুলেটে ওর বুক ঝাঁজরা হয়ে গেছে। স্যার, আমার ছেলে আর নেই।'

তিনি প্রশ্ন রেখে তাকে বলেন, 'একজনকে মারতে কতগুলো গুলি লাগে স্যার?' ছেলে গুলিবিদ্ধ জানিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছিলেন ময়নাল। ফোনে কথা বলার সময় অপর প্রান্তে কে ছিলেন তা নিশ্চিত করতে পারেনি দ্য ডেইলি স্টার।-ডেইলি স্টার

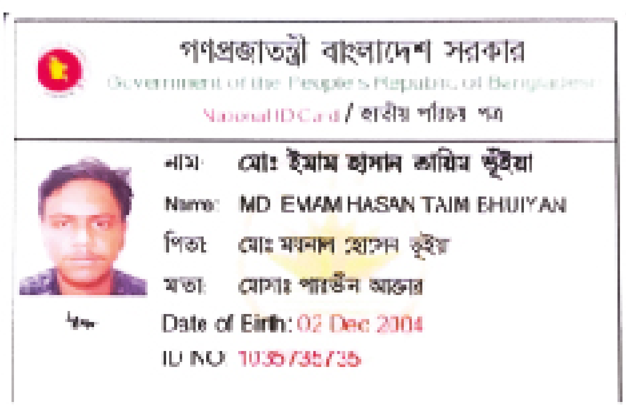

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ ইমাম হাসান তাইম ভূঁইয়া
Name: MD. EMAM HASAN TAIM BHUIYAN
পিতা: মোঃ ময়নাল হোসেন ভূঁইয়া
মাতা: মোসাঃ পারভীন আক্তার
Date of Birth: 02 Dec 2004
ID NO: 1036735736

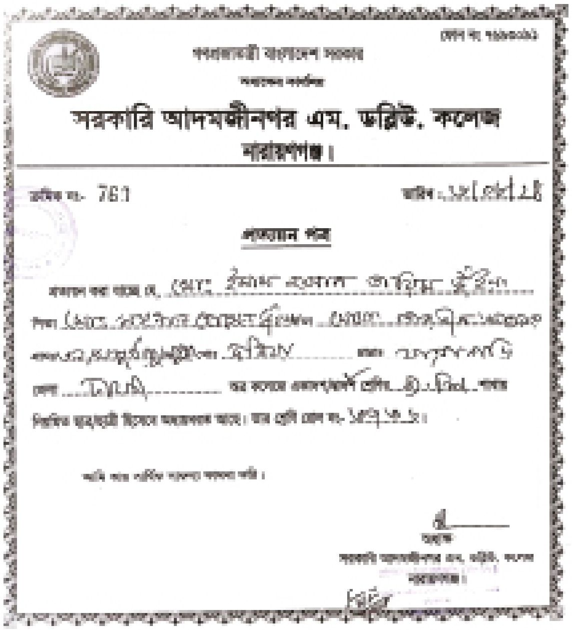

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরকারি আদমজীনগর এম. ডব্লিউ. কলেজ

নারায়ণগঞ্জ।

ক্রমিক নং- 761

প্রত্যয়ন পত্র

এক নজরে শহীদের তথ্যাবলি

নাম	: মো: ইমাম হাসান তায়িম ভূঁইয়া
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০২/১২/২০০৪,২০ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২০ জুলাই ২০২৪, শনিবার, আনুমানিক দুপুর ১২.৩০ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: কাজলা
দাফন করা হয়	: গ্রামের বাড়ির কবরস্থান
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 23°27'00.8"N 91°00'00.4"E
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: এতবার পুর, থানা/উপজেলা: চান্দিনা, জেলা: কুমিল্লা
পিতা	: মো: ময়নাল হোসেন ভুইয়া
মাতা	:মোসা: পারভীন আকতার
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে একটি সেমিপাকা বাড়ি আছে
ভাইবোনের বিবরণ	: বড় দুই ভাই রয়েছে। তারা দুজনই পড়াশোনা করে

শহীদ মো: আল মামুন আমানত
ক্রমিক : ৪৪৪
আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০০৩

'আমার স্বামীকে ওরা ইচ্ছে করে হত্যা করেছে। আমি তাদের ফাঁসি চাই।'

শহীদ পরিচিত

১৯৮৪ সালের ১৭ নভেম্বর কুমিল্লার মুরাদনগরে জন্মগ্রহণ করেন আল মামুন আমানত। অল্প বয়সেই বাবা-মা'কে হারান। নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে পাড়ি জমান কল-কারখানার শহর নারায়ণগঞ্জে। সরকারি কলেজ থেকে লেখাপড়া শেষ করে শুরু করেন কাপড়ের ব্যবসা। বিয়ে করেন হাসিনা মমতাজকে। তাদের কোলজুড়ে আসে দুই কন্যাসন্তান। শহীদ আমানত নারায়ণগঞ্জ কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

"পার্থিব জগতে আমার ভাইয়ের শূন্যস্থান পূরণের মত সামর্থ্য আমাদের কারো নেই।"

যেভাবে শহীদ হলেন

শেখ হাসিনার পদত্যাগের দিন ৫ আগস্ট বিকালে বাসা থেকে বের হয়ে নিখোঁজ ছিলেন নারায়ণগঞ্জের জালকুড়ি এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ আমানত (৪০)। বের হওয়ার সময় স্ত্রী হাসিনা মমতাজকে বলেছিলেন রাতেই ফিরে আসবো। এরপর থেকে আমানতের কোনো সন্ধান পাচ্ছিলেন না স্বজনরা। অবশেষে ৯ দিন পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে সনাক্ত করা হয় তার লাশ। তাকে এমনভাবে গুলি করা হয়েছে যে পুরো মুখমণ্ডল ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই তার স্ত্রী আরও

একাধিকবার দেখেও স্বামীর লাশ চিনতে পারেনি। আমানতের খোঁজ পেতে ছাপানো হয় পোস্টার। অবশেষে ১৪ আগস্ট নিহতের খালা ঢাকা মেডিকেল মর্গে গিয়ে আমানতকে সনাক্ত করেন। বৃহস্পতিবার ১৫ আগস্ট ২০২৪ রাত ৯ টায় চাষাড়া শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে শহীদ আমানতের লাশ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। নিহতের স্ত্রী হাসিনা মমতাজ বলেন, "গত ৫ তারিখ গুলিবিদ্ধ হন আমানত। তার শরীরে আরো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। হাসপাতাল থেকে জানানো হয়েছে, ওইদিনই মৃত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল।" জানাজায় অংশ নিয়ে আমানতকে স্মরণ করে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ বলেন, "পার্থিব জগতে আমার ভাইয়ের শূন্যস্থান পূরণের মত সামর্থ্য আমাদের কারো নেই। সৃষ্টিকর্তা যেন তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন।"

'গ্রামে আবাদি জমি থাকলেও তাঁর বসতি বাড়ী নেই'

নিঃস্ব শহীদ পরিবার

শহীদ আমানত পরিণত বয়সে বিয়ে করেন ডা: হাসিনা মমতাজকে। তাঁদের ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয় আরোহী (৮) ও আয়রা (১) নামের দুইটি ফুটফুটে ফুল। গ্রামে আবাদি জমি থাকলেও তাঁর বসতি বাড়ী নেই। যে কারণে ব্যবসার শহর নারায়ণগঞ্জে পরিবারকে নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকতেন মহাবীর শহীদ আমানত। শহীদ স্ত্রী ডাক্তারি বিদ্যা চর্চা বন্ধ রেখেছেন। যে কারণে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হিসেবে আমানতই ছিলেন প্রধান কর্তা। বাবাকে হারিয়ে এতিম হয়েছে দুটি সন্তান। থমকে গিয়েছে তাঁদের অনাবিল জীবন। বর্তমানে শহীদ পরিবারে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে।

শহীদের স্ত্রী বলেন, 'আমাদের দুই সন্তান। এখন আমরা কি করব বলেন? কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? সব তো শেষ হয়ে গেল।'

শহীদ পত্নীর স্মৃতি চারণ

শহীদ আমানতের স্ত্রী ডা. হাসিনা মমতাজ বলেন- 'আমার স্বামী ৫ আগস্ট বাসা থেকে বের হয়। সারাদিন চলে গেলেও সেদিন আর বাসায় ফেরেনি! তখন থেকেই আমরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁকে খুঁজতে থাকি। কোথাও সন্ধান না পেয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে গিয়ে খোঁজ নেই। আমানতকে ঘাতক পুলিশ ও সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ বাহিনী এমন ভাবে গুলি করেছে, এবং পিটিয়ে জখম করেছে যে তাঁর চেহারা সম্পূর্ণ রূপে বিকৃত হয়ে যায়। যে কারণে আমি একাধিক বার লাশ দেখেও চিহ্নিত করতে পারিনি। পরবর্তীতে শহীদের খালা আমানতের লাশ চিহ্নিত করে। কারণ বাবা-মা মারা যাওয়ার পর আমানতকে ওর খালা-ই বড় করেছেন। আমাদের দুই সন্তান। এখন আমরা কি করব বলেন? কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? সব তো শেষ হয়ে গেল। আমাদের ছোট ছোট সন্তানেরাও অল্প বয়সে এতিম হয়ে গেল! ওদেরকে এখন কিভাবে পিতার স্নেহ ভালবাসা দিয়ে আগলে রাখব! আমি আমানত হত্যার বিচার চাই। আমার স্বামীকে ওরা ইচ্ছে করে হত্যা করেছে। আমি তাদের ফাঁসি চাই। আমার স্বামীকে ছাড়া কিভাবে আমি বাকি জীবন কাটাব জানিনা!

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ আল মামুন আমানত
Name: MD. AL MAMUN AMANAT
পিতা: মোঃ আব্দুল লতিফ
মাতা: রহেনা বেগম
Date of Birth: 17 Nov 1984
ID NO: 6890133520

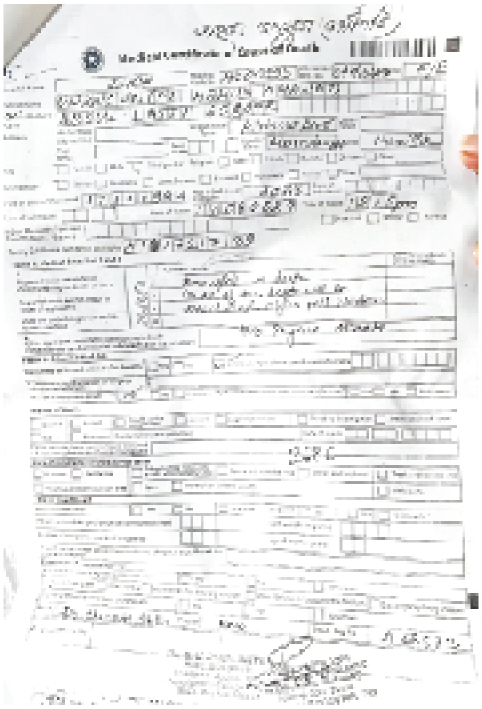

সহযোগিতার প্রস্তাবনা সমূহ

প্রস্তাবনা : ১ শহীদের এতিম সন্তানকে লালন পালনের দায়িত্ব নেয়া
প্রস্তাবনা : ২ শহীদের পরিবারকে মাসিক অথবা এককালীন সাহায্য করা যেতে পারে
প্রস্তাবনা : ৩ শহীদের স্থায়ী বাসস্থান না থাকায় তাঁর পরিবারকে স্থায়ী নিবাস করে দেয়া যেতে পারে
প্রস্তাবনা : ৪ শহীদ স্ত্রী যেহেতু চিকিৎসক তাঁকে যে কোন হাসপাতালে প্রাক্টিস করার পরিবেশ তৈরিতে সহযোগিতা করা যেতে পারে

এক নজরে শহীদ আল মামুন আমানত

নাম	: মো: আল মামুন আমানত
পেশা	: কাপড় ব্যবসারী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৭/১১/১৯৮৪, ৪০বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার , আনুমানিক বিকেল ৪ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
দাফন করা হয়	: পারিবারিক কবরস্থান
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 2335'04.3"N 9055'44.7"E
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মুরাদনগর থানা/উপজেলা: মুরাদনগর, জেলা: কুমিল্লা
পিতা	: মো: আব্দুল লতিফ (মৃত)
মাতা	: রাবেয়া বেগম (মৃত)
স্ত্রী	: ডা: হাসিনা মমতাজ
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে অল্প জমি আছে
সন্তানের বিবরণ	: দুই মেয়ে, আরোহী (৮), আয়রা (১)

“হোটেল থেকে দুপুরের খাবার শেষ করে আর বাড়ি ফেরা হলো না ফারুকের।”

শহীদ মো. ফারুক

ক্রমিক : ৪৪৫

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০০৪

শহীদ পরিচিতি

মো: ফারুক, যিনি ৩০ এপ্রিল ১৯৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবন ছিল ভীষণ পরিশ্রমী ও আন্দোলনমুখী। পেশায় ফার্নিচার দোকানের কর্মচারী পদে চাকরি করতেন। চট্টগ্রামের মুরাদপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন শহীদ ফারুক। বাংলাদেশ পুলিশের বর্বর আচরণে গত ১৬ জুলাই ২০২৪ একটি শোকাবহ অধ্যায়ের সূচনা হয়। গুলি করে হত্যা করা হয় দেশ প্রেমিক এই মহাবীরকে। শহীদের মৃত্যু শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রশ্নের জন্ম দেয়।

যেভাবে শহীদ হলেন

শহীদ ফারুকের মৃত্যুর ঘটনা দেশের সাধারণ মানুষের হৃদয়ে একটি গভীর শোকের সঞ্চার করেছে। ১৬ জুলাই ২০২৪ তারিখে দুপুরে কাজ শেষে ফারুক একটি স্থানীয় হোটেলে ভাত খেতে যান। খাবার শেষ করে যখন তিনি ফেরার পথে ছিলেন, তখন একটি অপ্রত্যাশিত ও নির্মম ঘটনার শিকার হতে হয় তাঁকে। পুলিশি বর্বরতায়, শহীদকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। তাঁর বুকে এবং পিঠে গুলি লাগে। গুরুতর আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ফারুকের মৃত্যু দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং পুলিশি আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি বড় উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়।

পরিবারের অচলাবস্থা

মোঃ ফারুকের মৃত্যুতে তাঁর পরিবারে গভীর শোকের মাতম চলছে। তাঁর স্ত্রী সীমা আকতার (২৮) গৃহিণী। তাদের সংসারে দুটি সন্তান রয়েছে। শহীদ পিতা দুলালের বয়স ৭০ বছর। তিনি বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। মাতা শাহনেদো বেগম গৃহিণী। ফারুকের মৃত্যু তার পরিবারে একটি অপূরণীয় ক্ষতি ও গভীর শোকের সৃষ্টি করেছে। তাদের জীবন এখন একটি কঠিন দুঃখ এবং আঘাতের মধ্যে ডুবে আছে।

মোঃ ফারুকের পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ। পরিবারের কোনো নিজস্ব জমি বা সম্পত্তি নেই। শহীদ স্ত্রী বর্তমানে একটি হাসপাতালের আয়া পদে স্বল্প বেতনে চাকরি করছেন। আয়ের পরিমাণ সামান্য হওয়ায় পরিবারের দৈনন্দিন খরচ পূরণে যথেষ্ট নয়। ফারুকের মৃত্যু তাদের জীবনের আর্থিক স্থিতিশীলতা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছে। ফলে, তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সমর্থন ও সহায়তার প্রয়োজন।

প্রেরণায় শহীদ ফারুক

মোঃ ফারুকের জীবন এবং মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ শিখতে পারি–ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার রক্ষার জন্য আমাদের সদা সচেতন ও সংগ্রামী হতে হবে। তার পরিশ্রম, সততা এবং শান্তিপূর্ণ জীবন সমাজে একটি অনুপ্রেরণা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ফারুকের আত্মত্যাগ আমাদেরকে প্রেরণা দেয় যে, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের জন্য আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

শহীদ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যের ও বন্ধুর বক্তব্য

স্ত্রী (সীমা অকতার): ফারুক ছিল আমার জীবনসঙ্গী, এবং তার মৃত্যু আমাদের জীবনে একটি বিশাল শূন্যতা তৈরি করেছে। তার অভাব আমার প্রতিদিনের জীবনে গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে। সে অত্যন্ত ভাল, সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং পরিশ্রমী মানুষ ছিল।

পিতা (দুলাল): ফারুক ছিল আমার গর্ব। সে পরিশ্রমী এবং সত্যিকারের সৎ ছিল। তার চলে যাওয়ায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং পরিবারের জন্য এটি এক বিরাট ক্ষতি।

শহীদের বন্ধু : ফারুক ছিল একজন অত্যন্ত ভালো মানুষ। সে সবসময় হাস্যোজ্জ্বল এবং বন্ধুদের প্রতি আন্তরিক ছিল। তার মৃত্যু আমাদের সবার জন্য একটি গভীর শোকের বিষয়।

এক নজরে শহীদ মো: ফারুক

নাম	:	মো: ফারুক
জন্ম তারিখ	:	৩০ এপ্রিল ১৯৮৯
পেশা	:	ফার্নিচার কর্মচারী
বর্তমান ঠিকানা	:	আকবরের বাড়ি, লালখান বাযার, জাম মসজিদ, লালখান থানার অধীন, চট্টগ্রাম
মৃত্যুর তারিখ	:	১৬ জুলাই ২০২৪
মৃত্যুর স্থান	:	মুরাদপুর, চট্টগ্রাম
মৃত্যুর কারণ	:	পুলিশের গুলিতে শহীদ
স্ত্রী	:	সীমা অকতার (২৮ বছর, গৃহিণী)
সন্তান	:	১ ছেলে, ১ মেয়ে
সন্তান	:	ফাহিমুল ইসলাম (১২ বছর), ফারিয়া আক্তার (৬ বছর)
পিতা	:	দুলাল (৭০ বছর, অবসরপ্রাপ্ত)
মাতা	:	শানুফা বেগম (গৃহিণী)

প্রস্তাবনা
১. শহীদ সন্তানদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে
২. শহীদ স্ত্রীকে মাসিক সহযোগিতা করা যেতে পারে

আমাদের পরিবারের আলোর প্রদীপটা নিভিয়ে দিল পুলিশ

শহীদ মো : পারভেজ

ক্রমিক : ৪৪৬

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০০৫

শহীদ পরিচিত

শহীদ মো: পারভেজ ১১ জানুয়ারি ২০০১ সালে নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ভুঁইঘর এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবার নাম সোহরাব মিয়া। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। মায়ের নাম পারভীন বেগম। তিনি একজন গৃহিণীর পাশাপাশি গার্মেন্টস কর্মী। শহীদ পারভেজ ছিলেন পরিবারের একমাত্র ছেলে। তার দুইজন বোন রয়েছে। তারা দুজনই কলেজের শিক্ষার্থী। তিনি মামুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ২০১১ সালে পিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ২০১৭ সালে আনন্দলোক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করেন। পরে সিসিআরই মডেল কলেজ থেকে ২০১৯ সালে এইচএসসি পাশ করে শাহাদাত বরণকালীন পর্যন্ত তোলারাম কলেজে ডিগ্রী ৩য় বর্ষে অধ্যয়নরত ছিলেন। শহীদের পৈতৃক নিবাস কুমিল্লা জেলায়। শহীদ জননী পারভিন বেগম বলেন, একটু ভালো থাকার আশায় নারায়ণগঞ্জ শহরে এসেছিলাম।

যেভাবে শহীদ হলেন তিনি

১৯ জুলাই ২০২৪, জুমাবার। স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী পারভেজ তার দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নারায়ণগঞ্জ জালকুড়ি এলাকায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে পুলিশ হঠাৎ আন্দোলনকারীদের উপর গুলি ছুড়ে। এসবি গার্মেন্টস থেকে ছোড়া গুলি মো. পারভেজকে বিদ্ধ করে । ঘটনাস্থলে থাকা দলীয় নেতা কর্মীরা পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। পারভেজ এর বন্ধু রনি জানান, শুক্রবার জুলাই ১৯ স্বেচ্ছাসেবক দলের পক্ষ থেকে আমরা ছাত্রদের সাথে একাত্মতা পোষণ করে আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে জালকুড়িতে আন্দোলন করছি। হঠাৎ জালকুড়িস্থ এসবি গার্মেন্টস থেকে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার

উপর গুলি বর্ষণ করে। শহীদ পারভেজ এর মত অনেকেই আহত হন। এবং ঘটনাস্থলে কয় একজন মারা যান। এঘটনায় এসবি গার্মেন্টসের কর্তৃপক্ষ ও যারা জড়িত তাদের বিচার সহ দেশের সকল শহীদদের বিচার দাবি করছি। ঘাতকরা আমার বুক খালি করে দিল। আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই।

অসহায় শহীদ পরিবার

শহীদ মো: পারভেজকে হারিয়ে এখন তার পরিবার খুবই অসহায় হয়ে পড়েছে। শহীদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই নাজুক। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন শহীদের বাবা সোহরাব মিয়া। তিনি এখন অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী । মা গার্মেন্টেসে চাকরি করে পরিবার চালায়। দুই বোন পড়াশোনা করছে। শহীদের পিতার গ্রামে একটি বসতি জমিতে টিনের বাড়ি রয়েছে। পরিবারের সকল ভবিষ্যৎ ছিল একমাত্র ছেলে পারভেজকে ঘিরে। জালিমরা এই পরিবারটির সকল ভবিষ্যৎ এখন বুলেটের আঘাতে উড়িয়ে দিল।

পরিবারের কথা

শহীদের বোন পাপিয়া বলেন, আমাদের পরিবারের আলোর প্রদীপটা নিভিয়ে দিল পুলিশ । আমরা এখন খুবই অসহায় অবস্থায় আছি। আমার ভাইয়ের হত্যার বিচার চাই।

শহীদ জননী পারভিন বেগম বলেন, ঘাতকরা আমার বুক খালি করে দিল। আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই। আমি খুনি হাসিনার ফাসি চাই।

প্রেরণায় শহীদ পারভেজ

শহীদ মো: পারভেজ আমাদের প্রেরণা। এই তরুণ জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে জালিমের বিরুদ্ধে লড়েছেন। তাঁর সহপাঠীরা তাঁকে ভুলতে পারছেনা। তার বন্ধু আব্দুল্লাহ বলেন, আমাদের বন্ধু পারভেজ ছিল অত্যন্ত বিনয়ী একজন ছেলে। সবার সাথে মিলে মিশে জীবন যাপন করতো। আমরা পারভেজকে হারিয়ে খুবই শোকাহত হয়ে পড়েছি। এখন আর কেউ আমাকে ফোন করে বলেনা- 'বের হবি? চল একটু বাইরে ঘুরে আসি? নামাজের জন্য কেউ আর ডাক দেয় না। ও শুধু আমার বন্ধু ছিল না, ও ছিল আমার ভাই। আমি আমার ভাই হত্যার বিচার চাই।

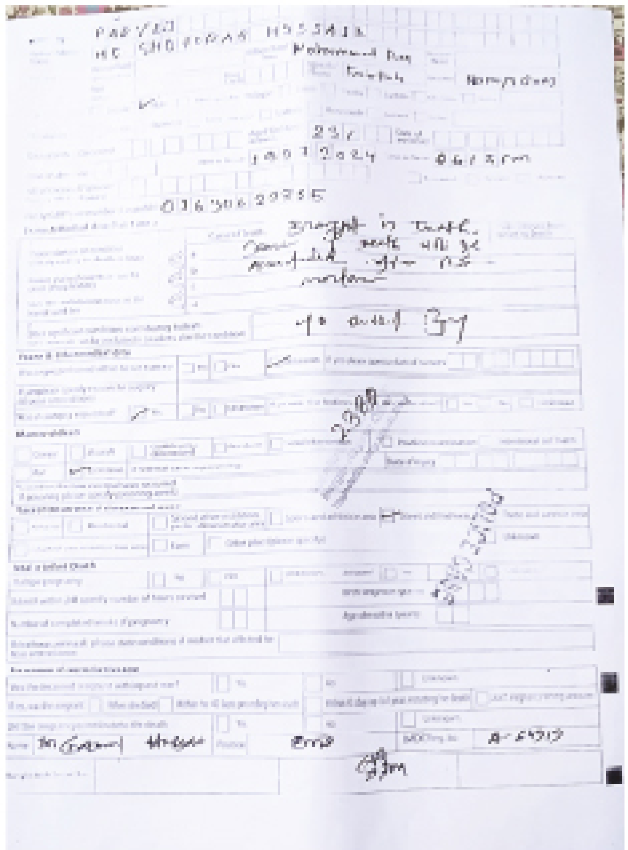

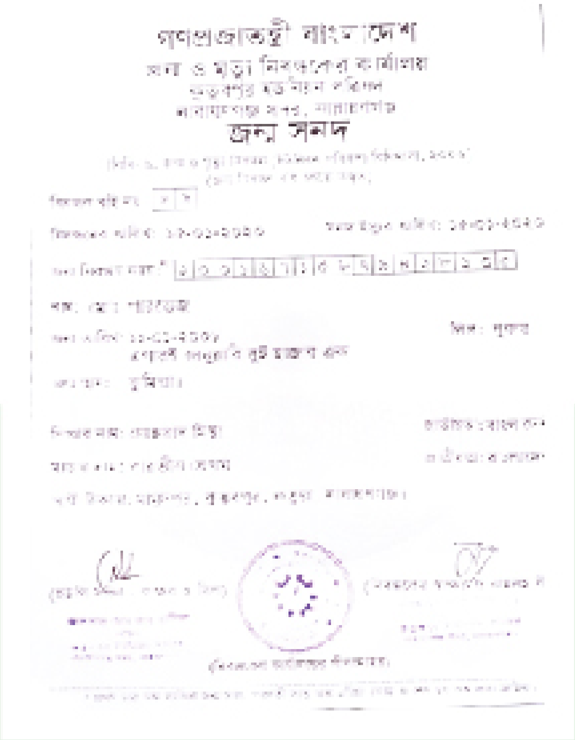

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
জন্ম সনদ

এক নজরে শহীদ মো: পারভেজ

নাম	: মো: পারভেজ
পেশা	: ছাত্র, তোলারাম কলেজ নারায়ণগঞ্জ, ডিগ্রি শেষ বর্ষ
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১১-০১-২০০১, ২২ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, জুমাবার
শাহাদাত বরণের স্থান	: জালকুড়ি, নারায়ণগঞ্জ
দাফন করা হয়	: নিজ গ্রামে
স্থায়ী ঠিকানা	: আমিনলগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ
পিতা	: সোহরাব মিয়া
মাতা	: পারভীন বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: একটি টিনের বাড়ি আছে
ভাইবোনের বিবরণ	: দুই বোন পড়াশোনা করে
প্রস্তাবনা	১. শহীদের পরিবারে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে
	২. শহীদের বোনদেরকে শিক্ষাবৃত্তি দেয়া যেতে পারে
	৩. শহীদ পিতাকে কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে (মুদি দোকান)

আমার ছোট দুইটা মেয়ে আছে। আমি তাদের নিয়ে এখন কোথায় যাব?

শহীদ মোঃ বাবু

ক্রমিক : ৪৪৭

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০০৬

শহীদ পরিচিতি

১৯৯৩ সালের ২৯ নভেম্বর কুমিল্লার দাউদকান্দির তুজারভাঙ্গা এলাকায় জন্ম নেন মোঃ বাবু। তিনি গ্রামের মক্তব থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপর ফার্নিচার তৈরির কাজ শিখে একটি দোকানের কারিগর পদে যোগ দেন। পরিণত বয়সে বিয়ে করেন মোসাঃ মুন্নি আকতারকে। তাদের কোলজুড়ে আসে দুটি কন্যাশিশু। এভাবেই চলতে থাকে সুখের সংসার।

আন্দোলনের দিনগুলো

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবি জানিয়ে আন্দোলন করে আসছিলেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তাদের এই আন্দোলনকে যৌক্তিক ভাবে সমাধানের পথে না গিয়ে বিগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থিত নরপিশাচ ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের

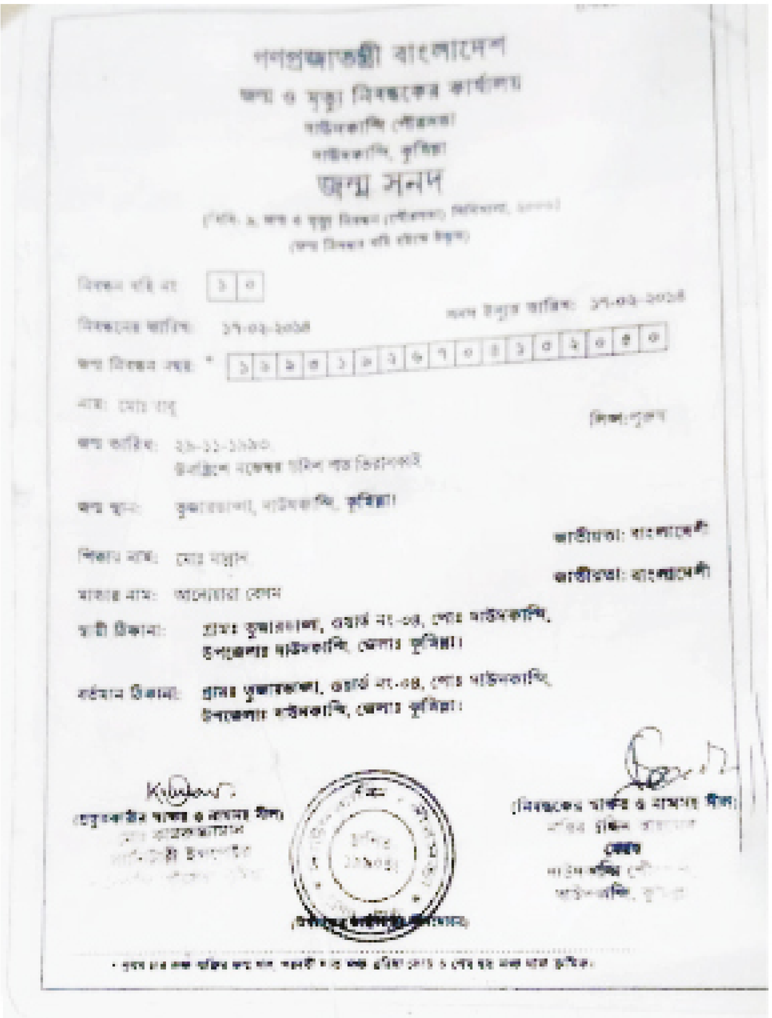

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
দাউদকান্দি পৌরসভা
দাউদকান্দি, কুমিল্লা
জন্ম সনদ

নাম: মোঃ বাবু
লিঙ্গ: পুরুষ
জন্ম স্থান: দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম: আনোয়ারা বেগম
জাতীয়তা: বাংলাদেশী

নেতাকর্মীদেরকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমনে লেলিয়ে দেয়া হয়। পাশাপাশি ঘাতক আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বিগত স্বৈরাচার সরকারের নির্দেশে কঠোর অবস্থানে থেকে শিক্ষার্থীদের উপরে চড়াও হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৬ জুলাই রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হন। ওইদিন দেশব্যাপী ছয় জনের মৃত্যু হয়। যার ফলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ সারা বাংলাদেশের ছাত্র জনতা ফুঁসে ওঠে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন এক দফায় রূপ নেয়। আন্দোলনকে দমন ও নির্মূল করতে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সমর্থিত কুখ্যাত ক্যাডার ও স্বৈরাচারী হাসিনার পালিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে সহস্রাধিক মানুষ নির্মমভাবে গুলিতে নিহত হন। একপর্যায়ে ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী হাসিনার পতন হয়।

যেভাবে শহীদ হলেন

স্বৈরাচারী হাসিনার পতনের পর সারাদেশে জনতার বিজয় মিছিল সংগঠিত হয়। তেমনি কুমিল্লার দাউদকান্দি থানার সামনে ৫ আগস্ট বিক্ষুব্ধকারী জনতা উল্লাস মিছিলের আয়োজন করে। একপর্যায়ে মিছিলরত মানুষের উপর বর্বর পুলিশ বাহিনী এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। হঠাৎ একটি বুলেট শহীদ বাবুর শরীরে এসে আঘাত হানে। সেখানেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। লোকজন ধরাধরি করে কুমিল্লা মেডিকেলে নিয়ে গেলে সেখান থেকে ডাক্তার ঢামেকে রেফার করে পাঠায়। ঢামেকে নেয়ার পথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বাবু।

চিরদিনের জন্য রেখে গেলেন সাত মাসের অবুঝ শিশু কন্যার সাথে সাত বছর বয়সী এক কন্যা। ঘাতকের গুলিতে সারা জীবনের জন্য বিধবা পরিচয় বহন করতে হবে শহীদ স্ত্রীর। বাবু ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জন কারী। হঠাৎ তাঁর মৃত্যুতে পরিবারে নেমেছে শোকের ছায়া। একমাত্র অবলম্বনকে হারিয়ে শহীদ পরিবার বর্তমানে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

'অনাহার-অনাদরে যাপিত জীবন পার করছে বিধবা স্ত্রী ও শহীদের অসহায় ফুটফুটে সন্তানেরা।'

কেমন আছে তার পরিবার

শহীদ বাবু একটি ফার্মিচারের দোকানে কাজ করতেন। অল্প উপার্জন ও টানাপড়েনের সংসার হলেও স্ত্রী ও দুই কন্যা নিয়ে মহাসুখেই বসবাস করতেন। শহীদ পরিবারে দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে। শহীদ পিতা একজন অটো চালক। দেশপ্রেমিক মহাবীর মারা যাওয়ার পর এই মুহূর্তে তাঁর পরিবারকে দেখাশোনার মত কেউ নেই। অনাহার-অনাদরে যাপিত জীবন পার করছে বিধবা স্ত্রী ও শহীদের অসহায় ফুটফুটে শিশু সন্তানেরা।

স্বামীকে হারিয়ে তাঁর স্ত্রী বলেন- আমার ছোট দুইটা মেয়ে আছে। আমি তাদের নিয়ে এখন কোথায় যাব? তাদের পড়ালেখা, ভবিষ্যৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল। ঘরে আর কোনো পুরুষ মানুষ নেই। সন্তানদের নিয়ে এই মানবেতর জীবন ভীষণ কষ্টের।

এক নজরে শহীদ মোঃ বাবু

নাম	: মোঃ বাবু
পেশা	: শ্রমিক (ফার্নিচার দোকানের কারিগর)
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২৯-১১-১৯৯৩, ৩১ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার, আনুমানিক বিকেল ৫ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: দাউদকান্দি থানা , কুমিল্লা
দাফন করা হয়	: বাড়ির পাশের কবরস্থানে
কবরের জিপিএস লোকেশন	: https://maps.app.goo.gl/GHYjd74rw97wfw
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: তুজারভাঙ্গা উপজেলা: দাউদকান্দি জেলা: কুমিল্লা
পিতা	: মোঃ মান্নান
মাতা	: আনোয়ারা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: কোনো সম্পদ নেই
সন্তানের বিবরণ	: ১. পিয়া আক্তার (৭), স্থানীয় মাদরাসায় পড়ে ২. মিম আক্তার, বয়স সাত মাস
প্রস্তাবনা	: ১. শহীদের সন্তানদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে ২. শহীদের সন্তানদের স্থায়ী নিবাস করে দেয়া যেতে পারে ৩. শহীদ পত্নীকে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করে দেয়া যেতে পারে

“গন্তব্য একটাই। হয় দেশের কাফনের কাপড় শেষ হবে, অথবা মিষ্টির দোকান খালি হবে।”

শহীদ মোঃ জিহাদ হাসান মাহিম

ক্রমিক : ৪৪৮

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০০৭

শহীদ পরিচিতি

কোটা সংস্কার আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল কলেজ শিক্ষার্থী জিহাদ হাসান মাহিম। আন্দোলন যখন একদফায় গড়ায় তখন যাত্রাবাড়ী এলাকায় চলছিল টানা সহিংসতা-সংঘাত। ভয় থেকে মাহিমের মা কোহিনুর বেগম ছেলেকে নিষেধ করেছিলেন আর আন্দোলনে না যেতে। মাহিম বলেছিল মা আর একদিন মাত্র আন্দোলনে যাবো। ৫ আগস্ট মা থেকে লুকিয়ে আন্দোলনে যায় সে। এরপর আর ঘরে ফিরতে পারেনি; ফিরে আসে মাহিমের গুলিবিদ্ধ লাশ। গত ৫ আগস্ট দুপুরে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে নিহত হন জিহাদ হাসান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে প্রাণ হারানো শিক্ষার্থী মাহিমের বাবা মোহাম্মদ আলম মিয়া ছেলের শোক বয়ে বেড়াচ্ছেন। তবে তিনি গর্ববোধ করেন দেশের জন্য ছেলের মহান আত্মত্যাগে।

যাত্রাবাড়ী থানাধীন শনির আখড়া এলাকায় তাদের বাসায় গিয়ে দেখা যায় শোকবিহ্বল পরিস্থিতি।

তার বই খাতা, খেলার সরঞ্জাম বুকে আঁকড়ে ধরে যেন ছেলের স্পর্শ অনুভব করতে চাইছেন শোকার্ত পিতামাতা। কান্নায় ভেঙে পড়ে পিতা মোহাম্মদ আলম মিয়া বলেন, "গত ১৯ জুলাই আন্দোলনে গিয়ে সে ছররা গুলিতে আহত হয়েছিল। আমি তাকে বলি, আন্দোলনে গিয়ে তোর কিছু হলে আমাদের কী হবে? ছেলে উত্তর দিলো, আমরা ঘরে বসে থাকলেই বা তোমাদের কী হবে! দেশটাকে পরিষ্কার করতে হবে। সেটা আমরা ঘরে বসে থাকলে হবে না। আমি বলি, তাহলে তুই একা যাবি না। আমি আর তোর ছোট ভাইও সঙ্গে যাবো।"

মোহাম্মদ আলম বলেন, 'আমি স্বল্প আয়ের চাকরিজীবী মানুষ। কষ্ট হলেও আমার সীমিত সামর্থ্যে ছেলের স্বপ্ন পূরণে চেষ্টা করে গেছি, নিজে স্বপ্ন দেখেছি। ছেলেকে হারিয়ে এখন আমার চারদিক

অন্ধকার!' জিহাদ হাসান মাহিমের বয়স হয়েছিল মাত্র ১৮ বছর। রাজধানীর ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন জিহাদ। অঝোর কান্নায় মাহিমের মা কোহিনুর বেগম বলেন, 'সবাই বলছিল ৫ আগস্ট পরিস্থিতি আরও বেশি খারাপ হবে। আগের দিন ছেলেকে বলি, তুই আন্দোলনে আর যাবি না। আমার খুব ভয় লাগছে। ছেলে বললো, আর এক দিনই যাবো মা। সেদিন সকাল থেকেই ছেলেকে আন্দোলনে যেতে নিষেধ করছিলাম। সে বাসায় ছিল। আমাকে ডিম সেদ্ধ করতে বললো। কিন্তু আমি যেন বুঝতে না পারি সে বাইরে যাবে, এজন্য হয়তো এক ফাঁকে মোবাইল বাসায় রেখে এবং নাস্তা না খেয়েই বেরিয়ে যায়। দুপুরের পর থেকে বাড়ির সামনে রাস্তায় দলে দলে মানুষের আনন্দ-হৈ হুল্লোর টের পাই। আমার ছেলেটা মোবাইল ফোন বাসায় রেখে যাওয়ায় তার সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছিল না। আমি ভাবলাম, বন্ধুদের সঙ্গে সেও হয়তো আনন্দ-উল্লাসে মেতেছে। হয়তো কোথাও ঘোরাঘুরি করছে।'

জিহাদের ভগ্নীপতি তানভীর আহমেদ হিমু জানান, যাত্রাবাড়ী থানার কাছে গুলিবিদ্ধ জিহাদকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান শান্ত, নোমান, মনিরসহ তরুণ বয়সের কয়েকজন। তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়ায় ময়নাতদন্ত চাননি

তারা। জিহাদের মরদেহ হাসপাতাল থেকে তারা নিয়ে যান দনিয়া জামে মসজিদে। তখনো তার পরিচয় অজ্ঞাত। পরে জিহাদের মরদেহের ছবি তুলে রাত ১০টার দিকে এক ফেসবুক পেজে পোস্ট দেয়া হয়, কেউ চেনে কিনা। পরে একজন চিনতে পেরে কল দিয়ে জিহাদের পরিবারকে জানায় সেই পোস্টের ব্যাপারে।

বড় বোন রাজধানীর বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আফরিন বিনতে আলম মিম বলেন, 'আমার ভাইয়ের মন ছিল অনেক বড়। সমাজসেবা করতে চাইতো সে। জিহাদ ছিল সদাচারী এবং অত্যন্ত মেধাবী। কলেজে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ভর্তি হয়ে জিহাদ বলেছিল, ভবিষ্যতে সে চাকরি করবে না, ব্যবসা করবে। অনেক কর্মসংস্থান করবে। বন্ধুদের কাছে সে বলতো, আব্বুর বয়স হচ্ছে তাকে বেশিদিন চাকরি করতে দেবো না। শিগগিরই আমার কিছু করতে হবে।'

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার সুন্দলপুর ইউনিয়নে জিহাদ হাসানের গ্রামের বাড়ি। সেখানে দাদার কবরের পাশে শায়িত করা হয়েছে তাকে। জিহাদকে নিয়ে এখন গর্বিত পরিবারের সদস্যরা। তিন ভাই বোনের মধ্যে জিহাদ দ্বিতীয়। ছোট ভাই তাহমিম হাসান যাত্রাবাড়ী এলাকার বর্ণমালা আদর্শ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে।

জিহাদের বাবা মোহাম্মদ আলম জানান, কোটা সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে শুরু থেকেই জিহাদ সোচ্চার ছিল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মসূচিতে ছিল

তার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। মৃত্যুর ২ দিন আগে তার ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে জিহাদ লিখেছিলেন, “গন্তব্য একটাই। হয় দেশের কাফনের কাপড় শেষ হবে, অথবা মিষ্টির দোকান খালি হবে।”

মোহাম্মদ আলম বলেন, ‘আদর করে ছেলের নাম রেখেছিলাম জিহাদ। কে জানতো ছেলে আমার বিপ্লবী হবে, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রাণ দেবে! আন্দোলনে প্রাণ হারানো শিশু-কিশোরদের জন্য সবসময়ই দোয়া করেছি।

আমার সন্তানও চলে যাবে ভাবিনি। আমাদের সন্তানদের রক্তের বিনিময়ে এখন শুধু সুন্দর একটা দেশ চাই।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের পক্ষে শুরু থেকেই সোচ্চার ছিল রাজধানীর ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী জিহাদ হাসান (১৮)। কোটা সংস্কার আন্দোলন যখন শেখ হাসিনার পতনের দাবিতে একদফায় রূপ নেয় তখনও যাত্রাবাড়ী এলাকার চলছে টানা সংঘাত-সহিংসতা। আন্দোলনে আর মাত্র একদিন যাব জানিয়ে গত ৫ আগস্ট মার কাছ থেকে লুকিয়ে বাসা থেকে বের হয় জাহিদ। কারণ এর আগে গত ১৯ জুলাই আন্দোলনে গিয়ে সে ছররা গুলিতে আহত হওয়ায় মা কোহিনুর বেগম ছেলেকে হারানোর ভয়ে আন্দোলনে যেতে নিষেধ করেন। কোহিনুর বেগমের সেই শঙ্কাই সত্যি হলো, ঘরে ফিরে মাহিমের গুলিবিদ্ধ লাশ।

ঘটনার দিন সকালে ডিম সেদ্ধ করতে বলে মাকে না জানিয়েই লুকিয়ে মোবাইল বাসায় রেখে এবং নাস্তা না খেয়েই বাসা বেরিয়ে যায় জাহিদ। দুপুরের পর মানুষের বিজয় মিছিল আনন্দ-হৈ হুল্লোর শুরু হলে বাসা থেকে মনে করে সেও বন্ধুদের সঙ্গে সেও হয়তো আনন্দ-উল্লাসে মেতেছে ,কিন্তু মোবাইল ফোন বাসায় রেখে যাওয়ায় তার সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

এদিকে দুপুর আনুমানিক সাড়ে এগারটার দিকে ছাত্র-জনতা কারফিউ ভেঙ্গে শাহবাগের দিকে রওনা দিলে জালিম হাসিনার ঘাতক পুলিশ বাহিনী সরাসরি গুলিবর্ষণ শুরু করে এবং একটি বুলেট এসে কপালে বিদ্ধ হয় শহীদ জিহাদের। ঘটনা স্থলেই শাহাদাতের সুধা পান করেন জিহাদ।

তরুণ বিপ্লবী জিহাদের দুনিয়ার সফর শেষে ৬ আগস্ট ঢাকারগাঁও গ্রামের বাড়িতে দাদার কবরের পাশে দাফন করা হয়। এর আগে এখানেই শহীদের জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ই আগস্ট ছুটি বাতিল

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা

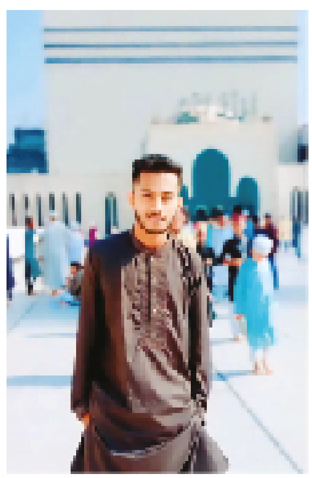

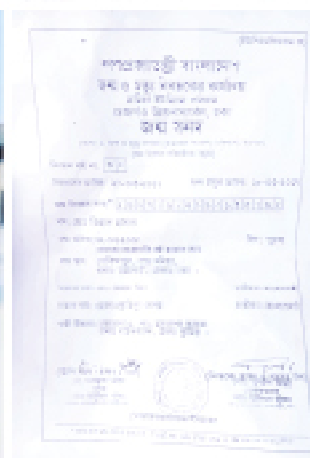

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

মৃত্যু সনদ

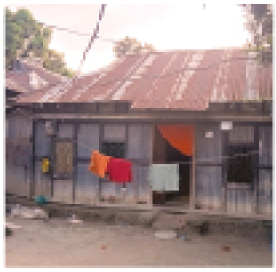

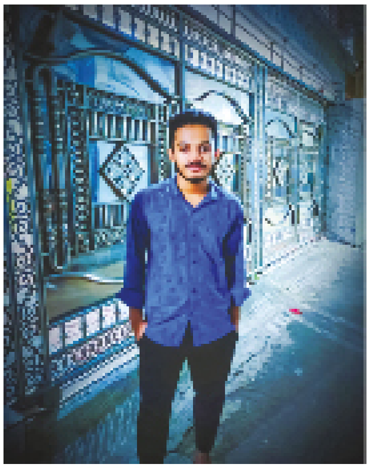

এক নজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মো: জিহাদ হাসান
জন্ম	: ১৪ জুলাই ২০০৭
জন্মস্থান	: যাত্রাবাড়ী , ঢাকা
পেশা	: ছাত্র, একাদশ শ্রেণি
পেশাগত প্রতিষ্ঠান	: রাজধানীর ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম- ঢাকারগাঁও, ইউনিয়ন- সুন্দলপুর, থানা- দাউদকান্দি, জেলা- কুমিল্লা
পিতার নাম	: মো: আলম মিয়া
মায়ের নাম	: মোসা: কহিনুর বেগম
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন
আন্দোলনে যোগদান	: ১৯ জুলাই ২০২৪
ঘটনার তারিখ ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, যত্রাবাড়ি
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট, বেলা সাড়ে ১১ টা
আক্রমণকারী/আঘাতকারী	: স্বৈরাচারি সরকারের ঘাতক পুলিশ বাহিনী
শহীদ হওয়ার তারিখ, সময়, স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, দুপুরে যাত্রাবাড়ী থানার পাশে
শহীদের জানাজা	: ৬ আগস্ট, নিজ গ্রাম
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: ঢাকারগাঁও গ্রামের বাড়িতে দাদার কবরের পাশে দাফন করা হয় শহীদ জাহিদকে
প্রস্তাবনা	: ১. ছোট ভাইয়ের লেখা-পড়ার খরচ যোগানে সহযোগীতা করা যেতে পারে
	: ২. শহীদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা
	: ৩. বোনের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা

শহীদ রিফাত হাসান

ক্রমিক : ৪৪৯

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০০৮

শহীদ পরিচিতি

২০০৯ সালের ১০ মে বাবা হানিফ মিয়া ও মা রিপা আক্তারের কোল আলোকিত করে জন্ম নেয় শহীদ রিফাত হোসেন। সে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার সুকিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও বেড়ে ওঠেন। তারা এক ভাই ও দুই বোন। রিফাতের জন্মের পরপরই বাসচালক বাবাকে হারান এ দুই ভাই-বোন। এরপর খুব কাছ থেকে জীবনের উত্থান-পতন দেখতে দেখতে নানাবাড়িতে বড় হন তাঁরা। একপর্যায়ে তাঁদের মায়ের অন্যত্র বিয়ে হয়। নতুন সংসারে চলে যান মা রিপা আক্তার, সেই ঘরে পাঁচ বছর বয়সী এক কন্যা সন্তানও রয়েছে। ফলে মাতুলালয়েই বড় হতে থাকেন এতিম দুই ভাই বোন। এত সংকটের মধ্যে স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন রিফাত। রিফাত একজন কুরআনের হাফেজ ছিলেন। তবে আর্থিক সংকটের কারণে সেটিও বন্ধ করে মুন্সিগঞ্জে কাজ শুরু করেন। গত জুলাই মাস পর্যন্ত সেখানে বেকারিতে কাজ করতেন। পরে কাজটি ছেড়ে বোন হাসিনার বাড়িতে থেকে ভগ্নিপতি সাইদুলের কাছে পাইপ সংযোগের কাজ শিখতেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

বড় বোন হালিমার ভাষ্যমতে, গত ৪ আগস্ট সকালে রিফাত কাজে না গিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় তাঁকে আন্দোলনে যেতে একাধিকবার নিষেধ করা হয়। রিফাতকে বলেছিলেন, 'তোর কিছু হলে আমি কী করে বাঁচব?' জবাবে রিফাত হাসিমুখে বলেছিলেন, 'আমার কিছুই হবে না ইনশা-আল্লাহ, দেশ স্বাধীন করে আবার ঘরে ফিরব।' ওই দিন দুপুরেই খবর আসে রিফাত গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের এক দফা দাবিতে গত ৪ আগস্ট কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার শহীদ নগরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মিছিলে শামিল ছিলেন রিফাত। আন্দোলনরত অবস্থায় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা জনতার উপর গুলি ছুড়লে সে কুমিল্লা শহীদ নগর এলাকায় ছাত্রলীগের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গৌরীপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে তারা রোগীকে রাখতে অস্বীকার করে। এছাড়া সরকারি কোন অ্যাম্বুলেন্স সহায়তায় এগিয়ে আসেনি। পরে তাকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও কোন চিকিৎসা না দিয়ে তাকে ঢাকা মেডিকেলে রেফার করা হয়। ঢাকা মেডিকেল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে হাসপাতালে রাখতে অস্বীকার করে এবং বলে রোগীর অবস্থা ভালো ও এখানে রোগীর অনেক চাপ। হাসপাতালে রাখলে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। ফলে তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়। সেখানে বিনা চিকিৎসায় ৪ আগস্ট রাতে নিজ বাড়িতে রিফাতের মৃত্যু হয়। পরদিন (৫ আগস্ট) সকাল ১০টায় উপজেলার দশপাড়া ঈদগাহ মাঠে জানাজার পর পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

রিফাতের হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন হালিমা। ক্ষোভ নিয়ে তিনি বলেন, 'কী দোষে আমার এমন সুন্দর ভাইকে এভাবে গুলি করে মারল? আমার একমাত্র ভাইকে গুলি করতে তাদের বুক কি একটুও কাঁপেনি? তারা কি মানুষ না? দেশ স্বাধীনতা পেল, অথচ আমার ভাই সেই স্বাধীনতা দেখে যেতে পারল না; আমার ভাই হত্যার বিচার চাই, প্রকৃত খুনিদের ফাঁসি চাই।'

রিফাতের রেখে যাওয়া পোশাক, বালিশ-কম্বল, মুঠোফোন এসব চিরদিন স্মৃতি হিসেবে রাখতে চান হালিমা। তার মুঠোফোনটিতে হাত বুলাতে বুলাতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলতে থাকেন, 'ভাইয়ের মুঠোফোনটি হাতে নিলে চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারি না। ছোট বেলায় দুই ভাই-বোনকে নানাবাড়িতে একা রেখে মা কাজে যেতেন। ভাই-বোন একসঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটাতাম, একসঙ্গে খেলাধুলা করতাম। এখন এসব কেবলই স্মৃতি।'

শহীদের পরিবারের বর্তমান অবস্থা

শহীদ রিফাত তার বোনের আশ্রয় থাকতেন। তার ভগ্নিপতির সাথে পাইপ ফিটিং এর কাজ করে বোনের পরিবারে সাহায্য করতেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

শহীদ রিফাত সম্পর্কে তার প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয় বলেন, রিফাত অনেক ভালো ছেলে ছিল। সে নিয়মিত নামাজ আদায় করত। এছাড়া রিফাত একজন কুরআনের হাফেজ এবং কুরআনের ১৭ পারা তার মুখস্থ ছিল। এরপর সে আর পড়াশোনা করতে পারেনি।

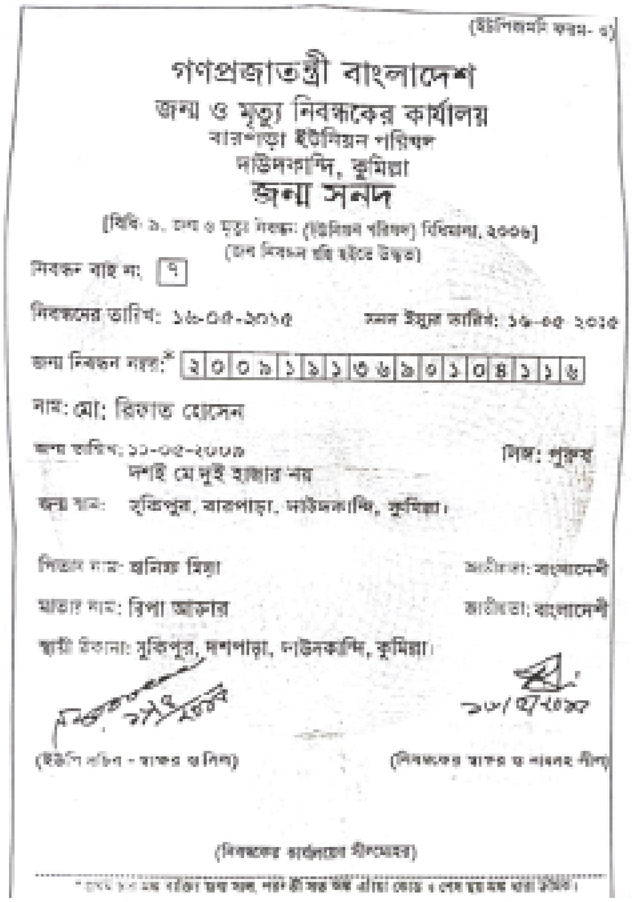

(ইউনিয়ন পরিষদ ফরম- ৫)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
বারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
দাউদকান্দি, কুমিল্লা
জন্ম সনদ
[বিধি ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং: ৭

নিবন্ধনের তারিখ: ১৬-০৫-২০১৫ সনদ ইস্যুর তারিখ: ১৬-০৫-২০১৫

জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ২০০৯১৯১৩৬৯০১০৪১১৬

নাম: মো: রিফাত হোসেন

জন্ম তারিখ: ১০-০৫-২০০৯ লিঙ্গ: পুরুষ
দশই মে দুই হাজার নয়

জন্ম স্থান: সুকিপুর, বারপাড়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

পিতার নাম: হানিফ মিয়া জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: রিপা আক্তার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: সুকিপুর, দশপাড়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

(ইউপি সচিব - স্বাক্ষর ও সিল) (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও সাধারণ সীল)

(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

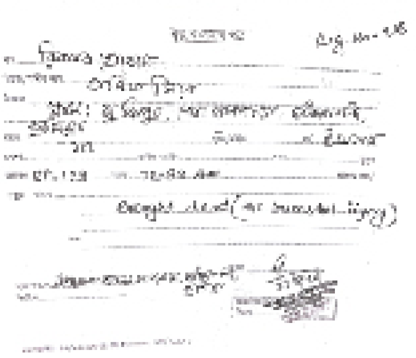

এক নজরে শহীদ রিফাত হোসেন

নাম	: রিফাত হোসেন
পেশা	: পাইপ ফিটিং কর্মচারী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১০ মে ২০০৯ (১৫ বছর)
স্থায়ী ঠিকানা	: সুকিপুর, দশপাড়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা
পিতার নাম	: মরহুম হানিফ মিয়া
মাতার নাম	: রিপা আক্তার
আহত হওয়ার তারিখ	: ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১টা, কুমিল্লা
নিহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, রাত ১২টা ৩৫ মিনিট ; নিজ বাসা
আঘাতের ধরণ	: বুকের বাম পাশে গুলি
আক্রমণকারী	: ছাত্রলীগ
শাহাদাত বরণের স্থান	: কুমিল্লা
দাফন করা হয়	: কুমিল্লা
ভাইবোনের বিবরণ	: তার কোন ভাই নেই। দুই বোনের এক বোন বিবাহিত। আরেকবোন এখনো ছোট
প্রস্তাবনা	১. বোনের পরিবারকে এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে
	২. মা ও তার ছোট বোনকে এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে

শহীদ মো: সাগর

ক্রমিক : ৪৫০

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০০৯

শহীদ পরিচিতি

মো: সাগর, কুমিল্লার দেবিদার গ্রামের ১০ মার্চ ২০০৩ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র এবং তার সৎ চরিত্র ও সমাজসেবা করার মনোভাবের জন্য পরিচিত। সাগর সবসময় তার সহপাঠী এবং এলাকার মানুষদের সাহায্য করতেন। তার সহজ সরল ব্যবহার এবং সদাচরণে এলাকাবাসীর কাছে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। সাগরের মৃত্যু শুধুমাত্র তার পরিবার নয়, পুরো সমাজের জন্য একটি গভীর শোকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোরবানির ঈদে শেষ বারের মতো বাড়ি গিয়েছিলেন। তার পিতা মো: হানিফ মোল্লার বয়স ৫১ এবং মাতা বিউটি আক্তারের বয়স ৩৯ বছর।

পারিবারিক জীবন

সাগরের পরিবারে তার বাবা মো: হানিফ মোল্লা, মা বিউটি আখতার, এবং দুই বোন বৃষ্টি (২২) ও আফরোজা আবন্তিকা মিম (১৪) রয়েছেন। সাগরের মা, বিউটি আখতার, তার মৃত্যু পর গভীর শোক ও কষ্টে ভুগছেন। তিনি বলেন, "আমার ছেলে ছিল আমাদের জীবনের আলো। তার মৃত্যু আমাদের পরিবারে এক গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে। সাগরের অনুপস্থিতি আমাদের জীবনকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছে।" বাবা মো: হানিফ মোল্লা

কিডনি রোগে ভুগছেন এবং তার মৃত্যু পরিবারের জন্য একটি বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, "সাগর ছিল আমাদের একমাত্র পাথেয়। তার মৃত্যুর পর আমাদের জীবনে সবকিছু কঠিন হয়ে পড়েছে। তার অনুপস্থিতি আমাদের মানসিক ও আর্থিকভাবে চরমভাবে প্রভাবিত করেছে।

প্রেক্ষাপট

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতি, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার আগ্নেয়গিরি। তাই ২০২৪ সালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয় । আন্দোলনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, RAB সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

যেভাবে শহীদ হলেন

১৯ জুলাই ২০২৪ তারিখ, মিরপুর ১০ এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের সময় একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। সাগর, যিনি ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছিলেন, স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকারের লেলিয়ে দেয়া ঘাতক পুলিশের সহিংসতার শিকার হন। আন্দোলন শুরু হলে পুলিশ তীব্রভাবে জলকামান, কাঁদানে গ্যাস এবং গুলি ব্যবহার করে, যা পরিস্থিতি দ্রুত উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে।

সেদিন ছাত্ররা শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু করে। সাগর তার বাসা থেকে বের হয়ে আন্দোলনে যোগ দেন। বিক্ষোভকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন শুরু করলেও পরিস্থিতি দ্রুত উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঘাতক পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহার করে। জলকামান, কাঁদানে গ্যাস এবং গুলি ছোড়ে, যা ছাত্রদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। পুলিশি হামলার ফলে আন্দোলনকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, এবং পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজন আহত হন।

সাগর মাথায় এবং বাহুতে গুলিবিদ্ধ হন। আহত অবস্থায় তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সাগরের লাশ পরবর্তীতে আলোক হাসপাতালে পাওয়া যায়। তার মৃত্যু ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং দুঃখজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়।

এই ঘটনাটি শুধু সাগর বা তার পরিবারের জন্যই নয়, পুরো মিরপুর এলাকার জন্য একটি গভীর শোকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাগরের মৃত্যু সমাজে বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বার্তা

দেয় এবং ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে উঠে। কলঙ্কিত পুলিশের সহিংসতা ও ছাত্রদের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সেদিনের ঘটনা এক নতুন সামাজিক সচেতনতার সূচনা করে, যা ভবিষ্যতে আরও অনেক আন্দোলনের প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

অমায়িক সাগর

মো: সাগর একজন অত্যন্ত অমায়িক এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তি ছিলেন। তার মৃত্যু কেবল তার পরিবার নয়, পুরো সমাজের জন্য একটি গভীর শোকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাগরের চরিত্রের সৌন্দর্য এবং তার সমাজসেবার মনোভাব তাকে এলাকার মানুষের কাছে একটি আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার মৃত্যু পিশাচ পুলিশের সহিংসতার বিরুদ্ধে একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে ওঠে।

প্রেরণায় শহীদ সাগর

সাগরের সাহস এবং আত্মত্যাগ ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। তার মৃত্যু শুধু তার পরিবারের জন্যই নয়, পুরো ছাত্র সমাজের জন্য একটি শক্তিশালী প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। সাগরের সাহসিকতা এবং ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করার মনোভাব ভবিষ্যতের আন্দোলনকারীদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। তার আত্মত্যাগ ছাত্র আন্দোলনের শক্তি এবং ন্যায়ের জন্য সংগ্রামের একটি মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়।

নিকটাত্মীয় ও স্বজনদের বক্তব্য

মা, বিউটি আখতার : "আমার ছেলে ছিল আমাদের জীবনের আলো। তার মৃত্যু আমাদের পরিবারে এক গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে। সাগর আমাদের স্বপ্ন পূরণের আশা ছিল। তার অনুপস্থিতি আমাদের জীবনকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছে। তার মৃত্যু আমাদেরকে শুধু শোকই নয়, এক কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন করেছে।"

বাবা, মো: হানিফ মোল্লা : "সাগর ছিল আমাদের একমাত্র পাথেয়। আমি দীর্ঘদিন কিডনি রোগে ভুগছি এবং তার মৃত্যুর পর আমাদের জীবনে সবকিছু কঠিন হয়ে পড়েছে। তার চলে যাওয়ার পর আমাদের অর্থনৈতিক এবং মানসিক অবস্থা আরও ভেঙে পড়েছে। প্রতিবেশী,শহিদুল ইসলাম : "সাগর একজন অত্যন্ত সুদর্শন এবং অমায়িক ছেলে ছিল। সে সবসময় এলাকার মানুষের সাহায্য করতো এবং সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখে থাকতো। তার মৃত্যুর পর আমরা সবাই গভীরভাবে শোকাহত। তার অভাব আমাদের সবার খুবই অনুভব হচ্ছে।"

বন্ধু, আনসার সাদিক: সাগরের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের স্মৃতিগুলি অত্যন্ত মধুর। সে সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং সাহায্যকারী ছিল। তার মৃত্যু আমাদের সবার জন্য একটি বড় ক্ষতি। আমরা তার সাহসিকতা ও বন্ধুত্ব কখনোই ভুলবো না।

শহীদ পরিবারের আর্থিক অবস্থা

সাগরের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ। তার বাবা মো: হানিফ মোল্লা একজন সামান্য সবজি বিক্রেতা এবং দীর্ঘদিন ধরে কিডনি রোগে ভুগছেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য তিনি দিনমজুরি এবং কিছু খুচরা ব্যবসা করে থাকেন, তবে তা যথেষ্ট নয়। তাদের গ্রামের বাড়িতে সামান্য জমি থাকলেও ঢাকায় এসে তাদের জীবনযাত্রা সীমিত আয়ের কারণে কঠিন হয়ে পড়েছে। সাগরের মৃত্যু পরিবারের ওপর আরও একটি বড় অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছে যা তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে।

এক নজরে শহীদ মো: সাগর

নাম	: মো: সাগর
পেশা	: সবজি বিক্রেতা
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১০/০৩/২০০৩
আহত ও শহিদ হওয়ার তারিখ	: ১৯/০৭/২০২৪
শাহাদাত বরনের স্থান	: মিরপুর ১০
দাফন করা হয়	: বাড়াশালঘর ইউনিয়ন
স্থানীয় ঠিকানা	: মিরপুর ১০
পিতা	: মো: হানিফ মোল্লা
মাতা	: বিউটি আখতার
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে এ অল্প জমি আছে
ভাই বোন এর বিবরন	: ২ বোন
প্রস্তাবনা	প্রস্তাবনা-১: বাসস্থান প্রয়োজন প্রস্তাবনা-২: বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে প্রস্তাবনা-৩: ছোট ভাই-বোনদের লেখা-পড়ার খরচ যোগানে সহযোগিতা করা যেতে পারে

"শিশু শহীদ হোসাইন
রাষ্ট্রীয় নির্মমতার বলি"

শহীদ মোহাম্মদ হোসাইন
ক্রমিক : ৪৫১
আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০১০

শহীদ পরিচিতি

কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার বেতআ গ্রামের বাসিন্দা মো: হোসাইন, মাত্র ৯ বছর বয়সে ঝরে পড়া ফুল। ২০২৪ সালের ২০ জুলাই, ঢাকার চিটাগং রোডে সংঘটিত বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হয় সে।

২০১৫ সালের মার্চের ১৫ তারিখ ভোরবেলা মা মালেকা বেগমের কোল আলোকিত করে জন্ম নেয় হোসাইন। বেড়ে উঠে ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানার চিটাগং রোড এলাকায়। পড়াশোনা করছিল আল হেরা ইন্টার হাই স্কুলে ৩য় শ্রেনিতে। দুই বোন ও এক ভাইয়ের মাঝে সে সবার বড়। পড়াশনায় খুবই মেধাবি ছিলো সে। অবসরে বাবাকে আচার বিক্রিতে সাহায্য করতো।

হোসাইন একটি সাধারণ পরিবারের সন্তান ছিল। তার বাবা মো: মানিক মিয়া ও মা মালেকা বেগম ও দুই বোনের সঙ্গে অভাবগ্রস্ত পরিবারে সংগ্রাম করে আসছিল। নিজস্ব ঘরবাড়ি না থাকায় তারা নানুর বাড়ির পাশে থাকত।

একটি শিশু হিসেবে হোসাইনের স্বপ্ন ছিল হয়তো খেলাধুলা, বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো, পড়াশোনা করে ভালো মানুষ হওয়া। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তার স্বপ্ন অসম্পূর্ণ থেকেই যায়। তার এই করুন মৃত্যু একটি সরকার ও সমাজ ব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রমাণ।

হোসাইনের আত্মা শান্তিলাভ করুক এই কামনা করি। আর এই ঘটনা যেন আমাদের সকলকে আরো সচেতন করে তোলে।

যেভাবে শহীদ হলেন

২০ জুলাই দুপুরে ভাত খেয়ে বের হয় খেলাধুলা করতে। পাশেই একটা ভবনে আগুন লেগেছে দেখে ছুটে যায় দেখার জন্য। এর আগেরদিন ১৯ জুলাই সারা দেশব্যাপী নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছে সরকারি বাহিনী ও আওয়ামী-ছাত্রলীগের গুন্ডারা। সারাদেশে হতাহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে শতাধিক। দেশব্যাপী চলছে ডিজিটাল ক্র্যাক ডাউন, কারফিউ সহ সেনাবাহিনী ও বিজিবির টহল। মন্ত্রী-এম পিরা আন্দোলনে নিহতদের নিয়ে করছে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য। তথ্যমন্ত্রী এ. আর. আরাফাতের ভাষায়, আন্দোলনকারীরা মাদকাসক্ত "They are Drugged"। ওবায়দুল কাদের তার স্বভাবসুলভ ভাড়ামিতে ব্যস্ত। দেশব্যাপী থমথমে অবস্থা বিরাজমান।

এদিকে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামার পরেও ছেলে বাড়ি ফিরছে না দেখে খোঁজ শুরু করে তার মা। খোঁজাখোঁজির এক পর্যায়ে এক পথচারীর মোবাইলে দেখানো ছবিতে তার সন্ধান মেলে হোসাইনের। পরে ঢামেকের মর্গে গিয়ে দেখতে পান তার ছেলের দেহটা পড়ে আছে। নিথর, প্রাণহীন। ছোট্ট হোসাইনের পেট ছিদ্র করে দিয়েছে দুটি বুলেট। সন্ত্রাসী ঘাতক পুলিশের নির্মমতা থেকে রেহায় পায়নি ০৯ বছর বয়সী শিশু হোসাইন। থেমে গেছে তার স্বপ্ন। বাবা মার আশা। বোনের ভালোবাসা। ক্ষমতার লালসার বলি হতে হলো তার স্বপ্নগুলোকে। ঝরে গেলো কচি প্রাণ। জান্নাতে সবুজ পাখি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে শিশু শহীদ মোহাম্মদ হোসাইন।

কেমন আছে তার পরিবার

শিশু শহীদ মো: হোসাইনের বাবা মানিক মিয়া পেশায় একজন হকার। আচার বিক্রি করে পরিবার চালান। শহীদ হোসাইন পড়াশোনার পাশাপাশি বাবাকে হেল্প করতো। অল্প আয় হয় তার । সে আয় থেকে পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখাও করাতেন। অভাবের সংসার। নিজেদের সব শখ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে সন্তানদের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করতেন তিনি। তাদেরই আদরের সন্তান মাত্র ক্লাস থ্রি পড়ুয়া মো: হোসাইনের জীবনের প্রদীপ নিভে যায় পুলিশের ঘাতক বুলেটের আঘাতে।

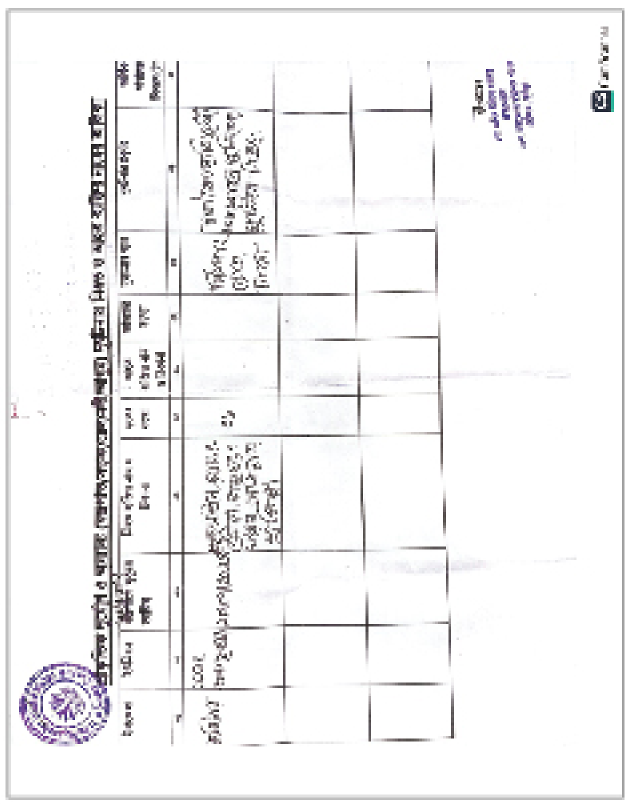

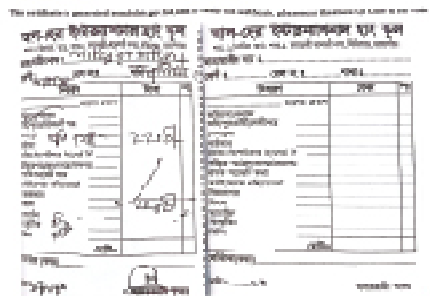

এক নজরে শিশু শহীদ হোসাইন

নাম	: মো: হোসাইন
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৫ মার্চ ২০১৫, ০৯ বছর
পিতা	: মো: মানিক মিয়া
মাতা	: মালেকা বেগম
ভাই বোন	: ২ জন
	: ১. শাহিনুর (০৫ বছর)
	: ২. মাহিনুর (০৮ বছর)
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২০ জুলাই ২০২৪, শনিবার, আনুমানিক সন্ধ্যা ০৮ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: চিটাগং রোড, ঢাকা
দাফন করা হয়	: নানুর বাড়ির পাশে (নিজস্ব বাড়ি না থাকায়)
কবরের জিপিএস লোকেশন	: ২৩ক৩২'০৬.৮"ঘ ৯০ক৫৬'৪৩.০"ভ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বেতভা, থানা/উপজেলা: দেবিদ্বার , জেলা: কুমিল্লা
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: ঘরবাড়ি নেই
ভাইবোনের বিবরণ	: এক ভাই ও দুই বোন আছে
প্রস্তাবনা	১. শহীদের পিতাকে ব্যবসার জন্য পুঁজি দেওয়া যেতে পারে
	২. ছোট দুই বোনের পড়াশোনার খরচ বহন করা যেতে পারে
	৩. বাসস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন

শহীদ মহিন উদ্দীন

ক্রমিক: ৪৫২
আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০১১

শহীদের পরিচয়

২০০৮ সালের জানুয়ারির ১ তারিখে কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার গুনাইঘর দক্ষিণের শাকতলায় জন্মগ্রহণ করেন শহিদ মহিনউদ্দিন। মকতব পর্যন্ত পড়ে আর বেশিদূর পড়তে পারেননি পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে। বাবার সাথে ফুটপাতে ঝালমুড়ি বিক্রি করতেন তিনি।

পটভূমি

২০১৮ সালে কোটা সংস্কারের জন্য চাকরি প্রত্যাশী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতৃত্বে ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভ এবং মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের লাগাতার আন্দোলনের ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে ৪৬ বছর ধরে চলা কোটাব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করে সরকার। ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরির কোটাব্যবস্থা বাতিল করে বাংলাদেশ সরকার একটি পরিপত্র জারি করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা ওই পরিপত্রে বলা হয়:

"সরকার সকল সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকুরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৭/০৩/১৯৯৭ তারিখের সম(বিধি-১) এস-৮/৯৫(অংশ-২)-৫৬(৫০০) নং স্মারকে উল্লিখিত কোটা পদ্ধতি নিম্নরূপভাবে সংশোধন করিল:-

(ক) ৯ম গ্রেড (পূর্বতন ১ম শ্রেণি) এবং ১০ম-১৩তম গ্রেডের (পূর্বতন ২য় শ্রেণি) পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হইবে; এবং

(খ) ৯ম গ্রেড (পূর্বতন ১ম শ্রেণি) এবং ১০ম-১৩তম গ্রেডের (পূর্বতন ২য় শ্রেণি) পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোটা পদ্ধতি বাতিল করা হইল।"

উক্ত পরিপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০২১ সালে অহিদুল ইসলামসহ সাতজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হাই কোর্টে রিট আবেদন করেন। ২০২৪ সালের ৫ জুন বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই পরিপত্র বাতিল করে রায় দেন। রায় প্রকাশিত হওয়ার পর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কারের দাবিতে একত্রিত হন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা বাংলা ব্লকেড নামে অবরোধ কর্মসূচি পালন শুরু করেন। আন্দোলন চলাকালীন সময়েই ১০ জুলাই মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল করে হাইকোর্টের দেয়া রায়ে আপিল বিভাগ চার সপ্তাহের জন্য স্থিতাবস্থা জারি করে। আদালতের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলনের সাথে আদালতের কোনো সম্পর্ক নেই দাবি করে শিক্ষার্থীরা বলেছেন, তারা সরকারের কাছে কোটা সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান চাইছেন।

ঘটনাপ্রবাহ

৫ জুন - ৯ জুলাই

৫ জুন হাইকোর্ট ২০১৮ সালে সরকারের কোটা বাতিলের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয়। ৬ জুন আদালতের রায়ের প্রতিবাদে ও কোটা বাতিলের দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীরা বিক্ষোভ করে। ৯ জুন হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষ আবেদন করে। ১০ জুন আন্দোলনকারীরা দাবি মেনে সরকারকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয় ও ঈদুল আযহার কারণে আন্দোলনে বিরতি ঘোষণা করে। ৩০ জুন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে মানববন্ধন করে। ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে ও তিনদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। এদিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিনারের সামনে অবস্থান নেয়। ২ থেকে ৬ জুলাই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ, মানববন্ধন, মহাসড়ক অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে। ৭ জুলাই শিক্ষার্থীরা 'বাংলা ব্লকেড'-এর ডাক দেয় যার আওতায় শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ সমাবেশ, মিছিল, মহাসড়ক অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে। ৮ ও ৯ জুলাই একই রকম কর্মসূচি পালন করা হয়।

বাংলা ব্লকেড ও শিক্ষার্থীদের উপর হামলা

১০ - ১৫ জুলাই

১০ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে জড়ো হয়ে শাহবাগে গিয়ে স্থানটি অবরোধ করে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা শিক্ষার্থীদের সামনে ব্যারিকেড দিয়ে অবস্থান করে। দুপুরে জানা যায় কোটাব্যবস্থা বাতিল করে হাইকোর্টের দেয়া রায়ে চার সপ্তাহ স্থিতাবস্থা দেওয়া হয়েছে।

১১ জুলাই ৩টা থেকে শাহবাগ অবরোধের কথা থাকলেও বৃষ্টির ফলে শিক্ষার্থীরা শাহবাগে যাওয়ার পথে পুলিশের বাধাকে অতিক্রম করে ৪:৩০ টায় শুরু করে। ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা পুলিশি বাধার ফলে পিছিয়ে যায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে শাহবাগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যোগ দেয়। চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল নিয়ে ২নং গেইট ও টাইগারপাস এলাকায় অবস্থান নেয় তখন অনেক শিক্ষার্থী পুলিশের হামলার শিকার হয়। ঐ দিন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশ হামলা করে। রাত ৯টায় শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শেষ করে তাদের উপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ১২ জুলাইয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ঘোষণা দেয়।

১২ জুলাই ৫টায় শিক্ষার্থীরা প্রশাসনের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে শাহবাগে জড়ো হয়ে অবরোধ করে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করতে থাকলে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের একদল কর্মী আক্রমণ করে। বিকেল ৫টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেশন বাজারসংলগ্ন ঢাকা-রাজশাহী রেললাইন অবরোধে সারা দেশের সঙ্গে রাজশাহীর রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১৩ জুলাই রাজশাহীতে রেলপথ অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে। ঢাকায় ঢাবির শিক্ষার্থীরা সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলন করেন, তারা অভিযোগ করেন "মামলা দিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বাধার চেষ্টা করা হচ্ছে।"

১৪ জুলাই আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ঢাকায় গণপদযাত্রা করে রাষ্ট্রপতি মো: সাহাবুদ্দিন বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে। কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্যের প্রতিবাদে মধ্যরাতে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এলাকায় বিক্ষোভ করে। সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ৪জি নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দিতে অপারেটরদের নির্দেশনা দেয়। সে দিন রাত সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাটা পাহাড় সড়কে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভে হামলা চালায় ঘাতক ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা । এতে এক নারী শিক্ষার্থীসহ দুজন আহত হয়েছেন। এর আগে ক্যাম্পাসের জিরো পয়েন্ট বিক্ষোভ শুরু করেন কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।

১৫ জুলাই কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হল, সূর্যসেন হল ও ক্যাম্পাসের বেশ কয়েকটি জায়গায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এতে শতাধিক ছাত্রের আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। ১৫ জুলাই বিকেলে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচির কারণে ক্যাম্পাসে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কুখ্যাত নেতাকর্মীদের হাতে রড, লাঠি, হকি স্টিকসহ বিভিন্ন অস্ত্র দেখা যায়। বিকেল সাড়ে পাঁচটার পরও শহীদুল্লাহ হলের সামনে থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের এলাকায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা, মারধর ও সংঘর্ষের ঘটনায় আহত অন্তত ২৯৭ জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে ১৫ জুলাই সোমবার রাত ১০টার পর থেকে শিক্ষার্থীদের মুঠোফোন তল্লাশি করে মারধর করা হয়।

দুপুর ২:৩০ টায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক রাফিকে কে শাটল থেকে অপহরণ করে প্রক্টর অফিসে নিয়ে আটকিয়ে রাখে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। তখন আন্দোলনকর্মীদের একটি অংশ রাফিকে উদ্ধার করতে মিছিল নিয়ে প্রক্টর অফিসে যাওয়ার সময় শহীদ মিনারের সামনে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করে। এতে কয়েকজন শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়।

১৬ জুলাই

১৬ জুলাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীরা খুনি ছাত্রলীগের হামলার ভয়ে উপাচার্যের বাসভবনের ভেতরে আশ্রয় নেন। রাত সোয়া ২টার দিকে কলঙ্কিত ছাত্রলীগের কুখ্যাত নেতাকর্মীরা সেখানে ঢুকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মারধর করে। এর আগে রাত ১২টার পর আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা হয়। এছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইয়ে আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থী ও ক্যাম্পাসের ত্রাস ছাত্রলীগের বেজন্মা কর্মীদের সাথে বেশ সংঘর্ষ হয়। রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা ভাটারা এলাকায় প্রগতি সরণী ও কুড়িল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। সকাল ১১ টায় টাঙ্গাইল পৌরসভার সামনে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মিছিল শহিদ মিনারের কাছে পৌঁছালে লাঠি ও লোহার রড নিয়ে তাদের ওপর হামলা করে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। দুপুর ১টায় মিরপুর ১০-এ রাস্তা বন্ধ করে বিক্ষোভরত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজিসহ মিরপুরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের লাঠিসোঁটা নিয়ে যুবলীগ, শ্রমিক লীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের একটি বিরাট দলসহ নেতা-কর্মীরা এসে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ওপর হামলা করে। দুপুর আড়াইটা থেকে তিনটার দিকে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে পুলিশের সহিংসতার ঘটনা ঘটে। হাসপাতালটির পরিচালক ডা: মো: ইউনুস আলী জানান, "এক শিক্ষার্থীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। এ ছাড়া আহত অবস্থায় আরও ১৫ জন হাসপাতালে এসেছেন।" বিকেল ৪টার দিকে চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে একজন চট্টগ্রাম কলেজের শিক্ষার্থী ও আরেকজন পথচারী। বিকেলে রাজধানীর ঢাকা কলেজের সামনে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষের মধ্যে এক যুবক নিহত হন। পুলিশের নিউমার্কেট অঞ্চলের জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার মো: রিফাতুল ইসলাম বলেন, "বিকেলে ঢাকা কলেজের সামনের রাস্তায় একদল লোককে এক ব্যক্তিকে পেটাতে দেখেছেন তারা। পরে শুনেছেন, তিনি ঢাকা মেডিকেলে মারা গেছেন।" সংঘাত ছড়িয়ে পড়ায় এইদিন সন্ধ্যায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া ও রাজশাহী শহরে বিজিবি মোতায়েন করা হয়। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ফেসবুক ব্যবহার করতে সমস্যা হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

১৭ জুলাই

১৭ জুলাই ইউজিসি সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা দেয় এবং নিরাপত্তার স্বার্থে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়তে বলা হয়। এদিন গ্রামীণফোন কোম্পানিসহ সকল মোবাইল কোম্পানীকে সরকার সকল ধরনের ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়।

সর্বাত্মক অবরোধ

১৮ -১৯ জুলাই

১৮ জুলাই সকালে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায় যে, কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের ঘোষিত কমপ্লিট শাটডাউনকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঢাকাসহ সারাদেশে ২২৯ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। সকাল ১১টার দিকে মিরপুর ১০-এ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজিসহ মিরপুরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপর আক্রমণ করে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মী এবং পুলিশ। আন্দোলনকারীদের ওপর সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করা হয়। এতে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সকাল ১১টার দিকে সকাল থেকে আন্দোলনরত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা রামপুরা ব্রিজ থেকে মেরুল বাড্ডা এলাকায় সড়ক অবরোধ করায় তাদের ছত্রভঙ্গ করেতে কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোঁড়ে পুলিশ। একই সাথে তাদেরকে আক্রমণ করে ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগ কর্মীরা। দুপুর ১২টার দিকে সকাল থেকে আন্দোলনরত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস ও স্থানীয় অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপর আক্রমণ করে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মী এবং পুলিশ। আন্দোলনকারীদের ওপর সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করা হয়। এতে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। দুপুর ২টার দিকে পুলিশের গুলিতে নর্দান ইউনিভার্সিটির ২ শিক্ষার্থী নিহত ও শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়। আহত শিক্ষার্থীদের হাসপাতালে নেয়া হয়। দুপুর ৩টার দিকে পুলিশের ধাওয়ায় মধ্যে পড়ে মাদারীপুর সরকারি কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়। এছাড়াও রামপুরায় পুলিশের সাথে বেসরকারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনায় এক গাড়ি চালক পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এদিন সরকারের নির্দেশে ৪জি মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করে ইন্টারনেটের গতি কমিয়ে দেওয়া হয়। রাত ৯টার দিকে সরকার সারাদেশে সব ধরনের ইন্টারনেট সেবা বিচ্ছিন্ন করে দেয় সরকার।

১৯ জুলাই শিক্ষার্থীদের আন্দোলন রোধ করতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ঢাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সব ধরনের সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ঢাকার সাথে সারাদেশের ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। মধ্যরাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে আটক করা হয়। এছাড়া গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকেও আটক করা হয়। যেসময়ে নাহিদ ইসলামকে আটক করা তার কাছাকাছি সময়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিনজন প্রতিনিধির সাথে সরকারের তিনজন প্রতিনিধির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যেখানে তারা সরকারের কাছে 'আট দফা দাবি' জানান। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্র অনুযায়ী ১৯ জুলাই শুক্রবার সারাদেশে কমপক্ষে ৫৬-৬৬ জনের মৃত্যু হয়।

সংলাপ ও সুপ্রিম কোর্টের রায়

২০ - ২২ জুলাই

২০ জুলাই তৃতীয় দিনের মতো সারা বাংলাদেশ ইন্টারনেটবিহীন ছিল। সেনাবাহিনীকে দেশের বিভিন্ন অংশে কারফিউর অংশ হিসেবে টহল দিতে দেখা যায়। ১৯ জুলাই শুক্রবার মধ্যরাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন প্রতিনিধির সাথে সরকারের তিনজন মন্ত্রীর যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেই বৈঠক ও বৈঠকে উত্থাপিত দাবি নিয়ে নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। কারফিউর মধ্যেই যাত্রাবাড়ী, রামপুরা-বনশ্রী, বাড্ডা, মিরপুর, আজিমপুর, মানিকনগরসহ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ টিয়ারশেল, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এইসব সংঘর্ষে দুইজন পুলিশসহ অন্তত ১০ জন নিহত হন, অন্তত ৯১ জন আহত হন। কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাহিদ ইসলামকে মধ্যরাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তুলে নিয়ে যায়।

২১ জুলাই চতুর্থ দিনের মতো সারা বাংলাদেশ ইন্টারনেট বিহীন ছিল ও সারাদেশে কারফিউ বলবৎ ছিল। ভোরে ঢাকার পূর্বাচল এলাকায় আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে পাওয়া যায় ও পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। ১৬ জুলাই রাষ্ট্রপক্ষের করা লিভ টু আপিলের প্রেক্ষিতে সকাল ১০টার দিকে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে কোটা নিয়ে আপিল বিভাগের শুনানি শুরু হয়। সব পক্ষের শুনানি শেষে দুপুর ১টার দিকে রায় ঘোষণা করা হয়। রায়ে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিল করা হয় ও সরকারি চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। এদিন ঢাকায় বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে র‍্যাব, পুলিশ ও বিজিবি ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায়। যাত্রাবাড়ীতে সারাদিন ধরে আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় সহিংসতায় পাঁচজন নিহত হয়। সেতু ভবন ভাঙচুর, রামপুরার বিটিভির ভবনে আগুন দেয়া ও বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ভিন্ন ভিন্ন মামলায় পুলিশ বিএনপি নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, নিপুণ রায় ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা নুরুল হক নুরকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটি পক্ষ '৯ দফা' দাবি জানিয়ে শাটডাউন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়।

২২ জুলাই পঞ্চম দিনের মতো সারা বাংলাদেশ ইন্টারনেট বিহীন ছিল ও তৃতীয় দিনের মতো সারাদেশে কারফিউ বলবৎ ছিল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম

চার দফা দাবি জানিয়ে ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটাম দিয়ে 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি স্থগিত করেন।

আন্দোলন স্থগিত ও গণগ্রেফতার

২৩ - ২৮ জুলাই

২৩ জুলাই ষষ্ঠ দিনের মতো সারা বাংলাদেশ ইন্টারনেট বিহীন ছিল। তবে রাতের দিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে সীমিত আকারে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট চালু করা হয়। এছাড়া চতুর্থ দিনের মতো সারাদেশে কারফিউ বলবৎ ছিল। ২১ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের পর ২৩ জুলাই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কোটা সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে।

২৪ জুলাই সীমিত পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট চালু হলেও মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ থাকে। পঞ্চম দিনের মতো সারাদেশে কারফিউ বলবৎ ছিল, তবে তা শিথিল পর্যায়ে ছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের মৃত্যু হয় ও নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৯৭ হয়। শিক্ষার্থীদের মতে নিহতের সংখ্যা আরও অনেকগুণ বেশি যা ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় জানা যায় নি। ২৪ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন মামলায় পুলিশ ১,৭৫৮ জনকে গ্রেফতার করে। বিক্ষোভের সময় সেনা মোতায়েন পর জাতিসংঘের লোগো সংবলিত যান ব্যবহৃত হলে জাতিসংঘ এই নিয়ে উদ্বেগ জানায়। ১৯ জুলাই থেকে নিখোঁজ থাকার পর ২৪ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ, আবু বাকের মজুমদার ও রিফাত রশীদের খোঁজ পাওয়া যায়। ২৪ জুলাই রাত পর্যন্ত আরও ৪ জনসহ মোট ২০১ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

২৫ জুলাই বিকেল পর্যন্ত ব্রডব্যান্ডে ধীরগতির ইন্টারনেট পাওয়া যায়। সরকার ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ রাখে, এদিন আন্দোলনকারীদের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আটটি বার্তা দেওয়া হয়।

২৬ জুলাই নাহিদ ইসলামসহ কোটা সংস্কার আন্দোলনের তিন সমন্বয়ককে রাজধানীর গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল থেকে তুলে নিয়ে যায় সাদাপোশাকের এক দল ব্যক্তি। তারা নিজেদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়েছেন বলে সেখানে উপস্থিত এক সমন্বয়কের স্বজন ও হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানান।

২৭ জুলাই তিন সমন্বয়ককে ঢাকার গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। নিরাপত্তা নিয়ে কোনো শঙ্কা থাকলে তাদের পরিবারের কাছে না দিয়ে ডিবি হেফাজতে নেওয়া হলো কেন, সেই প্রশ্ন তুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি দল। তিন শিক্ষার্থীর খোঁজখবর নিতে ডিবি প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যান এই শিক্ষকেরা। যদিও শিক্ষকদের সাথে দেখা করতে ডিবিপ্রধান অস্বীকৃতি জানান। আন্দোলন ঘিরে বিক্ষোভ, সংঘাত, ভাঙচুর, সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সারা দেশে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ভাগ করে 'ব্লক রেইড' দিয়ে অভিযান চালানো হয়।

২৮ জুলাই ভোরে কোটা সংস্কার আন্দোলনের আরেক সমন্বয়ক নুসরাত ডিবি হেফাজতে নেয়া হয়। বেলা ৩টা থেকে চালু করা হয় মোবাইল ইন্টারনেট। তবে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টিকটকসহ বিভিন্ন সেবা বন্ধ রাখা হয়। ডিবি হেফাজতে থাকা সমন্বয়কদের কয়েকজনের পরিবার মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে গেলেও তাদেরকে পরিবারের সাথে দেখা করতে দেয় নি। রাত ১০টার দিকে পুলিশি হেফাজতে থাকা ৬ সমন্বয়ক আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। কিন্তু পুলিশে আটক হওয়া অবস্থায় পুলিশের অফিসে বসেই বাকি সমন্বয়কারীদের সাথে যোগাযোগ না করে এমন ঘোষণা দেয়ায় এই ঘোষণাকে সরকার ও পুলিশের চাপে দেয়া হয়েছে বলে আখ্যায়িত করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় বাকিরা। রাত ১১টার দিকে সমন্বয়কদের জিম্মি ও নির্যাতন করে বিবৃতি দেয়ানোর প্রতিবাদে পরদিন ২৯ জুলাই আবারও রাজপথে আসার ঘোষণা দেয় দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা।

পুনঃসূচনা

২৯ জুলাই - ৩ আগস্ট

২৯ জুলাই জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি ঘটনার তদন্ত দাবি করে বিবৃতি দেয় বিক্ষুব্ধ ৭৪ বিশিষ্ট নাগরিক। প্রথম আলোর রিপোর্ট বিশ্লেষণে দেখা যায়, নিহতদের বেশিরভাগই কম বয়সী ও শিক্ষার্থী। বিক্ষোভ দমনে প্রাণঘাতী অস্ত্র (বুলেট বা গুলি) ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি, বাড্ডা, ইসিবিসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় আবারও বিক্ষোভ করার চেষ্টা করে কিছু শিক্ষার্থী। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, চট্টগ্রামসহ অনেক স্থানে বিক্ষোভ মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা। চট্টগ্রামে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ কর্মসূচি সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুঁড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয় কোটা সংস্কার আন্দোলনকে বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে আন্দোলনের সমন্বয়কদের অবৈধভাবে তুলে নিয়ে গোয়েন্দা শাখার কার্যালয়ে আটকে রেখে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা পড়তে বাধ্য করানোর ঘটনা নিরেট মিথ্যাচার, প্রতারণামূলক ও সংবিধান পরিপন্থি উল্লেখ করে

৩১ জুলাই হত্যা, গণগ্রেপ্তার, হামলা, মামলা ও গুমের প্রতিবাদে ৩১ জুলাই বুধবার সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন 'মার্চ ফর জাস্টিস' (ন্যায়বিচারের জন্য পদযাত্রা) কর্মসূচি পালন করে।

চট্টগ্রামে সকাল ১০টার দিক থেকে শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে এক বিক্ষোভ মিছিল করে। এরপর পুলিশের বাধা ভেঙে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আদালত চত্বরেও প্রবেশ করে। বিকেল ৩টায় ১৩ দিন বন্ধ থাকার পর ফেইসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম খুলে দেওয়া হয়।

১ আগস্ট গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হেফাজতে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ককে বেলা দেড়টার একটু পরেই ছেড়ে দেওয়া হয়। সারাদেশে ছাত্র-জনতার ওপর হত্যা, গণগ্রেপ্তার, হামলা-মামলা, গুম-খুন ও শিক্ষকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এবং ৯ দফা দাবি আদায়ে বৃহস্পতিবার 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ' (আমাদের বীরদের স্মরণ) কর্মসূচি পালন করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। দৃশ্যমাধ্যম শিল্পীসমাজ কোটা সংস্কার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ৯ দফা দাবির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করে।

২ আগস্ট গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হেফাজত থেকে ছাড়া পাওয়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ক গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলেন যে আন্দোলন প্রত্যাহার করে ডিবি অফিস থেকে প্রচারিত ছয় সমন্বয়কের ভিডিও বিবৃতি তারা স্বেচ্ছায় দেননি। বিবৃতিদাতা মো: নাহিদ ইসলাম, সারজিস আলম, হাসনাত আব্দুল্লাহ, আসিফ মাহমুদ, নুসরাত তাবাসসুম ও আবু বাকের মজুমদারের ভাষ্য অনুযায়ী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশেই তাদের আটকে রাখা হয়েছিল। এদিন দুপুর ১২ টার পর থেকে মোবাইল নেটওয়ার্কে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক আবার বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে ৫ ঘন্টা পর ফেসবুক-মেসেঞ্জার আবার চালু করা হয়। এদিন সকালে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আবাহনী মাঠ সংলগ্ন সড়কে হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগসহ তিন দফা দাবিতে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে গণহত্যা ও নিপীড়নবিরোধী শিল্পীসমাজ। এছাড়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হয়ে কোটা আন্দোলনে হতাহতের ঘটনায় বিচার দাবি করে প্রতিবাদী সমাবেশ করে চিকিৎসক, মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষার্থীরা। ঢাকার বায়তুল মোকাররম, সাইন্স ল্যাব, উত্তরা, আফতাবনগরে গণমিছিল ও বিক্ষোভ হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম, সিলেট, বগুড়া, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণমিছিল হয়। সিলেটে 'গণমিছিলে' পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও শটগানের গুলি ছুড়লে অন্তত ২০ জন আহত হন। ঢাকার উত্তরায় বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে পুলিশ। সিলেটে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘোষিত প্রার্থনা ও ছাত্র-জনতার গণমিছিল এর অংশ হিসেবে জুমার নামাজের পর হবিগঞ্জে শহরের বোর্ড মসজিদের সামনে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা। পূর্ব টাউন হল এলাকায় অবস্থান নেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। পরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ-ছাত্রলীগের সংঘর্ষ হয়। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশের অন্তত ২৫টি জেলায় শিক্ষার্থীরা গণমিছিল করে। নরসিংদীতে শিক্ষার্থীদের গণমিছিলে ওপর ছাত্রলীগ-যুবলীগের হামলায় অন্তত ১২ জন আহত হয়। খুলনায় বিক্ষোভকারীদের মিছিলে পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে এবং লাঠিচার্জ করে। শিক্ষক ও নাগরিক সমাজের ডাকা দ্রোহযাত্রায় কয়েক হাজার মানুষ যোগ দেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হামলা ও হত্যার প্রতিবাদসহ পূর্বঘোষিত নয় দফা দাবিতে শনিবার (৩ আগস্ট) সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিল ও রবিবার (৪ আগস্ট) থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। রাতে গণভবনে জরুরি বৈঠকে আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলের নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দলকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের সঙ্গে আলোচনা করার নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। ৩ আগস্ট রংপুর সদরে আন্দোলনকারীরা 'ছি ছি হাসিনা, লজ্জায় বাঁচি না" বলে স্লোগান দিচ্ছেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের আলোচনার প্রস্তাব দেন, তবে দুপুরে কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম জানান সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসার কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই। রাজধানীর আফতাবনগরের ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে শিক্ষার্থীরা। রাজশাহীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাজারখানেক শিক্ষার্থী শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মিছিল বের করে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) সামনে জড়ো হয়ে স্লোগান দেয়। এদিন শিক্ষার্থীরা এক দফা, এক দাবি নিয়ে মাঠে নামে। তারা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে। কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে রাজধানীর ধানমন্ডির রবীন্দ্রসরোবরে সংগীতশিল্পীদের প্রতিবাদী সমাবেশ হয়। বিকেল চারটার পর বিক্ষুব্ধ জনতা বিরাট মিছিল নিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে যাত্রা শুরু করে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ একত্র হয়। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শহীদ মিনারে সমবেত ছাত্র-জনতার উদ্দেশে বক্তব্য দেন কোটা সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া সংগঠনটির সমন্বয়ক মো: নাহিদ ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার মন্ত্রিসভার পদত্যাগের একদফা দাবি ঘোষণা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আরিফ সোহেলকে জামিন দেয় আদালত। চট্টগ্রাম নগরে শিক্ষামন্ত্রীর বাসায় হামলা হয়। এর আগে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে চট্টগ্রাম নগরের লালখান বাজারে চট্টগ্রাম-১০ আসনের সংসদ সদস্য মো: মহিউদ্দিন বাচ্চুর কার্যালয়েও হামলা হয়। গাজীপুরের শ্রীপুরে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে একজন নিহত হন। রাত সোয়া ৮টার দিকে শেখ হাসিনা পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপাচার্য, শিক্ষক ও কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। রংপুরে কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদের মৃত্যুর ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। সিলেটে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি চলাকালে পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ চলে। বিকেল ৫টার পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সাড়া দিয়ে মহাখালী ও মিরপুর ডিওএইচএসের ভেতরে বিক্ষোভ হয়। ডিওএইচএসে মূলত সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যরা বসবাস করেন। কর্মসূচিতে বিপুলসংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সদস্য ছাড়াও তাদের পরিবারের সদস্যরাও অংশ নেন।

৪ আগস্ট মহাখালী ডিওএইচএসের রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনে (রাওয়া ক্লাব) সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৪৮ জন সাবেক সেনা কর্মকর্তা। এদের মধ্যে ছিলেন সাবেক সেনাপ্রধান এম নুর উদ্দিন খান, মোহাম্মদ আব্দিজুর রহমান, কায়সার ফজলুল কবির, জামিল ডি আহসান, রেজাবুল হায়দার, মুজাহিদ উদ্দিন, আবুল কালাম হুমায়ুন কবির প্রমুখ। ইকবাল করিম ভূঁইয়া বলেন, আক্রমণকারীরা গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিরোধের মধ্যে পিছপা হতে বাধ্য হলে, পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবহার করা হলো বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে। তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, কখনো সম্মুখভাগে, কখনো পেছনে ও পাশে দাঁড় করিয়ে অন্য বাহিনীগুলো এই গণ-আন্দোলনের ওপর তাদের জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। কোনোভাবেই এমন পরিস্থিতির দায় দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর নেওয়া উচিত নয়। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী অতীতে কখনো দেশবাসী বা সাধারণ জনগণের মুখোমুখি দাঁড়ায়নি, তাদের বুকে বন্দুক তাক করেনি। শেষে সাবেক সেনাপ্রধান বলেন, 'একটি রাজনৈতিক সংকটকে সামরিকীকরণের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, আমরা সশস্ত্রবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা এর তীব্র বিরোধিতা করছি।'

৫ আগস্ট

২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ৫ আগস্ট বেলা আড়াইটায় বঙ্গভবন থেকে একটি সামরিক হেলিকপ্টার শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে যাত্রা করে। এ হেলিকপ্টার তাকে ও তার ছোট বোন অন্যতম মাস্টার মাইন্ড শেখ রেহেনাকে নিয়ে প্রথমে আগরতলা যায়। পরে সেখান থেকে তাদের দিল্লী নিয়ে যাওয়া হয়।

যেভাবে শহিদ হলেন

বাবার সাথে প্রতিদিনের মতো ৫ আগস্ট ঝালমুড়ি বিক্রি করতে বের হয়েছিলেন মহিন। এদিন স্বৈরাচারী হাসিনার পতনের দিন দুপুরের পর বিজয় মিছিলে যাবার জন্য বাসা থেক বের হয় তিনি। কিন্তু রাত হয়ে যাবার পরও যখন বাসায় ফিরছে না তখন সন্তানের খোঁজে বের হয় ইউনুছ মিয়া। অনেকখোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে কুমিল্লা সরকারি হাসপাতালে যান খোঁজ নিতে। গিয়ে দেখেন তার ছেলের নিথর দেহটা পড়ে আছে ফ্লোরে। গায়ে গভীর ক্ষত, বীভৎস মারের দাগ পিঠে। ঘাতক পুলিশের হাতে নির্মম অত্যাচারের শিকার হয় শিশু মহিন। অত্যাচারের এক পর্যায়ে মারা যায়।

শিক্ষকের অনুভূতি

মহিনউদ্দিনের মক্তবের শিক্ষক জনাব আল আমিন বলেন- "মহিন খুবই ভালো একটা ছেলে। অমায়িক ছিলো। সে শান্ত স্বভাবের ছিলো। সবাইকে সম্মান করে চলতো।

মহিনের পরিবার যেমন আছে

মহিন উদ্দিন এর পরিবারে বাবা মার সাথে রয়েছে দুই বোন। বাবা ফুটপাতে ঝালমুড়ি বিক্রি করতো। মহিন বাবাকে সাহায্য করতো। ঝালমুড়ি বিক্রির আয়ে চলতো তাদের পরিবার। অভাব অনটন লেগেই থাকতো নিত্যদিন। আন্দোলনে একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে শোকগ্রস্ত মহিনের বাবা মা। তাদের স্বপ্ন ছিলো ছেলে একদিন বড় হবে, চাকরি বা ব্যবসা করে পরিবারের দায়িত্ব নিবে। বোনদের বিয়ে দিবে। কিন্তু ঘাতক পুলিশের বুলেট তাদের সে স্বপ্ন কেড়ে নেয়। এখন তাদের সম্বল বলতে গ্রামের এক টুকরো জমি।

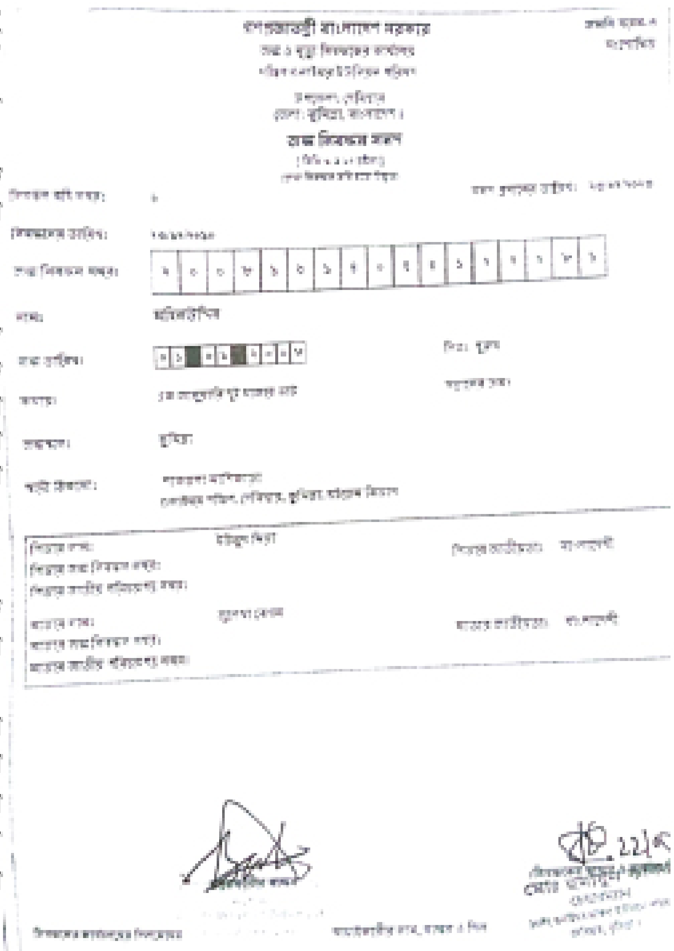

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জন্ম নিবন্ধন সনদ

একনজরে শহীদ মহিন উদ্দিন

নাম	: মহিন উদ্দিন
পেশা	: ঝালমুড়ি বিক্রেতা
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১ জানুয়ারি ২০০৮, ১৬বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার, আনুমানিক বিকেল ০৩ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: অসুখতলা, কুমিল্লা
দাফন করা হয়	: বাড়ির পাশের কবরস্থানে
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শাকতলা, মানিক পাড়া, থানা/উপজেলা: দেবিদ্বার, জেলা: কুমিল্লা
পিতা	: ইউনুছ মিয়া
মাতা	: জুলেখা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে একটুকরো জমি আছে
ভাইবোনের বিবরণ	: ছোট ভাই ও বড় একটি বোন আছে

প্রস্তাবনা

১.বড় ভাইয়ের একটি ভালো চাকরির ব্যবস্থা করা

২.পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা

শহীদ মো: জাহিদ হোসেন রাব্বি

ক্রমিক: ৪৫৩

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০১২

“আব্বু, আমি আজ মিছিলে যাব ”

শহীদ পরিচিতি

মো: জাহিদ হোসেন রাব্বি একজন উদ্যমী ও প্রতিভাবান ব্যক্তি, যিনি বর্তমান সময়ের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে একজন উদাহরণস্বরূপ। তিনি এসএসসি পাশ করেছেন আমানুল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে, যা তার শিক্ষাজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি, তিনি গ্রাফিক ডিজাইনিং এ আগ্রহী এবং এই ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেছেন। তার জন্ম তারিখ ১১ আগস্ট ২০০৫।

জাহিদ চলে যাওয়ার পর তার বাবা গভীর শোক ও মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছেন। প্রিয় পুত্রের হঠাৎ এবং অকাল প্রস্থান তার জীবনকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করেছে। বাবার জন্য, জাহিদকে হারানো শুধু একটি বড় আঘাতই নয় বরং তার দৈনন্দিন জীবনের একটি অমূল্য অংশের চিরতরে চলে যাওয়া।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে জনগণ নানান অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমের নির্মম ভুক্তভোগী। এদেশের মুক্তিকামী জনতা সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে এহেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই সাথে হুংকার দিয়ে সংগ্রামী জনতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ছাত্রবৃন্দ। উপরন্তু গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সাক্ষী, দেশের ক্রান্তিকালে বরাবরই ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে। বাংলাদেশ নামক গাড়িটা যখন এমনভাবে ব্রেক ফেইল করলো আর বাংলাদেশী নামক যাত্রীরা যখন আতঙ্কিত; চারদিকে যখন কষ্ট, বেদনা, চিৎকার, আহাজারি আর নিশ্চিত ধ্বংসের সুস্পষ্ট লক্ষণ, তখন রাষ্ট্রযন্ত্রের এমন বর্বরতা তরুণ প্রতিবাদী সমাজ সচেতন আযিযুল মিয়ার দেখে মনে আঁচড় কাটতে পারে। কেননা সবকিছু তো তার সামনেই ঘটছে। তিনি নিজের কানেই শুনছেন মানুষের নিদারুণ আর্তনাদ; ব্যথিত মনের হাহাকার। নিজের চোখে দেখছেন কিভাবে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে শাসক নামধারী শোষক গোষ্ঠী।

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতিন, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ তালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গত ১ জুলাই থেকে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয় । আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, জঙ্গই সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

আন্দোলনে যোগদান

২০২৪ সালের জুলাই মাসে শহীদ জাহিদ জানতে পারেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের কথা। আরও ৪ বছর আগে ২০১৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা শুরু করেছিল কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সে বছর তারা স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের হঠকারিতা ও একগুঁয়েমিতার কারণে সম্পূর্ণ খালি হাতে ঘরে ফিরতে বাধ্য হয়েছিলো। সাধারণ শিক্ষার্থীদের সেই আন্দোলন ২০২৪ সালে আবার ফিরে এসেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামে।

সে বছর শহীদ জাহিদ হোসেন রাব্বি আরো ছোট ছিলেন। তাই সেদিনের কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তিনি ছিলেন না। ছোট বলে কেউ কিছু বুঝাতেও আসেনি তাকে। তবে কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন না বুঝলেও ঐ বছর স্কুল কলেজ আর মাদ্রাসার ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের ডাকা নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে সহপাঠীদের সাথে শহীদ জাহিদও ছিলেন। সেবছর দীর্ঘদিন তারা রাজপথে থেকে আন্দোলন করেছিলেন ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে।

যৌক্তিক ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্যও যে এদেশে কত সংগ্রাম আর ত্যাগের প্রয়োজন হয় তা ছোট ছোট শিশুদের সাথে শহীদ জাহিদ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাইতো দূর্নীতিবাজ স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন তার চেনা; এই রাজপথ তার পরিচিত।

২০২৪ সালের জুন মাসে ছাত্ররা দেখলো আবারও তারা বৈষম্যের চেতনাবাদী সরকারের কুটচালের শিকার হচ্ছে। তাই জুলাইয়ের শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন থেকে রাজপথকেই তাদের দাবি আদায়ের শেষ ঠিকানা হিসেবে নির্ধারিত করলো শহীদ জাহিদ তখন থেকেই পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে নিয়মিত আন্দোলনের খোঁজ নিতে শুরু করলে।

> দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে রাজপথে।

এর মধ্যে স্বৈরাচার আওয়ামী সরকার অস্ত্র হাতে তুলে নিলেন নিরস্ত্র সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে। ১৬ জুলাই আন্দোলনরত নিরীহ-নিরস্ত্র সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর নির্বিচারে গুলি করলো খুনি গোপালীশ পুলিশ।

শহীদ হলেন রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৬ জন শিক্ষার্থী। এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠলো দেশের প্রতিটি সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। আন্দোলনের সাথে যোগ দিলো অনেক স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী। যোগ দিলেন মো: জাহিদ হোসেন রাব্বিও।

যেভাবে শহীদ হলেন

জাহিদ তার বাবাকে ফোন করে জানায়, "আব্বু, আমি আজ মিছিলে যাব।" বাবার অনুমতি পেয়ে সে আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করে। বিকাল চারটার পর একটি ফোন আসে, যেখানে জানানো হয় যে গুলিবিদ্ধ হয়েছে জাহিদ। তার শরীরে পাঁচটি গুলি পাওয়া গেছে, যা তাকে গুরুতর আহত করেছে। মেধাবী জাহিদের এই মর্মান্তিক ঘটনা পরিবার ও এলাকাবাসীর মধ্যে শোকের ছায়া ফেলেছে।

কেমন আছে মো: জাহিদ হোসেন এর পরিবার

মো: জাহিদ হোসেন রাব্বির মৃত্যুর পর তার পরিবার গভীর শোক ও দুঃখের মধ্যে রয়েছে। তার অকাল মৃত্যু পরিবারের জন্য একটি অপরিসীম শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। একটি স্বপ্নময় তরুণের অকাল প্রস্থান তার পরিবারকে চরম মানসিক কষ্টের মুখোমুখি করেছে। জাহিদের আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা তাদের গর্বের কারণ হলেও, তার অভাব তাদের প্রতিদিনের জীবনে এক দীর্ঘস্থায়ী শূন্যতা ও দুঃখ রেখে গেছে। পরিবারটি তার আত্মার শান্তি ও সান্ত্বনার জন্য প্রার্থনা করছে এবং তার স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে চলতে চেষ্টা করছে, যদিও এই যন্ত্রণাদায়ক অভাব তাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।

প্রতিবেশী ও বন্ধুর বক্তব্য

শহীদ মো: জাহিদ হোসেন রাব্বি ভালো, আদর্শবান এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তি। তার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে।" আবু সাঈদের এই মন্তব্য শহীদ জাহিদ হোসেন রাব্বির প্রতি তার আন্তরিক ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতার প্রকাশ, যা তার মহত্ত্ব এবং প্রভাবকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরে।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা

মো: জাহিদ হোসেনের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা একটি সীমিত মধ্যবিত্ত পরিবেশকে প্রতিফলিত করে। তার বাবা একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, যিনি স্থানীয় বাজারে পাঞ্জাবির দোকান পরিচালনা করেন। ব্যবসার আয় যথেষ্ট নয়, তবে এটি পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয়। পরিবারের মোটামুটি স্থিতিশীলতার জন্য ব্যবসার আয় অপর্যাপ্ত হলেও কিছুটা সহায়ক।

শহীদ মো: জাহিদ হোসেন রাব্বির পরিবার একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। তাঁর বাবা একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, যিনি স্থানীয় বাজারে ছোট পরিসরের ব্যবসা পরিচালনা করেন। ব্যবসার আয় সীমিত হওয়ায় পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্রও সাধারণ। প্রতিদিন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকেন বাবা, আর তার উপার্জন মূলত পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। জাহিদ হোসেন রাব্বির মা গৃহিণী, যিনি বাড়ির সকল কাজকর্ম ও পরিবারের অন্যান্য দৈনন্দিন দায়িত্ব পালন করেন। সামান্য আর্থিক চাপ থাকলেও, পারিবারিক ঐক্য ও পরস্পরের সহায়তা তাদের চলমান জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

প্রস্তাবনা-১: বাসস্থান প্রয়োজন।

প্রস্তাবনা-২: বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে।

প্রস্তাবনা-৩: ছোট ভাই-বোনদের লেখা-পড়ার খরচ যোগানে সহযোগিতা করা যেতে পারে।

একনজরে শহীদ মো: জাহিদ হোসেন রাব্বি

নাম	: মো: জাহিদ হোসেন রাব্বি
পেশা	: ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১১/০৮/২০০৫
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচার সরকারের ঘাতক পুলিশ
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২-৩
শাহাদাত বরণের স্থান	: খিলক্ষেত মোল্লা ফার্মেসির সামনে
দাফন করা হয়	: নিজ এলাকায়
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 23°34'02.7"N 91°02'29.8"E
স্থায়ী ঠিকানা	: খয়রাবাদ, জাফরগঞ্জ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা
পিতা	: মো: ফজর আলী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ৪৯
মাতা	: আয়েশা বেগম, গৃহিণী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৬ জন

শহীদ আব্দুর রাজ্জাক রুবেল

ক্রমিক: ৪৫৪

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০১৩

শহীদ পরিচিতি

আব্দুর রাজ্জাক রুবেল দেবিদ্বার এলাকার একজন সাহসী যুবক। নিহত রুবেলের স্ত্রী হ্যাপি আক্তার জানায়, বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে, তার বাবার মৃত্যুর পর পরিবারের হাল ধরেছিল রুবেল। গাড়ি চালিয়ে স্ত্রী, সন্তান ও মাকে নিয়ে জীবন যাপন করতো। রুবেল ও হ্যাপি দম্পতির নৌকা নামের একটি ছয় বছরের মেয়েও আছে। আন্দোলনের সময় রুবেলের স্ত্রী হ্যাপী আক্তার ছিলেন নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে গত ৪ আগস্ট কুমিল্লার দেবিদ্বারে গুলিতে নিহত হন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আবদুর রাজ্জাক রুবেল। কুমিল্লা উত্তর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম বলেন, 'দেশের জন্য শহীদ রুবেলের আত্মত্যাগ বিফলে যায়নি। তার আত্মত্যাগের বিনিময়ে একজন স্বৈরাচারী হাসিনার পতন হয়েছে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে জনগণ নানান অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমের নির্মম ভুক্তভোগী। এদেশের মুক্তিকামী জনতা সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে এহেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই সাথে হুংকার দিয়ে সংগ্রামী জনতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ছাত্রবৃন্দ। উপরন্তু গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সাক্ষী, দেশের ক্রান্তিকালে বরাবরই ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে। বাংলাদেশ নামক গাড়িটা যখন এমনভাবে ব্রেক ফেইল করলো আর বাংলাদেশী নামক যাত্রীরা যখন আতঙ্কিত; চারদিকে যখন কষ্ট, বেদনা, চিৎকার, আহাজারি আর নিশ্চিত ধ্বংসের সুস্পষ্ট লক্ষণ, তখন রাষ্ট্রযন্ত্রের এমন বর্বরতা তরুণ প্রতিবাদী সমাজ সচেতন আমিমুল মিয়ার দেখে মনে আঁচড় কাটতে পারে। কেননা সবকিছু তো তার সামনেই ঘটছে। তিনি নিজের কানেই শুনছেন মানুষের নিদারুণ আর্তনাদ; ব্যথিত মনের হাহাকার। নিজের চোখে দেখছেন কিভাবে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে শাসক নামধারী শোষক গোষ্ঠী।

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতিন, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নেয়গিরি। তাই ২০২৪ তালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গত ১ জুলাই থেকে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয় । আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, RAB সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

যেভাবে শহীদ হলেন

আবদুর রাজ্জাক রুবেলকে গত ৪ আগস্ট উপজেলা সদরের আজগার আলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে সন্ত্রাসী ঘাতক আওয়ামী লীগের লোকজন রামদা দিয়ে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে। তিনি পৌর এলাকার বারেরা গ্রামের মৃত রফিকুল ইসলামের ছেলে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাগুত সরকার গণমানুষের উপর যে হত্যাকান্ড চালিয়েছে, সেই আন্দোলনের একজন দেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধা আব্দুল রাজ্জাক। চারদিকের গোলাগুলির শব্দে নিজেকে ঘরবন্দী না করে সাধারণ ছাত্রজনতার বিপ্লবী আন্দোলনকে আরো সোচ্চার করতে সকাল ১০ টায় বাসা থেকে বের হয়ে আন্দোলনে যোগদান করেন আবার বাসায় আসেন। কিছুক্ষণ পর আবার বাসা থেকে বের হলে ফ্যাসিস্ট সরকারের পুলিশবাহিনীর গুলি এসে তার বুকে লাগে। এই অবস্থায় তাকে দেবিদ্বার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন, তিনি আরও আগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

৪ আগস্ট দেবিদ্বার এলাকার সকল নিউজ মিডিয়ার তথ্য ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা

৪ আগস্ট দেবিদ্বার আন্দোলনকারীদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের মূল দাবি ছিল শিক্ষার্থীদের অধিকারের পক্ষে এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে। বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন ঢাকা পোস্ট, কুমিল্লার কাগজ, আজকালের খবর এবং সময় টেলিভিশনে এই ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। আন্দোলনটি শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হলেও পুলিশের সহিংস আক্রমণে তা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়। দুপুরের দিকে পুলিশ রাবার বুলেট, টিয়ারগ্যাস এবং সরাসরি গুলি ছুঁড়ে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। সহিংসতার ফলে বহু শিক্ষার্থী আহত হয়, এবং রুবেল নির্মমভাবে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। এলাকাবাসী ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, আন্দোলনকারীরা পুলিশি আক্রমণের মুখে কিছুটা পিছু হটলেও তাদের দাবির প্রতি দৃঢ় ছিলেন। গণমাধ্যমে উল্লেখ করা হয় যে, আন্দোলনকারীদের শান্তিপূর্ণ দাবিকে প্রশাসন কঠোরভাবে দমন করার চেষ্টা করেছিল, যা আরও বেশি সহিংসতার সৃষ্টি করে। এছাড়া, স্থানীয় মানুষ এবং সাংবাদিকরা পুলিশের আক্রমণকে অপ্রত্যাশিত ও অনুচিত বলে উল্লেখ করেন।

শহীদ সম্পর্কে বিশেষ তথ্যঃ

মৃত্যুর ৩৬ দিন পর বাবা হয়েছেন আবদুর রাজ্জাক রুবেল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে গত ৪ আগস্ট কুমিল্লার দেবিদ্বারে গুলিতে নিহত রুবেলের স্ত্রী হ্যাপী আক্তার ছেলে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। নিহত রুবেলের বৃদ্ধা মা মোসনেয়ারা বেগম নাতিকে কোলে নিয়ে কাঁদছেন। তিনি বলেন, বাবারে আমার ছেলে আজ বেঁচে থাকলে অনেক খুশি হইতো। কপাল পোড়া নাতিটা জন্মের পর তার বাবার মুখ দেখতে পারল না। বড় হয়ে বাবাকে খুঁজলে আমি কী জবাব দেব? রুবেলের স্ত্রী বলেন, আমার স্বামীর ইচ্ছা ছিল ছেলে

সন্তান হলে রাইয়ান নাম রাখবেন। নাম রাইয়ানই রাখা হয়েছে। আমার একটি সুখী পরিবার ছিল, একটি গুলিতে নিভে গেল সব। সন্তানের মুখ দেখে যেতে পারল না তার বাবা। আমার স্বামীর কি অপরাধ ছিলো তাকে কেন ঘাতকরা গুলি করে মারল?

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ আব্দুর রাজ্জাক রুবেলের পরিবারের পরিস্থিতি সত্যিই হৃদয়বিদারক। তার পত্নী গর্ভবতী এবং সব বোন বিবাহিত হওয়ায় পরিবারটি পুরুষশূন্য হয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে পরিবারটিকে সাহায্য করা এবং তাদের পাশে দাঁড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সমাজ বা সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে, যেন পরিবারটি এই কঠিন সময় কাটিয়ে উঠতে পারে। শহীদের আত্মত্যাগ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, পরিবারের সুরক্ষা ও ঐক্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

শহীদ থেকে প্রেরণা

রুবেলের সাহসিকতা এবং তার আত্মত্যাগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি অনুপ্রেরণার উৎস। একজন সংসারী হয়েও সে যেভাবে নিজের দেশের জন্য এবং সামাজিক ন্যায়ের দাবিতে জীবন দিয়েছিল, তা বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থী এবং যুবসমাজকে ন্যায়ের জন্য লড়াই করতে উৎসাহিত করবে। তার সাহসিকতা, আত্মত্যাগ, এবং দেশপ্রেম শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক সাহস জাগাবে এবং তারা নিজেরাও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ হবে। রুবেলের এ মহান আত্মত্যাগ একটি প্রমাণ যে, দেশের জন্য ভালোবাসা এবং ন্যায়বিচারের জন্য সংগ্রাম করতে বয়স কোনো বাধা নয়। তার জীবন এবং মৃত্যু বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা সকল মানুষের জন্য একটি আদর্শ এবং উদাহরণ হয়ে থাকবে।

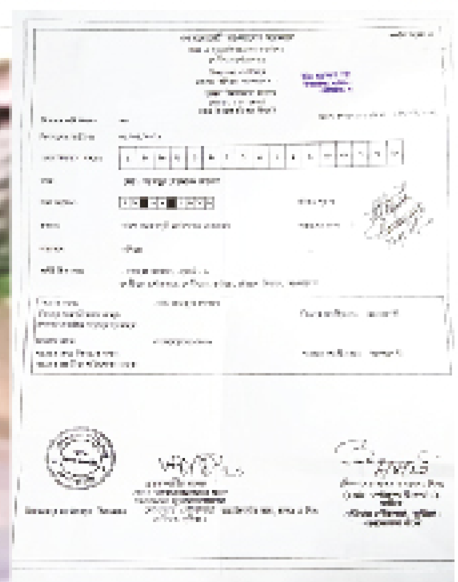

শহীদ আব্দুর রাজ্জাক রুবেল

নাম	: শহীদ আব্দুর রাজ্জাক রুবেল
পেশা	: গাড়ি চালক
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, ৪৩বছর
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক পুলিশ
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৪ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক দুপুর ১.৩০ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: দেবীদ্বার সদরের আক্কাস আলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে
দাফন করা হয়	: নিজ গ্রামে
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 23°36'09.1"N 90°59'48.6"E
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বারেরা, ইউনিয়ন: দেবীদ্বার, পৌরসভা: ৯ নং ওয়ার্ড, থানা/উপজেলা: দেবীদ্বার, জেলা: কুমিল্লা
পিতা: রফিকুল ইসলাম মাতা	: হোসনে আরা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: ভিটেমাটি ও কিছু জমি
প্রস্তাবনা	১. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া প্রয়োজন
	২. মেয়েকে পড়াশোনার খরচের ব্যবস্থা করে দিলে উপকার হবে

শহীদ রবিন মিয়া মিঠু

ক্রমিক : ৪৫৫

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০১৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ রবিন মিয়া মিঠু ছিলেন একজন জুতার দোকান মালিক এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারী। কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার ওবায়দপুর গ্রামের বাসিন্দা রবিন মিয়া মিঠু ঢাকার দনিয়ায় পরিবারসহ বসবাস করতেন। তার জুতার দোকানের নাম ছিল মিঠু সুজ, যা স্থানীয়ভাবে পরিচিত ছিল। রবিনের জীবন ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক। তার অবদান এবং সাহসিকতা তাকে আন্দোলনকারীদের মধ্যে এক বিশেষ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে জনগণ নানান অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমের নির্মম ভুক্তভোগী। এদেশের মুক্তিকামী জনতা সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে এহেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই সাথে হুংকার দিয়ে সংগ্রামী জনতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ছাত্রবৃন্দ। উপরন্তু গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সাক্ষী, দেশের ক্রান্তিকালে বরাবরই ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে। বাংলাদেশ নামক গাড়িটা যখন এমনভাবে ব্রেক ফেইল করলো আর বাংলাদেশী নামক যাত্রীরা যখন আতঙ্কিত; চারদিকে যখন কষ্ট, বেদনা, চিৎকার, আহাজারি আর নিশ্চিত ধ্বংসের সুস্পষ্ট লক্ষণ, তখন রাষ্ট্রযন্ত্রের এমন বর্বরতা তরুণ প্রতিবাদী সমাজ সচেতন রবিন মিয়ার দেখে মনে আঁচড় কাটতে পারে। কেননা সবকিছু তো তার সামনেই ঘটছে। তিনি নিজের কানেই শুনছেন মানুষের নিদারুণ আর্তনাদ; ব্যথিত মনের হাহাকার। নিজের চোখে দেখছেন কিভাবে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে শাসক নামধারী শোষক গোষ্ঠী।

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতি, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ সালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গত ১ জুলাই থেকে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয় । আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, জঙ্গই সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

যেভাবে শহীদ হলেন

৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে, রবিন মিয়া মিঠু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের অংশ হিসেবে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠু ও সুবিচারমূলক কোটা সংস্কারের দাবিতে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। ঐদিন সকালে, আন্দোলনকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের দাবি জানাচ্ছিলেন, কিন্তু ফ্যাসিস্ট সরকারের লেলিয়ে দেয়া ঘাতক পুলিশ হঠাৎ করেই হামলা চালায়। রবিন মিয়া মিঠু আন্দোলনের অংশ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। নির্মম পুলিশ কর্মকর্তারা আন্দোলনকারীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। একপর্যায়ে রবিনের শরীরের দুটি পায়ে দুটি এবং বুকে সাতটি গুলি লাগে। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি; রক্তাক্ত হয় রাজপথ। গুরুতর আহত অবস্থায় রবিনকে বন্ধুরা উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে সেদিনই তার মৃত্যু ঘটে। এই বর্বর আচরণ তার মৃত্যু নিশ্চিত করে দেয় এবং বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা আন্দোলনে একটি গভীর ক্ষতির সৃষ্টি করে।

পরিবার ও আত্মীয়দের কথা

রবিন মিয়া মিঠুর মৃত্যু পরিবারের জন্য একটি গভীর শোকের বিষয়। তার মাতা পারভীন আক্তার, যিনি ৪৫ বছর বয়সী এবং গৃহিণী, তার সন্তানের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত। তিনি বলেন, "আমার ছেলের অনুপস্থিতি আমাদের জীবনকে শূন্য করে দিয়েছে।" রবিনের স্ত্রী তুম্পা আক্তার, যিনি একজন গৃহিণী এবং অনার্সে অধ্যয়নরত, তার স্বামীর মৃত্যুতে চরম হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "রবিন ছিল আমাদের পরিবারের ভরসা। তার মৃত্যু আমাদের জন্য একটি বড় ধাক্কা।" রবিনের পরিবারের বড় ভাই রুবেল মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী। তিনি পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করেন, কিন্তু রবিনের মৃত্যু পরিবারের আর্থিক অবস্থা আরও কঠিন করে দিয়েছে। রবিনের দুই ছোট সন্তান, সোহান (৩) এবং মো: হাদিদ মিয়া (১৫ মাস), বর্তমানে তাদের মায়ের উপর নির্ভরশীল। রবিনের চাচা, একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, পুলিশের বর্বর আচরণ দেখে হতাশ এবং ক্ষুব্ধ তিনি নিজেও। তিনি জানান, "আমার ৩৭ বছরের পুলিশ জীবনে আমি কখনো একটি গুলিও চালাইনি। পুলিশ যে ধরনের বর্বরতা প্রদর্শন করেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।"

শহীদ পরিবারের আর্থিক অবস্থা

রবিন মিয়া মিঠুর মৃত্যু পরিবারটির আর্থিক অবস্থাকে সংকটময় করে তুলেছে। রবিন পরিবারের অন্যতম উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তার জুতা কারখানা পরিচালনা করতেন। তার মৃত্যুর পর, পরিবারটি বড় ভাই রুবেলের প্রবাসী আয়ের উপর নির্ভরশীল

হয়ে পড়েছে। তার পরিবারে দুটি ছোট সন্তান রয়েছে, যা তাদের দৈনন্দিন খরচ এবং শিক্ষাগত খরচ মেটানো আরও কঠিন করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে, পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য অবিলম্বে সহায়তার প্রয়োজন।

শহীদ সম্পর্কে বিশেষ তথ্য

রবিন মিয়া মিঠু তার সাহসিকতা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারের জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি নিয়মিতভাবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন এবং তার নেতৃত্ব ও উৎসাহের জন্য প্রশংসিত ছিলেন। তার চাচা, একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, পুলিশের বর্বরতা দেখে গভীরভাবে হতাশ হয়েছেন। তিনি জানান, পুলিশের এমন আচরণ তার দীর্ঘ পুলিশ জীবনে কখনো দেখেননি। রবিনের মৃত্যুর মাধ্যমে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হারিয়েছে।

শহীদ থেকে প্রেরণা

রবিন মিয়া মিঠুর জীবন ও মৃত্যু আমাদের সকলকে প্রেরণা দেয়। তার সাহসিকতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি তার অবিচল অঙ্গীকার এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ তার অনুকরণীয় চরিত্রের প্রমাণ। তার জীবন ও মৃত্যু আন্দোলনকারীদের মধ্যে একতা এবং শক্তি বাড়িয়ে তুলেছে। রবিনের সাহস ও আত্মত্যাগ আগামী দিনের আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করার উদ্দীপনা জোগাবে।

শহীদ রবিন মিয়া মিঠু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের এক শক্তিশালী এবং সাহসী নেতা ছিলেন। তার জীবন এবং মৃত্যু আমাদের সবার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছে। তার পরিবার এবং সমাজকে সহায়তা প্রদান করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। রবিনের সংগ্রাম এবং ত্যাগ আমাদের ন্যায়বিচারের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা প্রদান করে।

প্রস্তাবনা:

প্রস্তাবনা-১: পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা।
প্রস্তাবনা-২: শহীদের স্ত্রী ও সন্তানদের যথাযথ সহযোগিতা করা।
প্রস্তাবনা-৩: জুতার কারখানা নিয়মিত চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা।

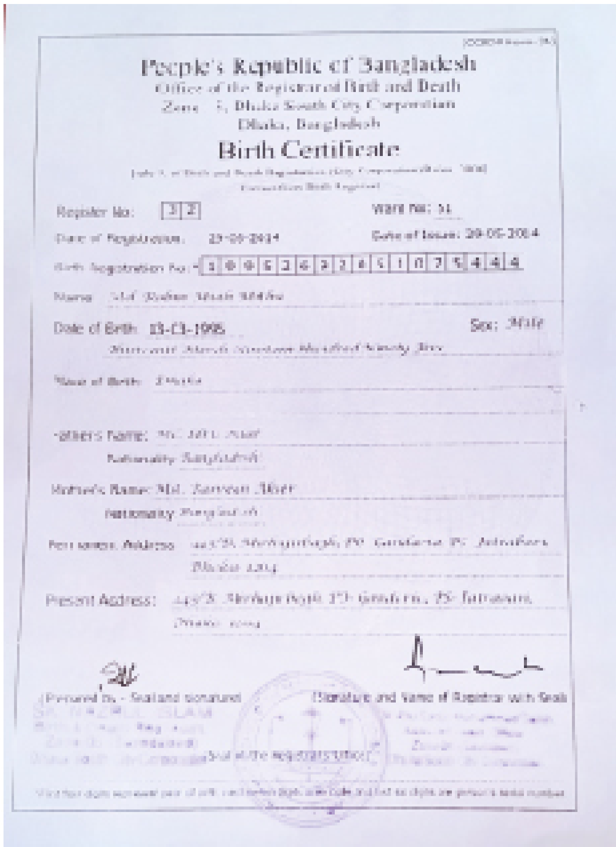

People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar of Birth and Death
Dhaka South City Corporation
Dhaka, Bangladesh

Birth Certificate

Register No: 32

Date of Issue: 29-05-2014

Birth Registration No: 19952622651075444

Date of Birth: 13-03-1995

Father's Name:

Nationality:

Mother's Name:

Nationality:

Permanent Address:

Present Address:

Prepared by - Seal and Signature

Signature and Name of Registrar with Seal

Seal of the Registrar's Office

একনজরে শহীদ সম্পর্কে তথ্যাবলি

নাম	: রবিন মিয়া মিঠু
পেশা	: ব্যবসায়ী
জন্ম	: ১৩/০৩/১৯৯৫
ঠিকানা	: গ্রাম : ওবায়দপুর, ওয়াহেদপুর, ইউনিয়ন : সুবিলজেলা, থানা: দেবিদ্বার, জেলা: কুমিল্লা
পিতা	: ইদ্রীস মিয়া, মৃত
মাতা	: পারভীন আকতার, পেশা : গৃহিণী, বয়স: ৪৫
ঘটনার স্থান	: যাত্রাবাড়ী থানার সামনে
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী
আহত হওয়ার সময়কাল	: ০৫/০৮/২০২৪, সময়: ১০.৩০ টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ০৫/০৮/২০২৪, সময়: ১০.৩০ টা

শহীদ ফয়সাল সরকার

ক্রমিক : ৪৫৬

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০১৫

শহীদ পরিচিতি

১৯৯৯ সালের ১৫ নভেম্বর বাবা সফিকুল ইসলাম সরকার ও মা হাজেরা বেগমের কোল আলোকিত করে জন্ম নেয় শহীদ মো: ফয়সাল সরকার। সে ছিল পরিবারের ছয় মেয়ের পর প্রথম সন্তান। কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার কাচিসাইর গ্রামে তার জন্ম ও বেড়ে উঠা। অভাবের সংসারে জীবীকার তাগিদে শ্যামলী গাড়িতে সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করতো সে। ফয়সাল এস এম মোজাম্মেল হক টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতিন, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ তালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গত ১ জুলাই থেকে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয়। আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, র‍্যাব সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে।

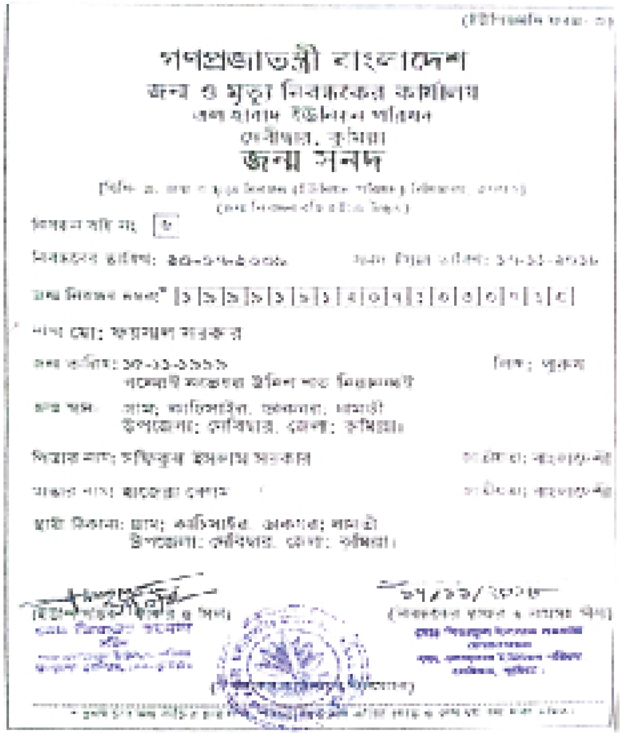
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
কুমিল্লা
জন্ম সনদ
নাম: মো: ফয়সাল সরকার
লিঙ্গ: পুরুষ

রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

আন্দোলনে যোগদান

১৯ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার বিকালে বিপ্লবী মো: ফয়সাল সরকার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়। সে আব্দুল্লাহপুর এলাকায় শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশ নেয়।

যেভাবে শহীদ হলেন

শহীদ ফয়সাল সরকার ছিলো একজন মেধাবী শিক্ষার্থী। সে পরিবারের ব্যয় ভার বহন করার জন্য পড়ালেখার পাশাপাশি শ্যামলী গাড়িতে সুপারভাইজার হিসেবে পার্ট টাইম কাজ করতোপ। ফয়সাল কোটা সংস্কার আন্দোলনের একজন নিয়মিত সহযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করতো। সে গত ১৯ জুলাই বিকেলে আব্দুল্লাহপুরের শ্যামলী পরিবহন কাউন্টারে যাবে বলে বাসা থেকে বের হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন কে কেন্দ্র করে রাজধানীর আব্দুল্লাহপুর এলাকায় ঘাতকের ছোঁড়া গুলি মাথায় বিদ্ধ হয়। পরিবারের সদস্যরা কোথাও তার খোঁজ না পেয়ে ২৮ জুলাই দক্ষিণ খান থানায় জিডি করি। ১২ দিন পর বৃহস্পতিবার (১ আগস্ট) বিকেলে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামে খোঁজ নিলে; তারা বেওয়ারিশ হিসেবে দাফন করা মরদেহগুলোর ছবি দেখালে সেখানে ফয়সালের মরদেহের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। কোথায় দাফন করা হয়েছে জানতে চাইলে তারা জানায়, ১০১৫টি লাশ একবারে গণকবর দেওয়া হয়েছে, কাকে কোথায় দাফন করা হয়েছে তারা তা বলতে পারবেন না। অশ্রুসিক্ত চোখে শহীদ ফয়সালের বাবা, বৃদ্ধ মো: সফিকুল ইসলাম সরকার বলেন, 'আমার ছয় মেয়ের পর ফয়সাল হইছে।'

কেমন আছে ফয়সালকে হারিয়ে তার পরিবার

শহীদ ফয়সাল কে হারিয়ে তার পরিবারে এক অন্ধকারের বিষণ্ণতা ছেয়ে পড়েছে। কারণ শহীদ ফয়সাল ছিল সংসারের চালিকাশক্তি। শহীদ ফয়সালের মারা যাওয়ার খবর পেয়ে তার মায়ের অশ্রুসিক্ত আর্তনাদ, "আমার ছেলের জীবনডারে কেউ ভিক্ষা দাও, আহারে আমার নিমাইরে এমনভাবে গুলি করছে যে মাথার মগজ ও খুলি উড়ে গেছে। কোন পাষণ্ড আমার ছেলেরে গুলি করছে, তার কি একটু বুক কাঁপল না। পোলারে কত জায়গায় খুঁজছি, কেউ বলতে পারেনি কই আছে, থানায় গেছি, এই হাসপাতাল থেকে ওই হাসপাতালে ঘুরছি, কোথাও পাইনি। ১২ দিন পর জানছি, আমার ছেলেরে বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে দাফন করছে, আমার মানিক চানরে কই দাফন করছে তাও জানি না, কবরে দাঁড়াইয়া যে ফয়সাল বইল্যা ডাক দেমু, তাও পারমু না, আরে ফয়সালরে তুই কই গিয়া শুইয়া আছত।" এভাবেই আহাজারি করতে করতে বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন মমতাময়ী মা। কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় রাজধানীর আবদুল্লাহপুরে মাথায় গুলিবিদ্ধ শহীদ ফয়সাল সরকারের মৃত্যু ও কবর সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য নেই। কিন্তু শহীদ ফয়সাল আহত হন ১৯ জুলাই। আহত হওয়ার ১২ দিন পর জানতে পারে ফয়সালকে গণকবর দেয়া হয়।

প্রতিবেশীর বক্তব্য

শহীদ ফয়সাল একজন ভদ্র ছেলে ছিল। সে আন্দোলনে নামাজ পড়ে অংশগ্রহণ করতো। বাড়িতে সকলের সাথে মিলেমিশে থাকত। সে কঠোর পরিশ্রমী ও অমায়িক ছেলে ছিল।

পারিবারিক আর্থিক অবস্থা

শহীদ ফয়সাল একজন মেধাবী শিক্ষার্থী। সে নিজেই ছিলো পরিবারের একমাত্র জীবিকার অবলম্বন। সে পড়াশোনার পাশাপাশি শ্যামলী গাড়িতে সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করতো। এখন পরিবারের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি আর নাই। বর্তমানে তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই করুণ। পরিবার চালানোর মতো সম্বল হিসেবে আছে কিছু ভিটা-জমি।

জানাযা ও দাফন

শহীদ ফয়সাল সরকারকে বেওয়ারিশ হিসেবে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামে গণ কবর দেওয়া হয়।

এক নজরে শহীদ শাহাদাত মোঃ ফয়সাল সরকার

নাম	: মোঃ ফয়সাল সরকার
পেশা	: শ্যামলী গাড়িতে সুপারভাইজার
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৫-১১-১৯৯৯ ও ২৫ বছর (প্রায়)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রামঃ কাচিসাইর, ডাকঘরঃ ধামতী, উপজেলাঃ দেবিদ্বার, জেলাঃ কুমিল্লা
পিতা	: সফিকুল ইসলাম সরকার
মাতা	: হাজেরা বেগম
বিশেষ তথ্য	: শহীদ ফয়সাল আহত হন ১৯ জুলাই আহত হওয়ার ১২ দিন পর জানতে পারে ফয়সালকে গণকবর দেয়া হয়

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা
২. ছোট ভাইয়ের পড়াশুনার ব্যবস্থা করা
৩. একমাত্র উপার্জনক্ষম পুরুষের মৃত্যুতে অসহায় পরিবারের নিয়মিত খোঁজখবর রাখা

শহীদ হামিদুর রহমান মজুমদার

ক্রমিক : ৪৫৭

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০১৬

শহীদ পরিচিতি

হামিদুর রহমান ছিলেন সি এন এন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের একজন নিবেদিত কর্মী। তার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের অসংগতি দূর করা এবং মানুষের অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন তাকে আন্দোলনের মাঠে নিয়ে আসে, যেখানে তিনি সাহসিকতার সাথে নিজের বিশ্বাস রক্ষার জন্য লড়াই করেছেন।

পারিবারিক জীবন

হামিদুর রহমানের পিতা মো: ইকবাল মজুমদার সৌদিতে প্রবাসী হিসেবে কাজ করেন। তার মা কাজী শারমিন আক্তার গৃহিণী। শহীদের দুই ভাই রয়েছে।

রাজনৈতিক পরিচিতি

শহীদ হামিদ এর পরিবার বিএনপি করে। কুমিল্লায় তারা প্রভাবশালী বিএনপি পরিবার। হামিদের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা শামীম হাসান এলি।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা

হামিদুর রহমানের পরিবার আর্থিকভাবে মোটামুটি স্বচ্ছল। তার পিতা সৌদিতে কাজ করে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করেন, এবং তাদের নিজস্ব সম্পত্তি রয়েছে যা তাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। তবুও, শহীদের মৃত্যুর পর পরিবারটি মানসিকভাবে এবং আর্থিকভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। সহায়তার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে, বিশেষ করে শহীদের সন্তানদের শিক্ষা ও পরিবারের অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে।

শহীদ সম্পর্কে বিশেষ তথ্য

হামিদুর রহমানের শাহাদাত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। তার মৃত্যু আন্দোলনকারীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা এবং শক্তি এনে দেয়। শহীদের মৃত্যু দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অঙ্গনে গভীর প্রভাব ফেলে, এবং তাকে আন্দোলনের নায়ক হিসেবে স্মরণ করা হয়। তার আত্মত্যাগ আন্দোলনের গুরুত্ব এবং ন্যায়ের প্রতি জনগণের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করেছে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে জনগণ নানান অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমের নির্মম ভুক্তভোগী। এদেশের মুক্তিকামী জনতা সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে এহেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই সাথে হুংকার দিয়ে সংগ্রামী জনতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ছাত্রবৃন্দ। উপরন্তু গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সাক্ষী, দেশের ক্রান্তিকালে বরাবরই ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে। বাংলাদেশ নামক গাড়িটা যখন এমনভাবে ব্রেক ফেইল করলো আর বাংলাদেশী নামক যাত্রীরা যখন আতঙ্কিত; চারদিকে যখন কষ্ট, বেদনা, চিৎকার, আহাজারি আর নিশ্চিত ধ্বংসের সুস্পষ্ট লক্ষণ, তখন রাষ্ট্রযন্ত্রের এমন বর্বরতা তরুণ প্রতিবাদী সমাজ সচেতন হামিদুর রহমানের মনে আঁচড় কাটে। কেননা সবকিছু তো তার সামনেই ঘটছে। তিনি নিজের কানেই শুনছেন মানুষের নিদারুণ আর্তনাদ; ব্যথিত মনের হাহাকার। নিজের চোখে দেখছেন কিভাবে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে শাসক নামধারী শোষক গোষ্ঠী।

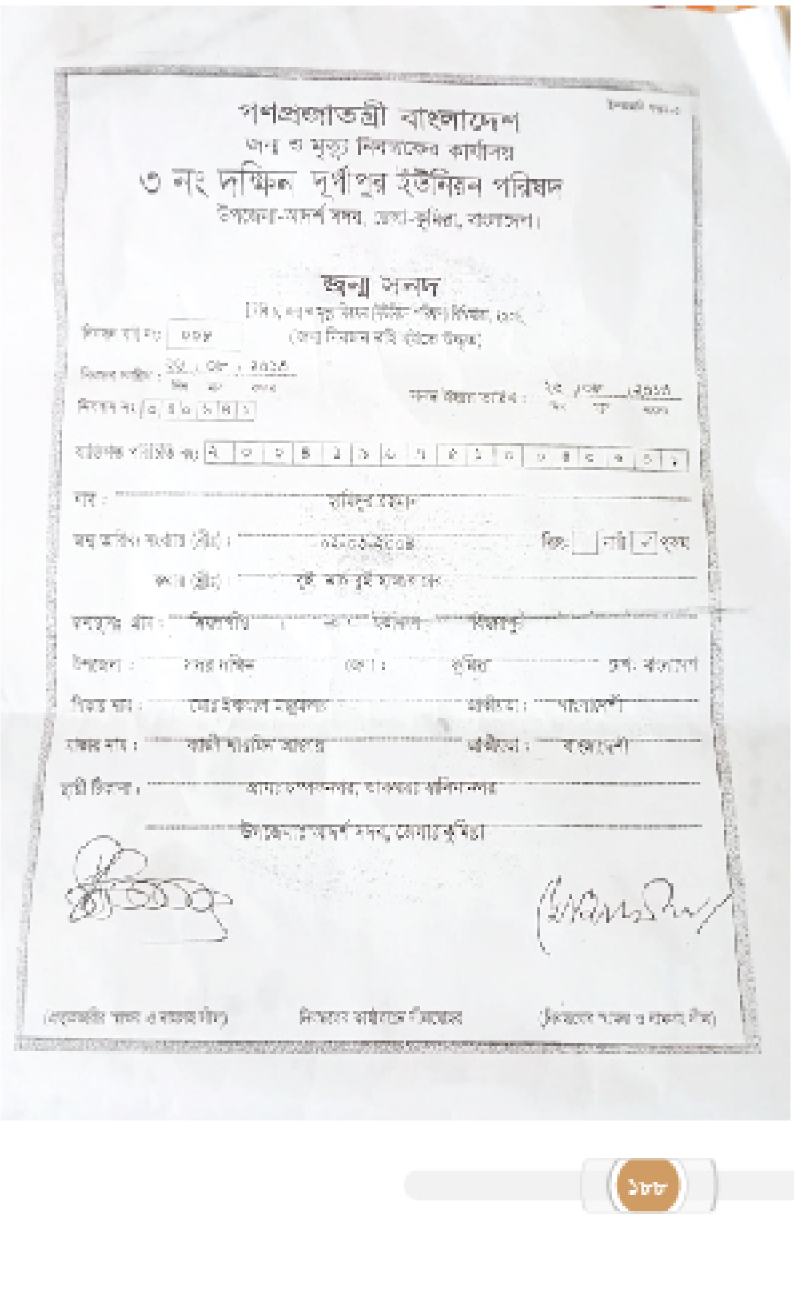

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

৩ নং দক্ষিণ দূর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদ

জন্ম সনদ

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতি, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গত ১ জুলাই থেকে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয়। আন্দোলনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ,পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি

সংঘর্ষে তার ওপর হঠাৎ গুলি ছোঁড়া হয়। বিকাল ৪টার দিকে এই ঘটনা ঘটে, যা তাকে গুরুতর আহত করে। সহকর্মীরা তাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যায়, কিন্তু চিকিৎসকরা এসে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার মৃত্যু আন্দোলনের সঙ্গী ও সমর্থকদের মধ্যে গভীর শোক ও ক্ষোভের জন্ম দেয়।

প্রেরণায় শহীদ হামিদুর রহমান

হামিদুর রহমানের আত্মত্যাগ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি শক্তিশালী প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তার সাহসিকতা, সংকল্প ও আত্মত্যাগ আন্দোলনকে নতুনভাবে উদ্দীপিত করেছে এবং জাতির মাঝে একতা ও শক্তির বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। হামিদুরের জীবন ও মৃত্যু আন্দোলনের একটি শক্তিশালী উদাহরণ হিসেবে কাজ করে, যা আগামী প্রজন্মের জন্য উৎসাহ এবং প্রেরণার উৎস।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

যেভাবে শহীদ হলেন

৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে হামিদুর রহমান কুমিল্লার বংশাল থানার সামনে অনুষ্ঠিত বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করছিলেন। এই সময়

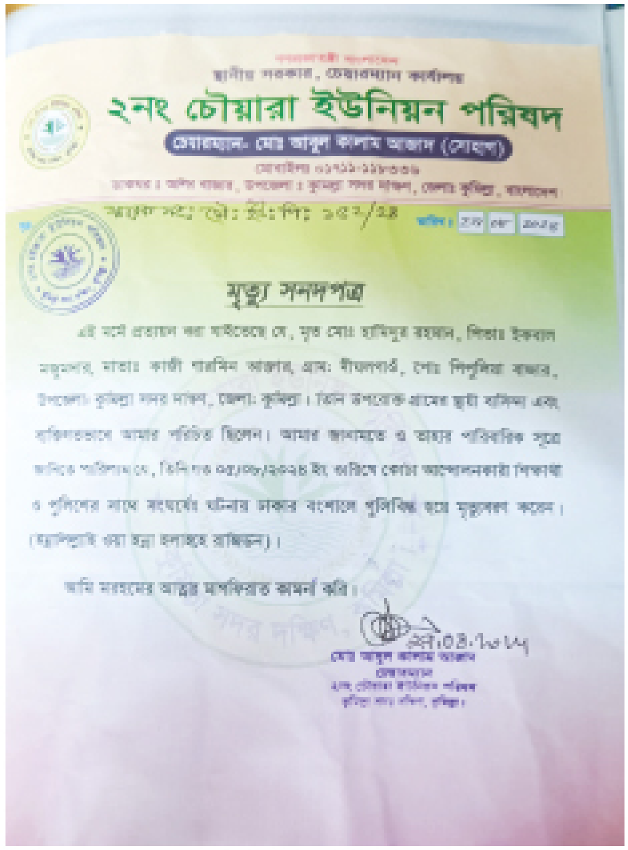

২নং চৌয়ারা ইউনিয়ন পরিষদ

চেয়ারম্যান- মোঃ আবুল কালাম আজাদ (সোহাগ)

মৃত্যু সনদপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মৃত মোঃ হামিদুর রহমান, পিতাঃ ইকবাল মজুমদার, মাতাঃ কাজী শারমিন আক্তার, গ্রাম: দীঘলগাঁও, পোঃ লিপুলিয়া বাজার, উপজেলাঃ কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, জেলাঃ কুমিল্লা। তিনি উপরোক্ত গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচিত ছিলেন। আমার জানামতে ও তাহার পারিবারিক সূত্রে জানিতে পারিলাম যে, তিনি গত ০৫/০৮/২০২৪ ইং তারিখে কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও পুলিশের সাথে সংঘর্ষের ঘটনায় ঢাকার বংশালে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)।

আমি মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
চেয়ারম্যান
২নং চৌয়ারা ইউনিয়ন পরিষদ
কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

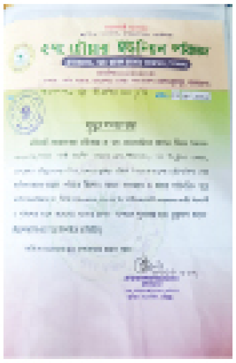

রূপসী বাংলা

বিজয় মিছিলে যোগ দিতে গিয়ে নিহত হয় সাদমান

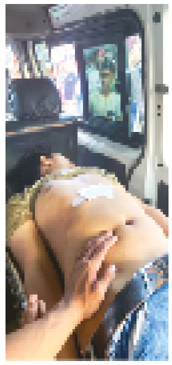

এক নজরে শহীদ হামিদুর রহমান সম্পর্কিত বিশেষ তথ্য

নাম	: হামিদুর রহমান
জন্ম	: ২ মার্চ ২০০৪
জন্মস্থান	: কুমিল্লা
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক পুলিশ বাহিনী
ঘটনার সময়	: বিকাল ৪টা
আহত হওয়ার ধরন	: বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণকালে গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
মৃত্যুর স্থান	: কুমিল্লার বংশাল থানার সামনে
চিকিৎসার পরিস্থিতি	: গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন
শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান	: সি এন এন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
পেশা	: ছাত্র
পিতা	: মো: ইকবাল মজুমদার (প্রবাসী)
মা	: কাজী শারমিন আক্তার (গৃহিণী)

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান

২. শহীদের ছোট ভাইয়ের পড়াশুনার বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর রাখা

শহীদ আল আমিন

ক্রমিক : ৪৫৮

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০১৭

শহীদ পরিচিতি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ আন্দোলনটি শিক্ষার্থীদের অধিকার ও সমাজের ন্যায়বিচারের জন্য সংঘটিত হয়। বাংলাদেশের সমাজে শিক্ষার্থীরা অনেক সময়ে অবিচার, বৈষম্য এবং সুযোগের অভাবে ভুগেছে। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা বারবার রাষ্ট্রের ক্ষমতাশালীদের সামনে দাঁড়িয়ে ন্যায়বিচারের জন্য তাদের দাবি উত্থাপন করেছে। এমন একটি আন্দোলনের সময় শহীদ হন আল আমিন, একজন নিরীহ, ধর্মপ্রাণ এবং শান্তিপ্রিয় যুবক, যিনি কোনো আড্ডা বা সংঘর্ষে জড়াতেন না। তার মৃত্যু শুধু তার পরিবারের নয়, পুরো জাতির হৃদয়ে গভীর শোকের দাগ কাটে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মূল প্রেক্ষাপট হলো শিক্ষার্থীদের ওপর চলমান বঞ্চনা এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ন্যায্য সুযোগের অভাব। সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থার অপ্রতুলতা, উচ্চশিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ না পাওয়া ইত্যাদি সবই এ আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। হাজারো শিক্ষার্থী বৈষম্যের শিকার হয়ে নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে হতাশায় ভুগছিল এবং তাদের এই হতাশা থেকে শুরু হয় এক বিশাল আন্দোলন, যা অল্প সময়ের স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে সমান অধিকার। বিশেষ করে সরকারি চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা দৃঢ়ভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করে। এর ফলে সরকার ও আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। একদিকে সরকারের প্রতিশ্রুতি ও অব্যবস্থাপনা আর অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের বঞ্চনা ও হতাশা। এ দুটি বিষয়ই এ আন্দোলনকে উস্কে দেয়। এই আন্দোলনের অন্যতম ট্র্যাজেডি হলো শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের আহত ও নিহত হওয়া। আন্দোলনকারীরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানালেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিপীড়ন ছিল অত্যন্ত নির্মম। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং পুরো জাতির মনে আন্দোলনের গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

শহীদ আল আমিনের পরিচিতি

আল আমিন ছিলেন কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার দৌলতপুর, মধ্যপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন এক সাধারণ যুবক, যিনি জীবিকার তাগিদে সাভারের রেডিও কলোনিতে বসবাস করতেন। গার্মেন্টস ট্রেডিং সেন্টারে কাজ করা এই যুবক ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং দায়িত্বশীল। আল আমিন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন এবং তার স্বপ্ন ছিল নিজের পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার পাশাপাশি নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা। তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ছিল সঙ্কটপূর্ণ। তার বাবা বাবুল মিয়া একটি পাখা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন, যার আয়ে পুরো পরিবারের চাহিদা মেটানো সম্ভব হতো না। তার বড় ভাই মুহসিন কাতারে প্রবাসী ছিলেন এবং তার পাঠানো অর্থেই মূলত পরিবারটি চলত। ছোট ভাই জহিরুল গ্যারেজে কাজ করতেন, তবে তার আয়ও খুব বেশি ছিল না। পরিবারটি একমাত্র তাদের ভিটামাটির ওপর নির্ভরশীল ছিল, যার বাইরে আর কোনো উল্লেখযোগ্য সম্পদ তাদের ছিল না। চার মাস আগে, আল আমিন শামিমা আকতার নূরীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রী শামিমা এখন ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষের ছাত্রী। আল আমিনের স্বপ্ন ছিল তার স্ত্রী এবং পরিবারের জন্য একটি সুখী জীবন গড়ে তোলা, কিন্তু সেই স্বপ্ন অকালেই থেমে যায়।

যেভাবে শহীদ হলেন

আল আমিনের মৃত্যু একটি নির্মম এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা। ১৯ জুলাই ২০২৪, আল আমিন প্রতিদিনের মতো নামাজ পড়ে বাসায় ফিরছিলেন। পথিমধ্যে আন্দোলনরত মুক্তিকামী ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে হঠাৎ ফ্যাসিস্ট সরকারের লেলিয়ে দেয়া ঘাতক পুলিশের গুলির শিকার হন তিনি। গুলি তার পিঠে লেগে সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়। পথচারীরা তাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে গেলেও সেখানে পৌঁছানোর পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর মাত্র এক ঘণ্টা তিনি জীবিত ছিলেন। শান্তিপূর্ণভাবে নামাজ পড়ে ফেরার পথে এমন নির্মম আক্রমণ তার পরিবার এবং এলাকাবাসীর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে দাঁড়ায়। তার মা মনোয়ারা বেগমের মতে, "আমার ছেলে কখনো কোনো ঝামেলায় জড়ায়নি। সবসময় নামাজ পড়তো এবং সবার প্রতি যত্নশীল ছিল সে।

পরিবার ও আত্মীয়দের কথা

আল আমিনের মৃত্যুতে তার পরিবার এবং আত্মীয়রা গভীর শোকাহত। তার মা মনোয়ারা বেগম বলেন, "আল আমিন ছিল আমার পরিবারের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সন্তান। সে পরিবারের সকলের খেয়াল রাখত, সবসময় আমাদের সান্ত্বনা দিত। তার এভাবে চলে যাওয়া আমাদের জন্য চরম কষ্টের।"

বন্ধু ইমরান বলেন, "আল আমিন আমাদের সবার মধ্যে সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় ছিল। সে কখনো কোনো ঝামেলায় যেত না। সবসময় নামাজ পড়ত, তার মতো ভালো মনের মানুষ কমই পাওয়া যায়।"

চাচা মো: এরশাদ বলেন, "আল আমিন এলাকাবাসীর প্রিয়পাত্র ছিল। এমন এক ভালো ছেলে হঠাৎ করে ঘাতক পুলিশের গুলিতে মারা যাবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

শহীদ পরিবারের আর্থিক অবস্থা

আল আমিনের পরিবার আর্থিকভাবে অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। তার বাবা বাবুল মিয়ার আয় অত্যন্ত কম, যা দিয়ে পরিবারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। বড় ভাই মুহসিন কাতারে কাজ করে কিছু অর্থ পাঠান, যা দিয়ে পরিবার কোনোভাবে টিকে আছে। ছোট ভাই জহিরুলের আয় খুবই সীমিত। পরিবারের কাছে একমাত্র সম্পদ হলো তাদের ভিটামাটি, এর বাইরে তাদের কোনো আর্থিক সহায়তা নেই। আল আমিনের মৃত্যুর পর পরিবারের অর্থনৈতিক সংকট আরও বেড়েছে এবং তারা এখন বেঁচে থাকার জন্য কঠিন লড়াই করছে।

শহীদ সম্পর্কে বিশেষ তথ্য

আল আমিন ছিলেন একজন অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়, সৎ ও ধর্মপ্রাণ যুবক। তিনি কখনো কোনো আড্ডায় বা ঝামেলায় জড়াতেন না। নিয়মিত নামাজ পড়া, পরিবারকে সহযোগিতা করা এবং সবার প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া ছিল তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শাহাদত বরন করার চার মাস পূর্বে শামিমা আক্তার নুরানী সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন শহীদ আল আমিন ।

শহীদ থেকে প্রেরণা

আল আমিনের জীবন আমাদের জন্য এক অনুপ্রেরণা। তার মতো একজন সৎ, শান্তিপ্রিয় এবং ধর্মপ্রাণ যুবক আমাদের শেখায়, ন্যায়বিচারের পথে চলতে হবে এবং কোনো পরিস্থিতিতেই অন্যায়কে মেনে নেওয়া উচিত নয়। শহীদ আল আমিনের এই মহান আত্মত্যাগ আমাদের সাহস যোগায়, আমাদেরও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এবং নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করার অনুপ্রেরণা দেয়।

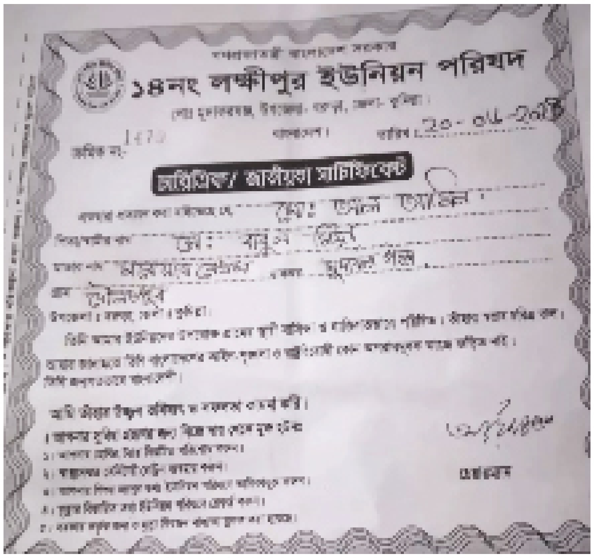

১৪নং লক্ষীপুর ইউনিয়ন পরিষদ

তারিখ: ২০-০৬-২০১৮

চারিত্রিক/ জাতীয়তা সার্টিফিকেট

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মোঃ আল আমিন

পিতা: মোঃ বাবুল মিয়া

নববধূকে ঘরে তোলার আগেই লাশ

এক নজরে শহীদ আল আমিন

নাম	: আল আমিন
পেশা	: গার্মেন্টেস ট্রেডিং সেন্টারে কাজ করতেন
স্থায়ী ঠিকানা	: দৌলতপুর, মধ্যপাড়া, লক্ষীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা
বর্তমান ঠিকানা	: রেডিও কলোনি, সাভার, ঢাকা
শিক্ষা	: উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন
বয়স	: ২২ বছর (প্রায়)
পরিবারের সদস্য	
বাবা	: বাবুল মিয়া (ফ্যাক্টরি কর্মী)
মা	: মনোয়ারা বেগম (গৃহিণী)
স্ত্রী	: শামিমা আকতার নূরী (ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষের ছাত্রী)
ভাই	: মুহসিন (কাতার প্রবাসী), জহিরুল (গ্যারেজে চাকরি)
বোন	: মাহমুদা আকার (গৃহিণী)
বিয়ে	: ৪ মাস আগে
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪
মৃত্যুর স্থান	: সাভার
মৃত্যুর ঘটনা	: নামাজ পড়ে বাসায় ফেরার পথে পুলিশের গুলিতে নিহত
পারিবারিক আর্থিক অবস্থা	: সংকটপূর্ণ, ভিটামাটি ছাড়া তেমন কোনো সম্পদ নেই
প্রস্তাবনা	১. শহীদ পরিবারকে এককালীনার্থিক অনুদান প্রদান করা ২. শহীদের স্ত্রীর যাবতীয় বিষয়ের নিয়মিত খোঁজখবর রাখা ৩. শহীদের বাবাকে একটি দোকান নিয়ে বসিয়ে দেয়া

শহীদ জামসেদুর রহমান জুয়েল

ক্রমিক : ৪৫৯

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০১৮

শহীদ পরিচিতি

নাম জামসেদুর রহমান। ডাকনাম জুয়েল। সবাই তাকে জুয়েল নামেই ডাকে। পিতার নাম শাহজালাল। তিনি একজন দিনমজুর কৃষক। মায়ের নাম সালেহা বেগম। তিনি একজন গৃহিনী। শহীদ জামসেদুর রহমান ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০২ সালে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার শিরনশাল ইউনিয়নের কেন্দনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হত দরিদ্র পরিবারে থেকে বেড়ে ওঠেন। তিনি ছোট বেলা থেকে তার নিজ গ্রামে বেড়ে উঠেন। গ্রামের সবুজ শ্যামল মায়াবী পরিবেশ তার চরিত্রের উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে। তিন ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট হওয়ায় সবার আদর সোহাগের কেন্দ্র বিন্দু ছিলেন তিনি। স্বভাব চরিত্রে যে কারো মন জয় করার মতো ছিলেন জুয়েল। তিনি পড়াশোনায় ও ছিলেন বেশ মনোযোগী।

শিক্ষা জীবন

শহীদ জামসেদুর রহমান জুয়েল এর পড়াশোনার হাতেখড়ি হয় তার নিজগ্রামে। গ্রামের প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শেষ করে ভর্তি হন ফেলনা উচ্চ বিদ্যালয়ে। এখান থেকে ২০১৯ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হন তিনি । ২০১৪ সালে চৌদ্দগ্রাম মডেল কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে জিপিএ ৪.৭৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। শাহাদাত বরণকালীন পর্যন্ত তিনি কুমিল্লা সরকারি কলেজের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের সম্মান ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত ছিলেন।

পটভূমি

২০১৮ সালে কোটা সংস্কারের জন্য চাকরি প্রত্যাশী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতৃত্বে ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভ এবং মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের লাগাতার আন্দোলনের ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে ৪৬ বছর ধরে চলা কোটাব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করে সরকার। ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরির কোটাব্যবস্থা বাতিল করে বাংলাদেশ সরকার একটি পরিপত্র জারি করে।

যেভাবে শহীদ হলেন

৫ আগস্ট ২০২৪ সাল। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিজয়ের দিন। এদিন এ জাতির দীর্ঘ ১৬ বছরের জগদ্দল পাথরের শোচনীয় অপসারণ ঘটে। সারাদেশে মানুষ দিনটি উদযাপনের জন্য অলিতে গলিতে নেমে আসে। কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম থানার সামনে বিকেল ৪ টায় বিজয় উদযাপন কালীন নিরীহ ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ অতর্কিত গুলিবর্ষণ করলে শহীদ জুয়েল গুলি বিদ্ধ হন। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তাকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক অবস্থা ভালো না দেখে দ্রুত কুমিল্লা মেডিকেলে রেফার করেন। কুমেক নেওয়ার পথেই দুনিয়ার সফর শেষ করে শহীদি কাফেলায় নাম লেখান শহীদ জামসেদুর রহমান জুয়েল।

কেমন আছে শহীদের পরিবার

শহীদ জামসেদুর রহমানকে হারিয়ে তার পরিবার এখন শোকে পাথর। মা তার ছোট ছেলেকে হারানোর ব্যাথা ভুলতেই পারছেনা। ছেলের কথা মনে পড়লেই কান্না জুড়িয়ে দেন আর বলেন, আমার ছেলেটা কি দোষ করছিল? তোমরা আমার ছেলেটাকে এনে দাও।

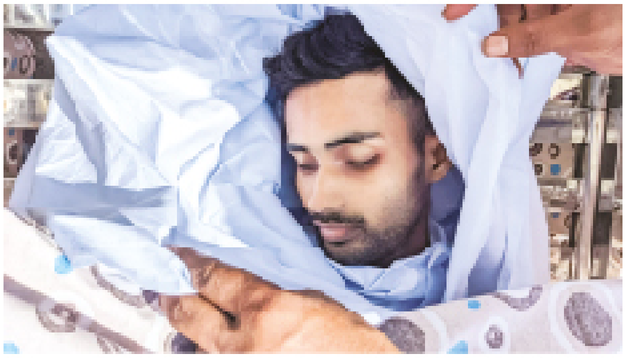

আমার ছেলে আমাকে মা ডাকেনা কতদিন। দিনমজুর কৃষক বাবা বলেন, ছেলেকে নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন ছিল। তারা আমার স্বপ্ন শেষ করে দিল। আমি আমার ছেলেকে যারা মেরেছে তাদের ফাঁসি চাই।

শহীদ সম্পর্কে ভাইয়ের অনুভূতি

ভাই জাহিদুর রহমান বলেন, আমার ভাই অত্যন্ত সহজ সরল একজন ছাত্র ছিল। সে সবসময় সত্যপন্থী ছিল। আন্দোলনের শুরু থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিল সে। পড়াশোনায় খুবই মনোযোগী ছিল। আমি আমার ভাই হত্যার বিচার চাই।

সাহসী তরুণ শহীদ জামসেদ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচিতে সাহসিকতার নজির স্থাপন করেন শহীদ জামসেদুর রহমান জুয়েল। কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম এলাকায় প্রতিদিনের কর্মসূচিতে দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। পুলিশ ও আওয়ামীলীগ এর সন্ত্রাসীদের

বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলেন । এলাকাবাসী তার এই সাহসী নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদের পিতা একজন দিনমজুর কৃষক। বড় ছেলে সৌদি প্রবাসী। পরেরজন পড়াশোনা শেষ করেছে। এখনো কোন চাকুরিতে যোগ দেয়নি। তাদের গ্রামে একটি টিনের বাড়ি ও অল্প ভিটাজমি আছে।

অর্থনৈতিকভাবে জুয়েলের পরিবার মধ্যবিত্ত। শহীদের পিতা একজন দিনমজুর কৃষক। ৩ ছেলে নিয়ে ৫ জনের পরিবার তার। বড় ছেলে বেকার। ছোট ছেলে সৌদি প্রবাসী। আর্থিকভাবে অত্যন্ত অসচ্ছল পরিবারটি। কোন রকম মানবেতর দিন পার করছে শহীদ জুয়েলের পরিবার।

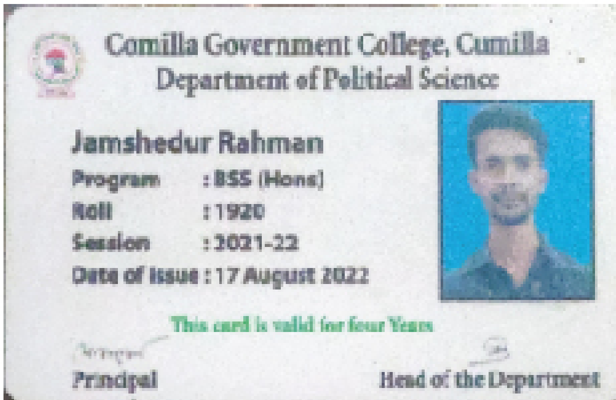
Comilla Government College, Cumilla
Department of Political Science

Jamshedur Rahman
Program : BSS (Hons)
Roll : 1920
Session : 2021-22
Date of Issue : 17 August 2022

This card is valid for four Years

Principal
Head of the Department

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: জামশেদুর রহমান
Name: JAMSHEDUR RAHMAN
পিতা: শাহ জালাল
মাতা: সালেহা বেগম
Date of Birth: 13 Sep 2002
ID NO: 7823896233

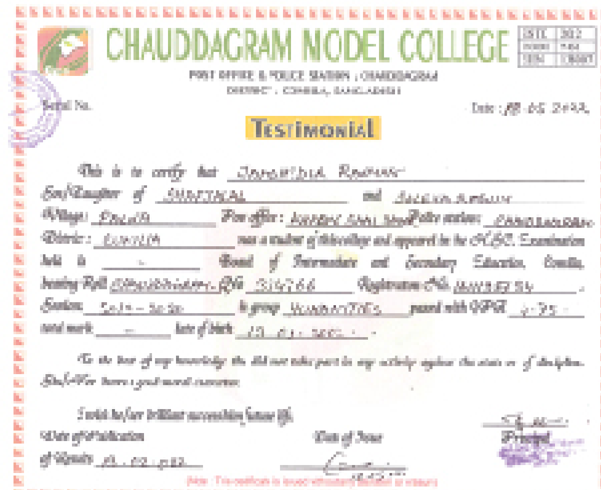
CHAUDDAGRAM MODEL COLLEGE

TESTIMONIAL

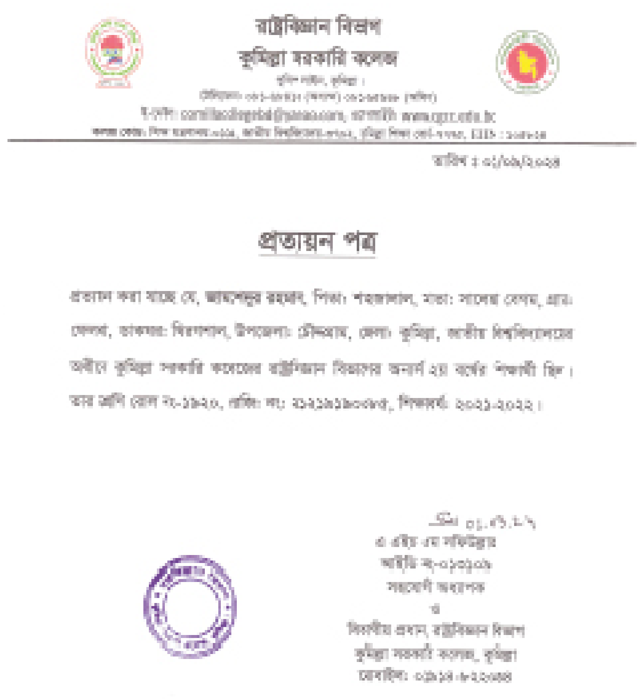
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
কুমিল্লা সরকারি কলেজ

প্রত্যয়ন পত্র

এক নজরে শহীদ জামসেদুর রহমান জুয়েল

নাম	: জামসেদুর রহমান জুয়েল
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০২ সাল, ২২ বছর
আহত হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪ সাল
নিহত হওয়ার তারিখ সময় ও স্থান	: ০৫ আগস্ট ২০২৪, চৌদ্দগ্রাম থানার সামনে
শাহাদাত বরণের স্থান	: চৌদ্দগ্রাম থানার সামনে
দাফন করা হয়	: নিজগ্রামে
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 23°13'14.1"N 91°16'59.8"E
স্থায়ী ঠিকানা	: পূর্ব পাড়া, ফেলনা, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা
পিতা	: শাহ জালাল
মাতা	: সালেহা বেগম
ভাইবোনের বিবরণ	: দুই ভাই। ছোটভাই সৌদি প্রবাসী। বড় ভাই বেকার
প্রস্তাবনা	১.বড় ভাইয়ের একটি ভালো চাকুরির ব্যবস্থা করা
	২.পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা

শহীদ মাসুদুর রহমান

ক্রমিক : ৪৬০

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০১৯

শহীদ পরিচিতি

কুমিল্লা জেলার বরুড়া পৌরসভার অর্জুনতলা গ্রামে ১৯৮৩ সালের ০১ জানুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন শহীদ হাফেজ মাসুদুর রহমান। বাবার নাম মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ। তিনি এখন স্থানীয় একটি মসজিদের ইমাম। মায়ের নাম আনোয়ারা বেগম, তিনি বয়সের কারণে অবসরে আছেন। শহীদ হাফেজ মাসুদুর রহমান ছোট বেলা থেকে গ্রামে বড় হন। এলাকাবাসীর সাথে ছোট বেলা থেকেই তার ভাল সখ্যতা ছিল। মা বাবা অনেক কষ্টে পড়ালেখা করিয়েছেন মাদরাসায়; যেন বড় আলেম হয়ে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারেন। তিনি আলেম হয়েছিলেনও। মানুষকে দ্বীনের দাওয়াতও দিয়েছেন কিন্তু বেশিদিন বাঁচতে দেয়নি নরখাদক হায়েনার দল স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার মদদপুষ্ট কলঙ্কিত প্রশাসন।

তিনি ঢাকার কাঁঠালবাগানের একটি হিফজ মাদরাসা থেকে পবিত্র কুরআন হিফজ করেণ এবং সর্বশেষ দাওরায়ে হাদিসের সমাপনী বর্ষে অধ্যয়নরত ছিলেন।

যেভাবে শাহাদাত বরণ করেন

১৯ জুলাই ২০২৪, জুমাবার। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বর্বরতম দিন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে এদিন দ্বিতীয় দিনের মত 'কমপ্লিট শাট ডাউন' কর্মসূচি চলছিল। আওয়ামী সরকার আন্দোলন দমানোর জন্য ইন্টারনেট বন্ধ করে নৃশংস গণহত্যা চালায় সারাদেশে। এদিন জুমার নামাজের পর বাড্ডা এলাকায় তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে ছাত্র জনতা। এতে যোগ দেয় সকল শ্রেণি পেশার মানুষ। বাড্ডা এলাকা মাদরাসাতুর রহমানিয়ার শিক্ষক মাসুদুর রহমান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ছাত্র জনতার সাথে। পুলিশ এতে সরাসরি গুলি চালায়। গুলিতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় অনেকে। গুলিবিদ্ধ হন তরুণ আলেম মাসুদুর রহমানও। পথচারীরা তাকে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এভাবে আল্লাহর জিম্মায় পাড়ি জমান তিন মেয়ের জনক শহীদ মাসুদুর রহমান।

কুরআনের দায়ী ছিলেন হাফেজ মাসুদুর রহমান

হাফেজ মাওলানা মাসুদুর রহমান ছিলেন কুরআনের একনিষ্ঠ দায়ী। তার সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত সবাইকে মুগ্ধ করতো। তিনি ঢাকার একটি মসজিদের ইমাম ও ছিলেন। এলাকায় আসলে ছোট বড় সবাইকে নামাজের দাওয়াত দিতেন। কুরআনের কথা শোনাতেন। তাঁর আলোচনা ছিল খুবই তথ্য নির্ভর এবং প্রতিবাদী। জালিমের জুলমের সব সময় সোচ্চার ছিলেন তিনি। প্রতিবেশী ফরহাদ বলেন, এই তরুণ আলেম মুসলিম উম্মাহর একজন সম্পদ ছিলেন। আওয়ামী হায়েনারা তাকে বাঁচতে দিলনা। এখন উম্মাহ এই তরুণ দায়ীর অভাববোধ করবে।

ক্ষতবিক্ষত পরিবার

মাসুদুর রহমানকে হারিয়ে তার পরিবার দৈন্যদশায় পতিত হয়েছে। তার তিন মেয়ে এখনো ভুলতে পারছেনা বাবার রক্তাক্ত দেহের দৃশ্য। তাদের চোখে মুখে এখনো আতংকের ছাপ রয়েছে। বাবার কথা মনে পড়লে কাঁদেন তার বৃদ্ধ মা। বাবা হয়ে যান বাকরুদ্ধ। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি শহীদ হওয়াতে পরিবারে চলছে অভাব অনটন। এখন সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে পরিবারটি। তার স্ত্রী তাসমিন আক্তার বলেন, "আমার হাজবেন্ড একজন আলেম ছিলেন। তার কি অপরাধ ছিলো। কেন তাকে হত্যা করা হলো? আমি এখন তিনজন মেয়ে নিয়ে কোথায় যাবো? আপনারা সবাই তার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে জান্নাতবাসী করেন।" তার মেঝো মেয়ে মাহবুবা বলেন, "আমার আব্বু আমাদেরকে অনেক ভালোবাসতেন। আমরা আব্বুকে মিস করি খুব। আব্বুকে খুব মনে পড়ে আমার। আজ কতদিন আব্বু আমাদের বাড়িতে আসেনা। আব্বুকে যারা মেরে ফেলেছে আমি তাদের ফাঁসি চাই।

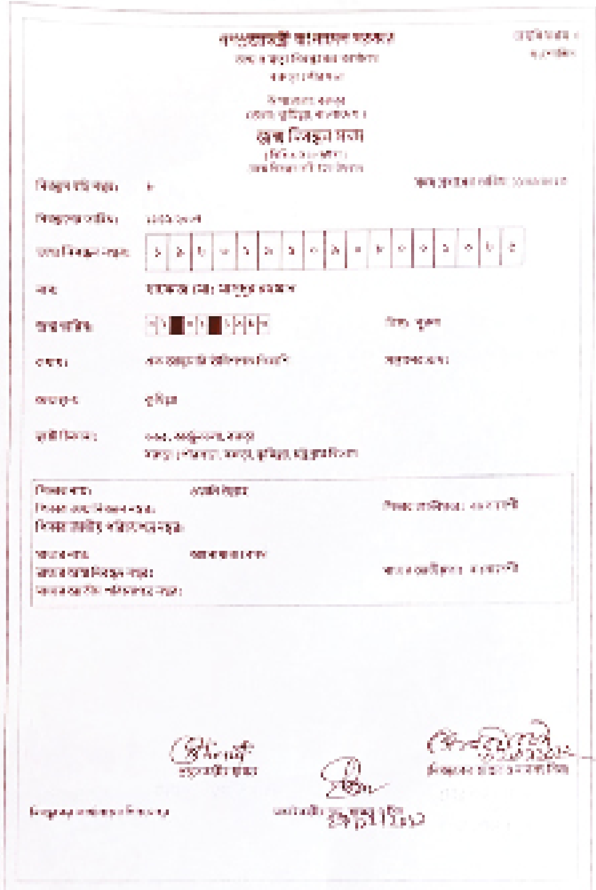

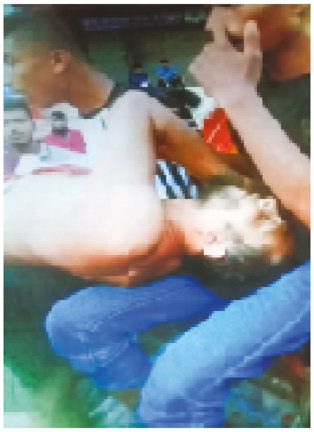

এক নজরে শহীদ মাসুদুর রহমান

নাম	: হাফেজ মাসুদুর রহমান
পেশা	: মাদরাসা শিক্ষক ও ইমাম
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০১-০১-১৯৮৩
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, জুমাবার
শাহাদাত বরণের স্থান	: বাড্ডা
দাফন করা হয়	: নিজগ্রামে
কবরের জিপিএস লোকেশন	: বন্যার কারণে পাওয়া যায়নি
স্থায়ী ঠিকানা	: অর্জুনতলা, বরুড়া পৌরসভা, কুমিল্লা
পিতা	: মাওলানা ওয়ালি উল্লাহ
মাতা	: আনোয়ারা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: একটি পাকা বাড়ি ও অল্প ভিটাজমি আছে
সন্তানাদি ও ভাই বোনের বিবরণ	: ভাই নাই। ৪ বোনের সবাই বিবাহিত। তিন মেয়ে এখন পড়াশোনা করে

সম্ভাব্য প্রস্তাবনা

১. তিন মেয়ের পড়াশোনার খরচ বহন করা

২. নিয়মিত আয় আসার জন্য দুটি সিএনজি কিনে ভাড়া দেওয়া যেতে পারে

সৈয়দ মুনতাসীর রহমান আলিফ

ক্রমিক : ৪৬১

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০২০

শহীদ পরিচিতি

২০০৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর দেওভান্ডার, কুমিল্লায় জন্মগ্রহন করেন আলিফ। ছোটবেলা থেকেই প্রচন্ড মেধাবী ছিলেন। একইসাথে ছিলেন ধার্মিক। আলিম পড়ছিলেন ঢাকার তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসায়। ছোটবেলা থেকেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সবার সাথে তার সুসম্পর্ক ছিলো। স্বপ্নপিপাসু আলিফ দেশ থেকে সকল অন্যায় অবিচার দূর করার মহান স্বপ্ন লালন করছিলেন। নিজের জীবন দিয়ে সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ করে দিয়ে গেলেন শহীদ আলিফ।

যেভাবে শহীদ হলেন

শহীদ আলিফ ছিলেন ইসলামি আন্দোলনের নিবেদিত কর্মী। বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রশিবিরের সাথী ছিলেন। শুরু থেকেই আন্দোলনে খুব সক্রিয় ছিলেন আলিফ। আন্দোলন চলাকালীন

যাত্রবাড়ী থেকে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকদিন নিখোঁজ থাকার পর ঢাকা মেডিকেল কলেজে তাঁর লাশের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁকে মাথায় গুলি করা হয়,এতে মাথার খুলি ফেটে গুলি ভেতরে ঢুকে যায় এবং বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত চিহ্ন পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, তিনি দেশের মুক্তির জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদ হন; থেমে যায় জীবনের পথচলা। যাওয়ার আগে আরেকবার স্বাধীন করে গেলেন স্বদেশকে।

ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ আলিফ

অল্প বয়সে সমর্থক হোন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের। এরপর থেকে নিয়মিত আন্দোলনের কাজে ছিলেন। নিজের সাংগঠনিক মানোন্নয়ন করেন ছাত্র শিবিরের 'সাথী' পর্যায়ে। তাঁর স্বপ্ন ছিলো এই আন্দোলন করতে গিয়ে একদিন শহীদ হবেন। আল্লাহ তায়ালা অবশেষে পূরণ করলেন তার স্বপ্ন। শহীদ হলেন অধিকার আদায়ের আন্দোলনে, মুক্তির আন্দোলনে। দেখিয়ে গেলেন কিভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ হুঙ্কার তুলে অকাতরে বিলিয়ে দিতে হয় প্রাণ।

দৈনিক ইত্তেফাকের রিপোর্ট : বয়স ১৫ হওয়ার আগেই ঝরে গেল ছেলেটা

'বেঁচে থাকলে সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখ ছেলেটার ১৫ বছর পূর্ণ হতো। কিন্তু তা হওয়ার আগেই ঝরে গেল ছেলেটা' কথাগুলো বলছিলেন ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহিদ হওয়া সৈয়দ মুনতাসির রহমান আলিফের বাবা সৈয়দ মো: গাজীউর রহমান।

তিনি বলেন, একমাত্র সন্তানকে হাফেজ করতে ছোটবেলায় মাদ্রাসায় দিয়েছিলাম। কোরআনে হাফেজ হতে পারেনি, কিন্তু মাদ্রাসা থেকে এ প্লাস পেয়ে দাখিল (এসএসসি) পাশ করে। আলিম প্রথম বর্ষের পরীক্ষার পর বললাম, 'চলো গ্রামের বাড়ি নাঙ্গলকোট ঘুরে আসি, কিন্তু ছেলে বলে, 'বাবা আমাকে কম্পিউটার আর ইংরেজি ভাষা শিখতে কোচিংয়ে ভর্তি করে দাও'। আমি ছেলের কথামতো ১০ হাজার টাকা দিয়ে কোচিংয়ে দুই বিষয়েই ভর্তি করিয়ে দিই। সেই কোচিং থেকে বন্ধুরা মিলে আন্দোলনে যাওয়া শুরু। ১৬ জুলাই রংপুরে আবু সাঈদসহ আরও অনেকে যখন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়, তারপর থেকে ছেলে চুপি চুপি আন্দোলনে যেত, আমরা জানতাম না। যখন জানলাম, ছেলে

আন্দোলনে যাচ্ছে, তখন আমি খুব শঙ্কিত ছিলাম। এত বাচ্চারা আহত-নিহত হচ্ছে, আমার একটাই ছেলে, 'ওর যদি কিছু হয়ে যায়'! সেই আশঙ্কা থেকে আন্দোলনে যেতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু আলিফের এক কথা–'মরে গেলে যাব, তবু আন্দোলনে যাব।

বড় ভাইদের প্রাণ যাচ্ছে, আমি ঘরে বসে থাকব না'।

আলিফ আন্দোলনে শেষ যায় ৫ আগস্ট। সেদিন ছেলেকে ঘরে তালা দিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু তার পরেও শেষ রক্ষা হলো না। ৫ আগস্ট যখন আলিফ আন্দোলনে গেল, দুপুরের পর জানলাম, শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু বিকাল হয়ে গেলেও আলিফ

বাসায় আসছিল না, ওর বন্ধুদের দু-এক জনকে ফোন করে জানতে চাইলাম, আলিফের কথা। বন্ধুরা জানালো, 'আঙ্কেল চিন্তা করবেন না, অনেকে তো আজ শাহবাগ, গণভবন গেছে, হয়তো আলিফও ওদিকে গেছে'। কিন্তু আমি বললাম, সব রাস্তা বন্ধ, ও শাহবাগ যাবে কী করে?

এরপর সন্ধ্যায় বিভিন্ন মসজিদ থেকে মাইকিং হচ্ছিল–যেখানে যেখানে লাশ পড়েছিল–'এত বছর বয়সের ছেলের লাশ পাওয়া গেছে'। আমি গেলাম দুই জায়গায়, দেখি আমার ছেলে নয়। এরপর স্থানীয় হাসপাতালে গেলাম, ওরা জানাল, মারাত্মক আহত যারা, তাদের আমরা ঢাকা মেডিকেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেখানে খোঁজ নিতে পারেন। ওর বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে রাত ১০টার দিকে ঢাকা মেডিক্যালের দিকে রওনা হই। কিন্তু সেদিন রাতে পথে পথে ব্যারিকেড আর গোলাগুলি চলছিল, তখন যাত্রাবাড়ী থানা লুট হয়ে গেছে, সড়কে ভয়াবহ অবস্থা। আমরা যখন ঢাকা মেডিক্যালে পৌঁছাই তখন রাত আনুমানিক ১২টা।

বাবা গাজীউর বলেন, আমার এক চাচাতো ভাই ঢাকা মেডিক্যালের ব্রাদার। ওকে ডেকে নিই। ঐদিন ঢাকা মেডিক্যালের গেট থেকে

ইমার্জেন্সি পর্যন্ত রক্ত আর রক্ত। মর্গের সামনে একটা ঘরে অসংখ্য লাশ স্তূপ করে রাখা। ঐ ঘরের মেঝেতে দাঁড়াতেই রক্তে পা ডুবে যায়। এর মধ্যে দেখি কারো মাথায় পতাকা বাঁধা, কারো শরীর পতাকায় ঢেকে দেওয়া। এর মধ্যে হঠাৎ চোখ যায়, লাশের স্তূপের ভেতর, একটা হাত দেখা যাচ্ছে। গায়ে কালো টি-শার্ট। আমি ঐ ঘরের দায়িত্বে থাকা লোকদের বলি লাশটা দেখাতে, কিন্তু তারা বলেন, আপনি কনফার্ম হলে আমরা দেখাব, তা না হলে দেখানো যাবে না। এত লাশ ওলটপালট করা যাবে না। আমি আরও কিছুক্ষণ দেখে নিশ্চিত হই এটাই আমার ছেলের লাশ হবে। ছেলে বাসায় ব্যায়াম করত, তার সুঠাম বাহু এবং সাদা পায়জামা ও কালো টি-শার্ট দেখে বলি 'আমি কনফার্ম'। আপনারা আমাকে মুখটা দেখান। ওরা বলে, মাথায় গুলি লাগা, এরপর ওরা আমার ছেলের লাশটা বের করে দেয়। কিন্তু লাশের গায়ে কোনো নম্বর বা অন্য কিছু ছিল না। ওরা বলে, ময়নাতদন্ত ছাড়া লাশ দেওয়া যাবে না। কিন্তু আমার চাচাতো ভাই বলার পর ওরা আমার ছেলের লাশ দেয়। অ্যাম্বুলেন্সের চালক বলেন, 'এত রক্তমাখা লাশ, ধুইয়ে নিয়ে যান, তা না হলে অনেকে গোসল দিতে চাইবে না'। তখন ছেলের লাশ সেগুনবাগিচায় কোয়ান্টামে নিয়ে যাই। ওরা গোসল দিয়ে কাপড় পরিয়ে 'ডেথ সার্টিফিকেট' চায়। ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়া তারা লাশ দেবে না। তখন তাদের বিষয়টি বুঝিয়ে বন্ডসই দিয়ে ছেলের লাশ নিয়ে আসি। যাত্রাবাড়ীর বাসায় যখন পৌঁছাই তখন ভোর ৪টা। সেখানে আলিফের মাকে নিয়ে আমরা ভোরেই গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার নাঙ্গলকোট চলে যাই। জোহরের নামাজের পর পারিবারিক কবরস্থানে ছেলেকে দাফন করি।

ছেলের দাবিগুলোর বাস্তবায়ন চান গুলিতে নিহত সৈয়দ মুনতাসিরের মা-বাবা

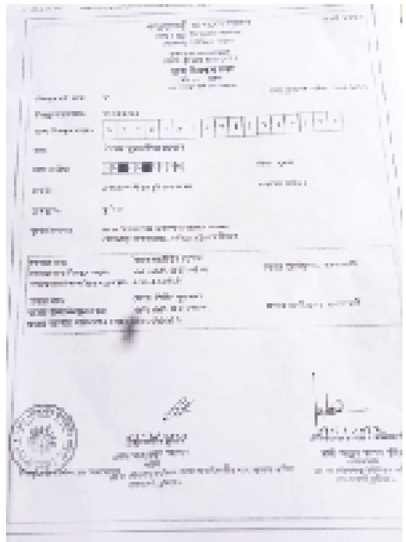

এক নজরে শহীদ সৈয়দ মুনতাসীর রহমান আলিফ

নাম	: সৈয়দ মুনতাসীর রহমান আলিফ
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১১/৯/২০০৯, ১৫ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার, আনুমানিক রাত ১০.৩০টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: যাত্রাবাড়ী
দাফন করা হয়	: গ্রামের বাড়ির কবরস্থান
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 23°04'47.9"N 91°11'35.
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দেওভাণ্ডার, থানা/উপজেলা: নাঙ্গলকোট, জেলা: কুমিল্লা
পিতা	: সৈয়দ গাজীউর রহমান
মাতা	: শিরিন সুলতানা
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে একটি সেমিপাকা বাড়ি আছে
ভাই বোনের বিবরণ	: বড় দুই ভাই ও এক বোন রয়েছে

শহীদ মাসুম মিয়া

ক্রমিক : ৪৬২

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০২১

শহীদ পরিচিতি

২০০৪ সালের ৪ মার্চ বাবা শাহিন মিয়া ও মা হোসনে আরার কোল আলোকিত করে জন্ম নেয় শহীদ মাসুম মিয়া। তারা দুই ভাই ও এক বোন। সে কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করে ও বেড়ে ওঠে। মাসুম একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করত।

যেভাবে শহীদ হলেন

৫ জুন ২০২৪ আদালত কর্তৃক বৈষম্যপূর্ণ কোটা প্রথা পুনর্বহাল হলে বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ এর প্রতিবাদে আন্দোলনে নামে। তারা সরকারের কাছে কোটা প্রথার যৌক্তিক সংস্কারের দাবি জানায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হওয়া এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলাদেশে। কিন্তু সরকার এতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে আন্দোলনকারীদের সাথে টালবাহানা করতে থাকে। আন্দোলন ক্রমেই জমতে শুরু করলে মানুষের মাঝে ক্রমশই সরকার বিরোধী ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে।

১৪ জুলাই শেখ হাসিনা চীন সফর শেষে সংবাদ সম্মেলনে চাটুকার সাংবাদিক প্রভাষ আমিনের এক প্রশ্নের জবাবে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের 'রাজাকারের নাতিপুতি' বলে গালি দেন। এর প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পরে ছাত্রসমাজ, ঢাবির বিভিন্ন হল থেকে শ্লোগান উঠে

তুমি কে? আমি কে? রাজাকার রাজাকার।

কে বলেছে ? কে বলেছে স্বৈরাচার স্বৈরাচার

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে এই শ্লোগান, দেশের প্রায় প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শ্লোগানে মিছিল চলে রাতভর। সেই রাতেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মিছিলে হামলা চালায় ছাত্রলীগ। পরদিন ১৫ তারিখ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম ছাত্রদের শেষ দেখিয়ে ছাড়বে বলে হুমকি দেয়, সেদিন দেশব্যাপী ছাত্রলীগ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের ভয়াবহ হামলায় সারাদেশে প্রায় ৩০০ এর বেশি ছাত্র আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়। পরদিন ১৬ জুলাই ছাত্রদের সমাবেশে পুলিশ কর্তৃক সর্বপ্রথম খুন হয় রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। দেশব্যাপী আরও পাঁচ জন শাহাদাৎ বরন করে। এরপর থেকেই ছাত্র আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। সর্বশেষ ৩ আগস্ট সরকার পতনের লক্ষ্যে এক দফার ডাক দেন সমন্বয়কগণ।

দিনটি ছিল ৪ আগস্ট ২০২৪। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে পুলিশের সাথে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ছাত্রদের গুলি করে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচিতে যাওয়ার জন্য মাসুম বের হয় আনুমানিক সকাল ১১ টায়। দুপুর ২টার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা সদর দক্ষিণ মডেল থানাধীন নন্দনপুর সাকিন কোটবাড়ি বিশ্বরোড পাকা রাস্তার ওপর শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি গ্রহন করছিল। বিকেল সোয়া ৪ টার দিকে সদর আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বাহাউদ্দিন বাহার ও তার মেয়ে সিটি মেয়র তাহসীন বাহার সূচনার হুকুমে আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালায় আওয়ামীলীগ। সন্ত্রাসীদের ছোড়া বুলেট বিদ্ধ করে মাসুম মিয়াকে (২০)। তার বামপায়ে পরপর দুটি গুলি লাগলে রাস্তায় বসে পড়েন মাসুম। আহত অবস্থায় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি কুপিয়ে ঘটনাস্থলেই তাকে হত্যা করে। এ সময় আরও অনেকে আহত হন।

সন্ধ্যায় বাড়ি না ফেরার কারণে পরিবারের সদস্যরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। এরপর খোঁজা খুঁজি করতে থাকে পরিবার। কিন্তু কোন খোঁজ মেলেনা মাসুমের। টানা ৪ দিন নিখোঁজ থাকার পর ৮ আগষ্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত একটি ছবি দেখে স্বজনরা তা মাসুম মিয়ার মরদেহ বলে শনাক্ত করেন।

কিন্তু ততোদিনে পরিচয়হীন মাসুম মিয়াকে বেওয়ারিশ হিসেবে দাফন করা হয়েছে।

পরবর্তীতে এ ঘটনায় ১৯ আগস্ট সদর আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আকম বাহাউদ্দীন বাহার ও তার মেয়ে সিটি মেয়র তাহসীন বাহার সূচনা সহ ৬২ জনের নাম উল্লেখ করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ সময় মামলায় আরও অন্তত ৪০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়।

নিকটাত্মীয়ের স্মৃতিতে শহিদ মাসুম

১. মাসুমের নিকটাত্মীয় আব্দুল্লাহ জানায় যে, মাসুম একজন সৎ ছেলে ছিল। সে পরিবারকে সবসময় সাপোর্ট করত।

২. মাসুমের বাবা শাহীন মিয়া বলেন, আমার ছেলে নিরপরাধ, তাকে কেন এভাবে হত্যা করা হলো। তার বাম পায়ে দুটি গুলি ও মাথার পেছনে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল। আমি আমার ছেলের খুনিদের কঠোর শাস্তি দাবি করছি।

মৃত্যুর পর মাসুমের পরিবারের অবস্থা

মাসুম তার পরিবারের আয়ের উৎস ছিল। তার বাবা একজন ড্রাইভার। তার ভাই এসি এর কাজ শিখে। মাসুম তার বাবার পাশাপাশি নিজে রেস্টুরেন্টে কাজ করে যা আয় করত তাতে তাদের সংসার কোন মতে চলে যেত। কিন্তু এখন মাসুমের মৃত্যুর

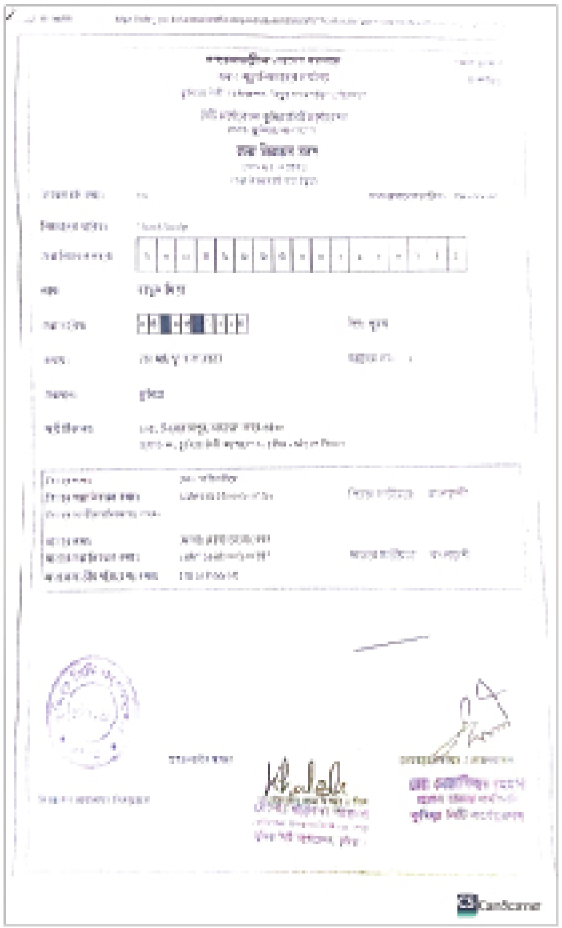

এক নজরে শহীদ মাসুম মিয়া

নাম	: মাসুম মিয়া
পেশা	: রেস্টুরেন্ট জব
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০৪-০৩-২০০৪; ২০ বছর
পিতা	: শাহিন মিয়া
মাতা	: হোসনে আরা
স্থায়ী ঠিকানা	: ১০৫, উত্তর রামপুর, আহাম্মদ নগর, কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা
আহত হওয়ার তারিখ	: ৪ আগস্ট ২০২৪
নিহত হওয়ার তারিখ	: ৪ আগস্ট ২০২৪
আক্রমণকারী	: আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী
আঘাতের ধরণ	: বাম পায়ে দুটি গুলি ও মাথার পেছনে ধারালো অস্ত্রের আঘাত
শাহাদাত বরণের স্থান	: কোর্ট বাড়ি বিশ্বরোড, কুমিল্লা
দাফন করা হয়	: কুমিল্লা
কবরের ঠিকানা	: 23°25'02.7"N 91°10'39.6"E
ভাইবোনের বিবরণ	: দুই ভাই এক বোন

প্রস্তাবনা

১. শহীদ মাসুমের পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান

২. শহীদের ছোট ভাইয়ের জন্য ভালো চাকুরির ব্যবস্থা করা

“আসছে ফাগুন দ্বিগুন নয়, ১৬ কোটি হবো”

শহীদ কাওসার মাহমুদ

ক্রমিক : ৪৬৩

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০২২

শহীদ পরিচিতি

চট্টগ্রামের বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী কাউসার মাহমুদ (২২)। গত ২ আগস্ট নগরের নিউমার্কেটে আন্দোলনের ছবি প্রোফাইলে দিয়ে লিখেছিলেন, 'আসছে ফাগুন দ্বিগুণ নয়, ১৬ কোটি হবো।' এটাই ছিল কাউসারের ফেসবুকে শেষ স্ট্যাটাস। দুদিন পর সেই নিউমার্কেটে পুলিশ ও ছাত্রলীগের হামলায় গুরুতর আহত হন তিনি। ৭০ দিন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকার পর দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন কাউসার। ১৩ অক্টোবর রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় কাউসার মাহমুদ মারা যান।

কাওসার মাহমুদের দুই ভাই ও এক বোন। বাবা আবদুল মোতালেব ব্যবসায়ী। কাউসারের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার ভাটরা ইউনিয়নে। আব্দুল মোতালেব নগরের চট্টগ্রাম কর্মাস কলেজ রোডে দীর্ঘদিন ধরে পরিবার নিয়ে থাকেন। মোগলটুলীতে তার মুদির দোকান রয়েছে।

নিউমার্কেটে কি ঘটেছিলো ৪ আগস্ট

গণঅভ্যুত্থানের একদিন আগে ৪ আগস্ট চট্টগ্রাম হয়ে উঠেছিল অগ্নিগর্ভ। আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সংগঠনগুলোর সশস্ত্র হামলায় আহত হন দুই শতাধিক ছাত্র-জনতা। যাদের অধিকাংশ ছিলেন গুলিবিদ্ধ।

পূর্বে ঘোষণা অনুযায়ী ৪ আগস্ট সকাল ১০টার আগেই নগরের নিউ মার্কেট এলাকায় অবস্থান নেয় বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নগরের সিটি কলেজ এলাকা থেকে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় শিক্ষাঙ্গনে পরিবেশ ধ্বংসকারী সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এসময় আন্দোলনকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরপর আন্দোলনকারীরা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে কদমতলী, কোতোয়ালি ও রেয়াজউদ্দিন বাজারের আশপাশে অবস্থান নিলে স্বৈরাচারী সরকারের বিতর্কিত পুলিশ বাহিনী তাদের ওপর গুলি, টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে।

অন্যদিকে পুলিশের হামলা থেকে বাঁচতে তিনটি সড়কে অবস্থান নেওয়া শিক্ষার্থীদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালায় ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতাকর্মীরা। এ সময় অধিকাংশ আন্দোলনকারী আহত হন।

ছাত্রলীগ-যুবলীগসহ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের অত্যাধুনিক একে-৪৭, শটগান, পিস্তল, লংরেঞ্জ রাইফেল, চাইনিজ কুড়াল, রাম-দাসহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের ওপর প্রকাশ্যে গুলি চালানো হয় নগরের কদমতলি, টাইগারপাস, সিআরবি, দেওয়ানহাট, এনায়েত বাজার, কাজীর দেউরী ও বহদ্দারহাটে। আন্দোলনকারীদের অনেককে ছুরিকাঘাত করা হয় প্রকাশ্যে।

কি ঘটেছিলো কাউসারের সঙ্গে

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের শুরু থেকেই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী কাউসার মাহমুদ। নগরের নিউ মার্কেট ও দেওয়ানহাট কেন্দ্রীক আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন তিনি। ৪ আগস্ট নিউ মার্কেটে ছাত্র-জনতার পূর্ব ঘোষিত আন্দোলনে অংশ নেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পুলিশ, ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়।

এসময় পুলিশের ছোঁড়া টিয়ারশেলের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন কাউসার। তখন ছাত্রলীগের বেধড়ক পিটুনিতে কিডনিতে আঘাত হয় তার। উল্লেখ্য যে, পরিবারের তথ্য মতে আগে থেকে কিডনী রোগে আক্রান্ত ছিলেন কাওসার মাহমুদ। পরদিন ৫ আগস্ট নগরের ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কাউসারকে। চিকিৎসকরা জানান গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত কাউসারের দুটি কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে। দুই সপ্তাহ ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন কাউসার। পরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে কাউসারকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) নিয়ে যাওয়া হয়। ৭০ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শাহাদাত বরণ করেন এ শিক্ষার্থী।

১৪ অক্টোবর সোমবার চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কাউসারের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। আব্দুর রহমান মাতব্বর জামে মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা শেষে মসজিদের পাশে লাশ দাফন করা হয়।

নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা বলে গিয়েছিলেন কাউসার। একটি বেসরকারি টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কাউসার বলেছেন, 'পুলিশের টিয়ারসেল খেয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। সেখানেই ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বাড়ি মারে। আব্বু-আম্মুকে কিছু না জানিয়ে ঘরে শুয়ে পড়ি। পরে আমার ব্যথা আর খিঁচুনি উঠে।'

পরিচিতজনের বক্তব্য

কাউসারের মৃত্যুর খবরে কাঁদছে বন্ধু-স্বজনরাসহ সবাই। ৯ আগস্ট ছিল কাউসারের ২২তম জন্মদিন। সেদিন ফেসবুকে জন্মদিনের কেক ও চিকিৎসাধীন কাউসারের ছবি পোস্ট করে কাউসারের ছোট ভাই সুলতান মাহমুদ লিখেন, হ্যাপি বার্থ ডে ভাইয়া। আজ দুই মাস ১০ দিন হয়ে গেলো ভালো করে কথা বলতে পারি না। তোর সঙ্গে একদিন ঝগড়া না করলে ভালো লাগে না। কিন্তু আজ কতদিন তোর সঙ্গে কথাই বলতে পারি না।

শহীদ কাউসারের বন্ধু তানজিম উদ্দিন লিখেন, আমাদের ৪১ ব্যাচের কাউসার মাহমুদ আল্লাহর জিম্মায় ফিরে গেলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আমার বন্ধুকে জান্নাত নসীব করুক। ২ বছরের ভার্সিটি লাইফে তোর সঙ্গে ছোট ছোট অনেক মেমোরি, ট্যুর, ইফতার, এক্সকারসন সব জায়গায় তুই ছিলি প্রাণবন্ত। মিস করবো তোকে।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

কাউসার মাহমুদ বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির বিবিএ বিভাগের চতুর্থ সেমিস্টারের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি ছিলেন তার পরিবারের বড় সন্তান। তার বাবা চট্টগ্রামের মোগলটুলি এলাকায় একটি মুদি দোকান করেন। পরিবার নিয়ে কমার্স কলেজ এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন। বাবা আবদুল মোত্তালেব মুদি দোকানের আয় থেকে তিন ছেলে ও এক মেয়েকে পড়ালেখা করান। আবদুল মোত্তালেব হার্টের রোগী। তার বাড়িতে ভাইদের সাথে যৌথ ঘর আছে। নিজস্ব কোন জমি নেই।

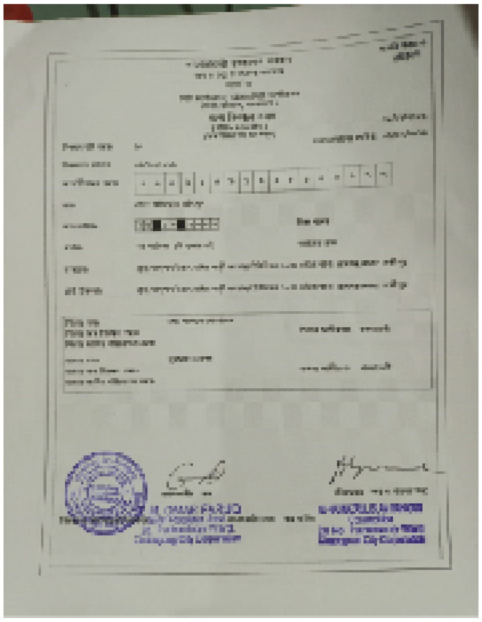

একনজরে শহীদ কাওসার মাহমুদ

নাম	: কাওসার মাহমুদ
পেশা	: ছাত্র
পিতা	: আবদুল মোতালেব
মাতা	: নুরজাহান বেগম
ভাই-বোন	: ১. সুলতান মাহমুদ নাঈম
	: ২. নাদিম মাহমুদ নাদিম, অষ্টম শ্রেণি, মদিনাতুল আউলিয়া মাদরাসা
	: ৩. জান্নাতুল মাওয়া নাদিয়া, প্রথম শ্রেণি, মদিনাতুল আউলিয়া মাদরাসা
স্থায়ী ঠিকানা	: ভাটারা ইউনিয়ন, রামগঞ্জ, লক্ষীপুর
আহত হওয়ার তারিখ	: ৪ আগস্ট, ২০২৪
নিহত হওয়ার তারিখ	: ১৩ অক্টোবর, ২০২৪, রবিবার
শাহাদাত বরণের স্থান	: সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা
আক্রমণকারী	: সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ও যুবলীগ
দাফন করা হয়	: আব্দুর রহমান মাতব্বর জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম

প্রস্তাবনা

১. এক ভাই ও এক বোনের লেখাপড়ায় সহযোগিতা করা

২. বাবাকে ব্যবসায়ে বা এককালীন সহযোগিতা করা

“আমার ছেলেটাকে এনে দে তোরা। আমি একটু আদর করতাম”

শহীদ মোহাম্মদ ইউসুফ

ক্রমিক : ৪৬৪

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০২৩

শহীদ পরিচিতি

কুমিল্লা জেলার শাকসাম উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের সবুজ শ্যামল সাতঘর গ্রাম। এই গ্রামে ১৯৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন শহীদ আবু ইউসুফ। তার বাবার নাম মো. শহীদ মিয়া। তিনি পরলোক গমন করেন দশ বছর আগে। মায়ের নাম মরিয়ম বেগম। শহীদ আবু ইউসুফ তার বাল্যকাল কাটান সাতঘর গ্রামে। সেখানেই তিনি অল্প পড়াশোনা করে কৈশোর, যৌবন পেরিয়ে জীবিকার তাগিদে ঢাকায় আসেন। শাহাদাত বরণকালীন পর্যন্ত তিনি একটি বইয়ের দোকানে চাকুরি করতেন।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই মাসে শহীদ মোহাম্মদ ইউসুফ তার সহকর্মীদের কাছে জানতে পারেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের কথা। আরও ৪ বছর আগে ২০১৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারন শিক্ষার্থীরা শুরু করেছিল কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সে বছর তারা স্বৈরাচার সরকারের হঠকারিতা ও একগুঁয়েমিতার কারণে সম্পূর্ণ খালি হাতে ঘরে ফিরতে বাধ্য হয়েছিলো। সাধারণ শিক্ষার্থীদের সেই আন্দোলন ২০২৪ সালে আবার ফিরে এসেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন নামে।

যৌক্তিক ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্যও যে এদেশে কত সংগ্রাম আর ত্যাগের প্রয়োজন হয় তা ছোট ছোট শিশুদের সাথে শহীদ ইউসুফও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

২০২৪ সালের জুন মাসে ছাত্ররা দেখলো আবারও তারা বৈষম্যের চেতনাবাদী সরকারের কুটচালের শিকার হচ্ছে। তাই জুলাইয়ের শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন থেকে রাজপথকেই তাদের দাবি আদায়ের শেষ ঠিকানা হিসেবে নির্ধারিন করলো, শহীদ ইউসুফ তখন থেকেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিয়মিত আন্দোলনের খোঁজ নিতে শুরু করলো।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে রাজপথে।

এর মধ্যে স্বৈরাচার আওয়ামী সরকার অস্ত্র হাতে তুলে নিলেন নিরস্ত্র সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে। ১৬ জুলাই আন্দোলনরত নিরীহ-নিরস্ত্র সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর নির্বিচারে গুলি করলো খুনি পুলিশ।

শহীদ হলেন রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৬ জন শিক্ষার্থী। এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠলো দেশের প্রতিটি সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। আন্দোলনের সাথে যোগ দিলো অনেক স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী। যোগ দিলেন শহীদ মোহাম্মদ ইউসুফও।

যেভাবে শহীদ হন তিনি

২০ জুলাই ২০২৪, শনিবার। ঢাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ডাকা তৃতীয় দিনের মত কর্মসূচি চলছিল। সরকার গণজোয়ার থামানোর জন্য কারফিউ জারি করে এদিন। ইন্টারনেট ব্ল্যাক আউট করে মানুষের উপর হামলা চালায় ঘাতক পুলিশ ও সন্ত্রাসী দল আওয়ামীলীগ। পুলিশের হামলা থেকে বাঁচতে পারেনি পথচারী, দোকানদার, ড্রাইভার এমনকি অ্যাম্বুলেন্সে থাকা রোগী ও রোগীর স্বজনরা। এরকম একটি নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হন শহীদ আবু ইউসুফ। তিনি ঐদিন তার ভাই খোকনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়ে বাসায় ফিরেছিলেন। পথিমধ্যে পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের সাথে সংঘর্ষের মাঝখানে পড়ে যান তারা। পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ে। একটি গুলি এসে বিদ্ধ করে শহীদ আবু ইউসুফকে। ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। পথচারীরা ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে শাহাদাতের সুধা পান করেন শহীদ আবু ইউসুফ। রেখে যান স্ত্রী, মা এবং এক মেয়েকে।

কেমন আছে শহীদের পরিবার

শহীদ আবু ইউসুফের পরিবারে এখন শোকের মাতম চলছে । পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। ইউসুফ তার ছোট পরিবার নিয়ে ঢাকা থাকতেন মা সহ। ছেলের কথা মনে পড়তেই এখন তার মা হাউ মাউ করে কান্না করেন আর বলেন, “আমার ছেলেটাকে এনে দে তোরা। আমি একটু আদর করতাম” তার একটি সাত বছর বয়সী মেয়ে আছে। সে শহীদ হওয়াতে পরিবারের হাল ধরার মত কেউ নাই। স্ত্রী রেহেনা বেগম তার একমাত্র মেয়েকে নিয়ে খুবই চিন্তিত। তিনি বলেন, “আমার এখন কিছুই নেই। আমি এখন দিশেহারা। কিভাবে খাবো, কিভাবে বাঁচবো বুঝতে পারছিনা। আমার মেয়েটারই বা কি হবে এখন?”

কর্তব্যপরায়ণ শহীদ আবু ইউসুফ

শহীদ আবু ইউসুফ ছিলেন খুবই কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিত্ব। পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববান ছিলেন তিনি। ভাইয়ের চিকিৎসার কাজে গিয়েই তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন, এ ব্যাপারে

প্রতিবেশী আব্দুল মজিদ বলেন, "অত্যন্ত সহজ সরল শহীদ আবু ইউসুফ ছিলেন পরিবারের প্রতি খুবই দায়িত্ববান। বেচারা ভাইয়ের চিকিৎসার কাজে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। আমরা এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।

এক নজরে শহীদ মোঃ ইউসুফ

নাম	: মোঃ ইউসুফ
পেশা	: বই বিক্রেতা
জন্ম তারিখ	: ০১-০২-১৯৮৪
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২০ জুলাই ২০২৪ শনিবার
শাহাদাত বরণের স্থান	: শনির আখড়া
দাফন করা হয়	: নিজ গ্রামে
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 23°13'03.5"N 91°04'42.8"E
স্থায়ী ঠিকানা	: সাতঘর, গোবিন্দপুর, লাকসাম, কুমিল্লা
পিতা	: মোঃ শহীদ মিয়া
মাতা	: মরিয়ম বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: একটি টিনের বাড়ি আছে। অল্প ভিটা জমি আছে
সন্তানের বিবরণ	: এক মেয়ে, ৭ বছর বয়স

প্রস্তাবনা

১. বাসস্থানের প্রয়োজন। আনুমানিক খরচ: ৫ লাখ টাকা
২. মেয়ের পড়াশোনার খরচ বহন করা
৩. পরিবারের জন্য একটি সিএনজি কিনে দেওয়া যেটা ভাড়া দিয়ে দৈনিক ১০০০ টাকা পাওয়া যাবে

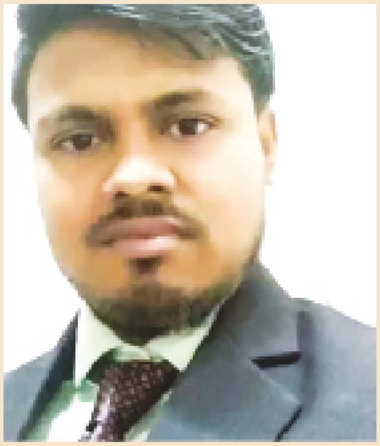

শহীদ মো: জহিরুল ইসলাম

ক্রমিক : ৪৬৫

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০২৪

শহীদ পরিচিতি

মোঃ জহিরুল ইসলাম ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি বাবা শাহ আলম ও মা মুর্শেদা বেগমের কোল আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন। কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বারে তার জন্ম ও বেড়ে উঠা। অভাবের সংসারে জীবিকার তাগিদে একটি দোকানের মার্কেটিং এর কাজ করতেন জহিরুল।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে জনগণ নানান অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমের নির্মম ভুক্তভোগী। এদেশের মুক্তিকামী জনতা সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে এহেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই সাথে হুংকার দিয়ে সংগ্রামী জনতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ছাত্রবৃন্দ। উপরন্তু গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সাক্ষী, দেশের ক্রান্তিকালে বরাবরই ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গত ১ জুলাই থেকে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয়। আন্দোলনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ পুলিশ ও RAB সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

যেভাবে শহীদ হলেন

মো: জহিরুল ইসলামের ঘটনাটি ৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখে গুলিস্তান, গোলাপশাহ প্রাইমারী স্কুলের সামনে ঘটেছিলো। তিনি সকাল ১১ টায় বাসা থেকে বের হন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিতে। আন্দোলন চলাকালীন পুলিশ এবং হেলমেট বাহিনী আক্রমণ করে, একজন পথচারী তার বাসায় ফোন করে জানান যে, মিটফোর্ট হাসপাতালে লাশ পাওয়া গেছে। পরে জানা যায়, মো: জহিরুল ইসলামের শরীরে একটি গুলি লেগেছে যা হাত দিয়ে প্রবেশ করে বগলের নিচ দিয়ে বের হয়েছে। এই ঘটনায় তার মৃত্যু নিশ্চিত হয়। ঘটনাটি ঘটেছে গুলিস্তান, গোলাপশাহ প্রাইমারী স্কুলের সামনে।

কেমন আছে জহিরুল ইসলামকে হারিয়ে তার পরিবার

মো: জহিরুল ইসলামের পরিবারের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত - শোচনীয়। পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী হিসেবে তার হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ার পর, পরিবারটির জীবন খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। তার পরিবারে স্ত্রী এবং দুই বছরের একটি মেয়ে রয়েছে। বর্তমানে, তাদের আর্থিক ও মানসিক অবস্থা সংকটাপন্ন, কারণ পরিবারের কোনো নিয়মিত আয় নেই এবং জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়াও কঠিন হচ্ছে।

শহীদ মো: জহিরুল ইসলামের পরিবার বর্তমানে একটি কঠিন অর্থনৈতিক অবস্থায় রয়েছে। পরিবারটি পুরুষশূন্য, অর্থাৎ পরিবারের কোনো উপার্জনক্ষম সদস্য নেই। বর্তমানে পরিবারে দুই বছরের একটি ছোট মেয়ে এবং তার মা রয়েছেন। তাদের ভিটামাটি আছে, তবে এটি আয়-উপার্জনের কোনো উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। অর্থাৎ, পরিবারের কোনো নিয়মিত আয় নেই।

কেমন আছে জহিরুলকে হারিয়ে তার মা

জহিরুল ইসলামের মা তার সন্তানের মৃত্যুতে অপ্রতিরোধ্য দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "আমার ছেলে জহিরুল ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ। তার চলে যাওয়া আমার হৃদয়কে ভেঙে দিয়েছে এবং জীবনকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছে।" তার মা আরো জানান, "জহিরুল ছিল একজন নিষ্ঠাবান ও ভালো মানুষ,সে সবসময় তার পরিবারের এবং সমাজের জন্য ভালো কিছু করার চেষ্টা করতেন। তার হাসি, সহানুভূতি ও পরিশ্রম আমাদের সবার কাছে অনুপ্রেরণা ছিল।

শহীদ সম্পর্কে প্রতিবেশী ও বন্ধুর বক্তব্য

মো: জহিরুল ইসলাম সম্পর্কে প্রতিবেশী ও বন্ধুরা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী এবং সমাজসেবায় মনোযোগী একজন ব্যক্তি। প্রতিবেশীরা জানান, তার মৃত্যু পুরো এলাকা এবং পরিবারকে স্তম্ভিত করেছে।

শহীদের বন্ধু বলেন, "জহিরুল ইসলামের মধ্যে সততা ও মানবিকতার একটি বিশেষ গুণ ছিল।" সহপাঠীরা উল্লেখ করেন যে, তিনি শিক্ষাগত এবং সামাজিক কর্মসূচিতে সবসময় সক্রিয় ছিলেন এবং সহপাঠীদের জন্য প্রেরণা স্বরূপ ছিলেন।

নিকটাত্মীয়রা শোক প্রকাশ করে জানান, তার মৃত্যু তাদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং তাকে হারানোর কষ্ট তারা অল্প সময়ের মধ্যে মেটাতে পারবে না।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Birth and Death Registrar
Birth Registration Certificate
Register No. 7
Name: MD ZAHIRUL ISLAM
Date of Birth: [redacted]
Sex: Male
Place of Birth: Cumilla
Father's Nationality: Bangladeshi
Mother's Nationality: Bangladeshi
(Signature and seal of the Registrar)

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: জহিরুল ইসলাম
পেশা	: মার্কেটিং
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০১ জানুয়ারি ১৯৯৮ , ২৬ বছর
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক পুলিশ
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৪ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: মিডফোর্ট হাসপাতাল
দাফন করা হয়	: নিজ এলাকায়
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 23°39'47.7"N 91°01'07.8"E
স্থায়ী ঠিকানা	: দেবিদ্বার, কুমিল্লা
পিতা	: মৃত শাহ আলম
মাতা	: মুর্শেদা বেগম
ভাইবোনের বিবরণ	: দুই বোন

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা

২. একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির বিয়োগান্তে পরিবারকে নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান করা

৩.সন্তানের ভবিষ্যতের সব ধরণের খরচ বহনের ব্যবস্থা করা পাকা বাড়ি করার ব্যবস্থা করা

শহীদ সোহাগ মিয়া

ক্রমিক: ৪৬৬

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০২৫

" দুনিয়ার সব মানুষ মুক্তির জন্য জীবন দিয়ে দিচ্ছে। আমি কেন স্বার্থপরের মতো ঘর বসে থাকবো? "

শহীদ পরিচিতি

২০০১ সালে এপ্রিল ৪ তারিখে কুমিল্লার দেবিদ্বারের সুর্যপুরে জন্মগ্রহণ করেন সোহাগ মিয়া। মো: আলী ও নাসিমা বেগমের বড় সন্তান সোহাগ মিয়া। মাত্র তিন বছর বয়সে বাবা হারান তিনি। মা কষ্ট করে মানুষ করেন সোহাগ মিয়াকে। মায়ের অপারেশনের খরচ যোগান দিতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে কাজে লেগে যান তিনি। একটি কুরিয়ার সার্ভিসে সাপ্লাইয়ারের কাজ নেন সোহাগ।

যেভাবে শহীদ হলেন

আন্দোলনের সময় ঢাকায় অবস্থান করছিলেন শহীদ মো: সোহাগ। তার মা তাকে আন্দোলনে যেতে নিষেধ করলে সে বলেও- মা, দুনিয়ার সব মানুষ মুক্তির জন্য জীবন দিয়ে দিতেছে। আমি কেন স্বার্থপরের মতো ঘরে বসে থাকবো।

কারফিউ চলাকালীন মা তার জন্য বিকাশে ৫০০ টাকা পাঠায়। সে টাকা তোলার জন্য রাস্তায় বের হলে পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলির সামনে পড়ে যায়। একটি ঘাতক বুলেট এসে বিদ্ধ হয় তার বুকে। মুহূর্তেই লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। লোকজন তাকে ঢামেকে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা দেয়। পরে লাশ আনতে গেলে তার মাকে পুলিশের হয়রানির শিকার হতে হয় নানাভাবে।

কেমন আছে তার পরিবার

শহীদ মো: সোহাগ তার এক ছোট ভাই ও মায়ের সাথে কুমিল্লায় থাকত। সে একটা কুরিয়ার সার্ভিসে সাপ্লাইয়ারের কাজ করে পরিবার চালাতো। ছোট ভাই প্রেসে কাজ করে, অল্প বেতন পায়। মায়ের অপারেশনের চিকিৎসার ব্যয় মেটাতে গিয়ে অল্প বয়সেই কাজে নামতে হয় তাকে। সোহাগের বাবা মারা যায় ১০ বছর বয়সে। তাদের দুই ভাইকে মা একাই মানুষ করেন। গ্রামে থাকার জন্য একটা বাড়ি করে, সে বাবদ ২ লক্ষ টাকা ঋণ আছে। বড় সন্তানকে হারিয়ে নাসিমা বেগমের অবস্থা খুবই শোচনীয়। ছোট ছেলের অল্প আয়ে পরিবার চালিয়ে ঋণ শোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বর্তমান আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ তাদের। শহীদ পরিবার মানবেতর জীবন যাপন করছে।

'আমার কলিজার টুকরো ছেলেটা কই, আমার নিমাই চাঁনরে গুলি করে মারল কে? আমার বুকটা খালি করল কারা? তাদের কী একটুও বুক কাঁপল না! আমার ছেলেরে কেউ আইন্না দাও, আমি জড়াই ধরি। না জানি আমার সোনার চানের কত কষ্টে দম গেছে, আহারে কোন পাষণ্ড আমার নিরীহ ছেলেরে গুলি করল, আমার চিকিৎসার খরচ আর কে দিবে। আল্লাহ, তুমি আমার বুক খালি করে কলিজার টুকরো ছেলেরে কীভাবে নিলা। আমার তো সব শেষ হয়ে গেছে।'

গণমাধ্যম কর্মীদের দেখে এভাবেই হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন ঢাকায় গুলিতে নিহত সোহাগের মা নাছিমা বেগম। গত ২০ জুলাই রাজধানীর গোপীবাগ এলাকায় সংঘর্ষ চলাকালীন রাত ৮ টার দিকে গুলিবিদ্ধ হন ২৪ বছরের সোহাগ।

মা নাছিমা বেগম ছেলে সোহাগের ছবি দেখিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ২২ বছর ধরে স্বামী নেই, সোহাগের যখন তিন বছর তখন আমার স্বামী ঢাকা থেকে নিখোঁজ হয়, আর ফিরে আসেনি। সে এখনও বেঁচে আছে না মরে গেছে আমরা কেউ জানি না। তবুও আমরা ধরে নিছি তিনি আর বেঁচে নেই। স্বামী নিখোঁজের পর সংসারের হাল ধরতে সোহাগ ও দেড় বছরের সহিদুল ইসলামকে নিয়ে ঢাকায় মানুষের বাসায় বাসায় কাজ করেছি। পাঁচ বছর আগে অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি গ্রামের বাড়িতে চলে আসি। সোহাগ লেখাপড়া বন্ধ করে সংসারের হাল ধরে। ছোট ছেলে সহিদুল মাদ্রাসায় চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। অভাব অনটনে তার লেখাপড়াও বন্ধ হয়ে যায়, সে এখন এক বাই বাঁধাই কোম্পানিতে কাজ করে।

তিনি চোখের পানি মুছেন আর বলেন, আমার চিকিৎসা ও সংসারের হাল ধরতে সোহাগ একটি কুরিয়ার সার্ভিস কোম্পানিতে ডেলিভারি ম্যান হিসেবে কাজ করত। গত ১০ থেকে ১২ দিন আগে তার চাকরিটা চলে যায়। পরে নতুন আরেকটি কোম্পানিতে চাকরির কথা হয়। ১৫ জুলাই বাড়িতে এসে কাগজপত্র নিয়ে নতুন কোম্পানিতে জমা দেয়। এরপর ৪ থেকে ৫ দিনের মধ্যে নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রোববার আমার ছেলের বুকে গুলি লাগে।

আমি এখন কী নিয়ে বাঁচব আক্ষেপ করে নাছিমা বেগম বলেন, আমার ছেলে শেষবার আমাকে ফোন করে বলেছিল, 'মা ঢাকায় অনেক গোলাগুলি হচ্ছে, অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে' - এ কথা শুনে আমার বুকে কেঁপে উঠে। আমি বলি, বাবারে তুই রুম থেকে বের হইস না। ছেলে বলে, 'না মা আমরা সব রুমমেট একসঙ্গে আছি, বের হইনি। তবে মা মেসে কোনো খাবার নেই, আমার কাছেও কোনো টাকা নেই, তুমি যদি পার আমার বিকাশে ৫০০ টাকা দিও। আর তুমি ঠিকমতো ওষুধগুলো খাইও।' পরে আমি আমার ছেলের নম্বরে ৫০০ টাকা পাঠাই। ওই টাকা নিয়ে সন্ধ্যায় নাশতা আনতে বের হয়। আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার কার কাছে চাইব। কেউ কি আমার ছেলেকে ফিরায় দিতে পারবে? বলেই হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন মা।

সোহাগের ছোট ভাই সহিদুল ইসলাম বলেন, ভাই গুলি খাওয়ার পর তার বন্ধুরা আমাকে ফোনে জানায়। আমি রাত ৩ টার দিকে ঢাকা মেডিকেলে পৌঁছাই, গিয়ে দেখি ভাইয়ের বুকে ব্যান্ডেজ করা। আমাকে দেখে ভাই বলে, তুই এত রাতে এখানে কেনো আসছিস। তুই মাকে দেখে রাখিস। এই কথা বলে রাত ৩ টা ১৫ মিনিটের দিকে ভাই মারা যায়। ভাই আমাদের সংসার চালাত। বাবা ও ভাই হারিয়ে আমরা আজ নিঃস্ব হয়ে গেলাম।

নিহত সোহাগের চাচা এখলাছুর রহমান শানিক বলেন, ২২ বছর আগে সোহগের বাবা হারিয়ে যাওয়ার পর তার মা বিভিন্ন বাসাবাড়িতে কাজ করে সন্তানদের বড় করেছেন। তার মা অসুস্থ হয়ে গেলে তার চিকিৎসার খরচ ও সংসারের হাল ধরে সোহাগ। নতুন একটি কোম্পানিতে চাকরির কথা চলছিল তার। দুই একদিনের মধ্যে সেখানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। সেটা আর হলো না। ছোটবেলা থেকে বাবার আদর পায়নি ছেলেটা, অভাব অনটনে বড় হইছে। একটা গুলি এই পরিবারটাকে একবারে পথে বসিয়ে দিল।

ভানী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী জালাল উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, ছেলেটা কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল না। সংসারটা সেই চালাত। ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে সে মারা যায়। এটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

দেবিদ্বার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিগার সুলতানা বলেন, এটি একটি মর্মান্তিক মৃত্যু। তার পুরো পরিবার সম্পর্কে আমি খোঁজখবর রাখছি। সরকারিভাবে সোহাগের মাকে সাহায্য সহযোগিতা করা হবে।

দৈনিক কালবেলা

আমার নিমাই চানরে কেউ আইন্যা দাও আমি জড়াই ধরি

আমার নিমাই চানরে

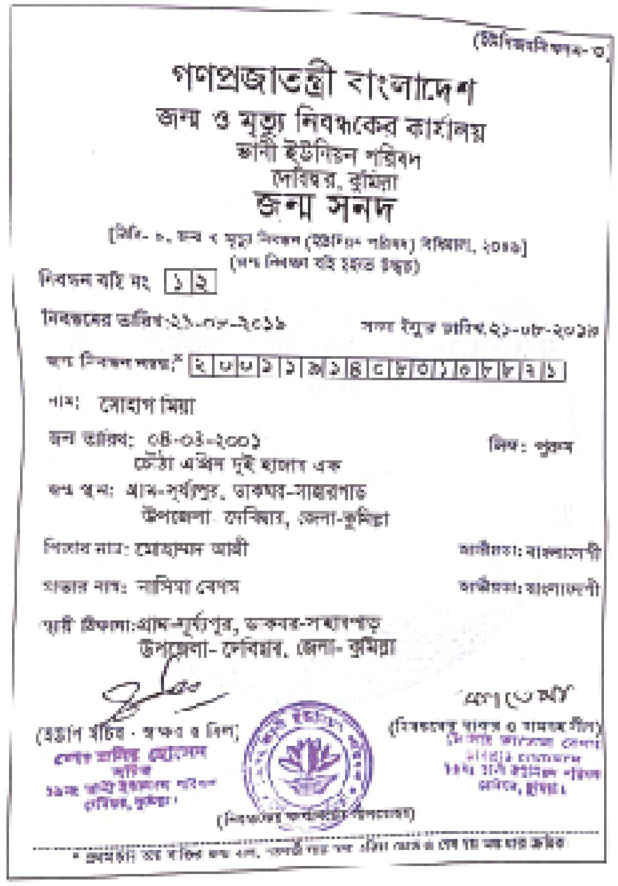
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
ভানী ইউনিয়ন পরিষদ
দেবিদ্বার, কুমিল্লা
জন্ম সনদ

নিবন্ধন বহি নং: ১২

নাম: সোহাগ মিয়া

জন্ম তারিখ: ০৪-০৪-২০০১
চৌঠা এপ্রিল দুই হাজার এক
লিঙ্গ: পুরুষ

জন্ম স্থান: গ্রাম-সূর্যপুর, ডাকঘর-সাহারপাড়
উপজেলা- দেবিদ্বার, জেলা-কুমিল্লা

পিতার নাম: মোহাম্মদ আলী
জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: নাসিমা বেগম
জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-সূর্যপুর, ডাকঘর-সাহারপাড়
উপজেলা- দেবিদ্বার, জেলা- কুমিল্লা

এক নজরে শহীদ সোহাগ মিয়া

নাম	: সোহাগ মিয়া
পেশা	: সাপ্লাইয়ার
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০৪/০৪/২০০১, ০৯ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২১ জুলাই ২০২৪, রবিবার, আনুমানিক বিকেল ৩ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: গোপীবাগ, ঢাকা
দাফন করা হয়	: সূর্যপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম:সূর্যপুর, থানা/উপজেলা: দেবিদ্বার, জেলা: কুমিল্লা
পিতা	: মো: আলী
মাতা	: নাসিমা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে অল্প জমি আছে
ভাইবোনের বিবরণ	: এক ভাই। সে প্রেসে কাজ করে
প্রস্তাবনা	: ছোটভাইকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়া
	: ঋণ শোধের ব্যবস্থা করে দেয়া
	: শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা
	: শহীদের মায়ের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

"আমার ছেলে ছিল আমার গর্ব। অল্প বয়সে সে আমাদের পরিবারের জন্য অনেক কিছু করেছে"

শহীদ হাছান হোসেন

ক্রমিক: ৪৬৭

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০২৬

শহীদ পরিচিতি

চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার তুলাতলী গ্রামের এক প্রতিভাবান তরুণের নাম হাছান হোসেন। ২০০৩ সালের ৩ জানুয়ারি জনাব কবির হোসেন ও হাশিমা বেগমের ঘর আলোকিত করে জন্ম নেন তিনি। নিজ গ্রামে প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর ভর্তি হন রহিমানগর শেখ মুজিবুর রহমান ডিগ্রি কলেজে। পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিতে যুক্ত ছিলেন শহীদ হাছান। ক্রিকেট খেলায় তুখোড় পারদর্শী ছিলেন তিনি।

'সে ছিল আমার পরিবারের আশা-ভরসা'

পরিবারের করুণ অবস্থা

শহীদ পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ। তাঁর বাবা কবির হোসেন পেশায় কৃষক ছিলেন। বর্তমানে পায়ের অপারেশনের কারণে কাজ করতে অক্ষম তিনি। যে কারণে পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শহীদ পরিবারের নিজস্ব জমি বলতে শুধু ভিটেমাটি রয়েছে। ভিটার আধাপাকা বাড়িটি চাচার অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে। নিজের লেখাপড়া ও পিতার চিকিৎসার জন্য একটি দোকানে কর্মচারী হিসাবে কাজ করতেন শহীদ হাছান। ফলে তাঁর আয়ে পরিবার কিছুটা স্বস্তি পেত। কিন্তু হাসানের মৃত্যুর পর সেই আয়ের উৎসও বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে পরিবারটিতে চরম আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায়, পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা যেমন বোনের শিক্ষার খরচ, বাবার চিকিৎসার খরচ এবং দৈনন্দিন জীবনের সংসারের খরচ যোগানে সহায়তা প্রয়োজন।

"এই ছেলে আমার অহংকার। তাকে আমি দেশের জন্য দিয়েছি"

আমার ছেলে আমার গর্ব

শহীদ হাছান হোসেন ছিলেন একজন অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ এবং দায়িত্বশীল ছেলে। তাঁর পরিবার এবং পরিচিতজনরা তাঁকে একজন শান্ত ও পরিশ্রমী তরুণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি পরিবারের আর্থিক সমস্যার কথা মাথায় রেখে পড়াশোনার পাশাপাশি দোকানে কাজ করতেন। শহীদ জননী হালিমা বেগম শোকাহত কণ্ঠে বলেন, "আমার ছেলে ছিল আমার গর্ব। অল্প বয়সে সে আমাদের পরিবারের জন্য অনেক কিছু করেছে। আমি তাকে দেশের জন্য হারিয়েছি, আমার সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। "তার বাবা কবির হোসেনও ছেলের জন্য গর্বিত হয়েছেন। তিনি বলেন, "এই ছেলে আমার অহংকার। তাকে আমি দেশের জন্য দিয়েছি। সে ছিল আমার পরিবারের আশা-ভরসা। "হাছান হোসেনের এই আত্মত্যাগ তাঁর পরিবারের জন্য যেমন শোকের, তেমনি বীরত্বের। শুধু গ্রামবাসী নয় আজ শহীদ হাছান হোসেনকে গোটা বাংলাদেশবাসী সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করে। পরিবারের সবাই একমত যে হাছান ছিলেন সবার প্রিয়। তাঁর মৃত্যুতে শুধু পরিবার নয়, পুরো সমাজ এক অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

'বেতন পাহাড় সম না হলেও স্বপ্ন দেখতেন গগন চুম্বী'

উপার্জনের যাপিত জীবন

শহীদ হাছান হোসেন পরিবারের দায়িত্ব নিতে রাজধানী শহরে আসেন। উদ্দেশ একটাই তা হলো চাকরি। কয়েকদিন যেতে না যেতে সে সোনার হরিণ হাতে ধরা দেয়। বাড্ডা এলাকায় একটি স্টেশনারি দোকানে কর্মচারী পদে নিযুক্ত হন হাছান। বেতন পাহাড় সম না হলেও স্বপ্ন দেখতেন গগন চুম্বী। বাড়িতে তিন বোন, অসুস্থ বাবা এবং সংসারের দায় দায়িত্ব নিজের উপর বর্তালে পরিশ্রম বাড়িয়ে দেয় হাছান। নিয়মিত আট ঘন্টার পাশাপাশি ওভার টাইম ডিউটি করতে হয় তাঁকে। যা দিয়ে সংসারের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা মিটতে শুরু করে। এভাবে চলতে থাকে দিনের পর দিন। ধীরেধীরে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হয়ে ওঠেন দেশপ্রেমিক হাছান। হঠাৎ সারাদেশে ছাত্র-জনতা তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসক খুনি হাসিনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচী ঘোষণা করে। যে কর্মসূচীতে যোগদান করেছিল শহীদ বীর তেজস্বী তরুণ হাছান হোসেন।

'বাবার দিকে খেয়াল রাখিস। আমি এক সপ্তাহ পর টাকা পাঠাব।'

শাহাদাতের দিন ও রাতের অগ্রভাগ

১৮ জুলাই ২০২৪, ঢাকার রামপুরা এলাকায় তৎকালীন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন মো: হাছান হোসেন। সেই আন্দোলনে কানাডিয়ান এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। যেখানে ছাত্র-জনতা এক হয়ে কোটাপদ্ধতি সংস্কারের জন্য শান্তিপূর্ণ দাবি দাওয়া পেশ করে। আন্দোলনকে রুখে দিতে অত্র এলাকার খুনি হাসিনার দোসর আওয়ামী যুবলীগের সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র হাতে নিয়ে মহড়া দিতে থাকে। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সাথে মিশে যায়। পরিচয় গোপন করে হামলা চালিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। একাধিক ছাত্র-জনতা অবস্থায় তাঁদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আন্দোলনকে দমন করতে হাসিনা দ্বিতীয় চাল চালে। র‍্যাবের মাধ্যমে একটি হেলিকপ্টার থেকে লাগাতার গুলি বর্ষণ করতে থাকে। হঠাৎ হাসানের মাথায় একটি গুলি এসে লাগে। রক্তাক্ত জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নেয়া হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয় শহীদকে। ১৯ জুলাই দিন-রাত হাছানের পরিবার আইসিইউ এর বাইরে থেকে দুশ্চিন্তা করতে থাকে। তার মমতাময়ী মা বারবার ছেলের জখম অবস্থা দেখে পেরেশানিতে ছটপট করতে থাকেন। ধীরেধীরে অবস্থার অবনতি হতে থাকে। ওয়েটিং রুমে আত্মীয়-স্বজনের কান্নার শোরগোল পড়ে যায়। ২০ জুলাই ২০২৪, রাত ৯:২০ মিনিট। হঠাৎ নার্স দৌড়ে এসে জানায়- পেশেন্ট হাছানের আত্মীয় কে আছেন? শহীদ জননী কাঁদতে কাঁদতে জবাব দেন- আমি তাঁর হতভাগা মা। নার্স বলেন-'আপনারা দোয়া দরুদ পড়তে থাকেন, রোগীর অবস্থা ভালো না।' তাঁর কিছুক্ষণ পর মহান আল্লাহর দরবারে পাড়ি জমান মহাবীর হাছান হোসেন। মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে সেকেন্ডারি ব্রেইন ইনজুরি উল্লেখ করা হয়। শহীদের মৃত্যুতে পরিবারের ওপর শোকের ছায়া নেমে আসে। আহত হওয়ার আগে সর্বশেষ বোনের সাথে কথা বলেছিলেন হাছান। তাঁকে জনিয়েছিলেন 'রাজধানীর অবস্থা সুবিধার না, যে কোন

মুহূর্তে কি জানি কি হয়ে যায়।' নিজের জন্য দোয়া করতে বলেছিলেন। আর বলেছিলেন- 'বাবার দিকে খেয়াল রাখিস। আমি এক সপ্তাহ পর টাকা পাঠাব।'

বিশেষ মন্তব্য

হাসানের এই বীরত্বপূর্ণ ত্যাগ পরিবার এবং সমাজের জন্য যেমন একটি বড় ক্ষতি, তেমনি তার সাহসিকতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বড় উদাহরণ হয়ে থাকবে।

Medical Certificate of Cause of Death

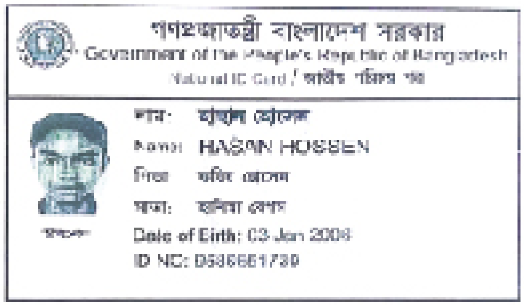

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: হাছান হোসেন
Name: HASAN HOSSEN
পিতা: কবির হোসেন
মাতা: হালিমা বেগম
Date of Birth: 03 Jan 2006
ID NO: [illegible]

একজনরে শহীদের তথ্যাবলি

নাম : হাছান হোসেন
জন্ম তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০০৬
বাড়ি : তুলাতলী, কচুয়া, চাঁদপুর
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : রহিমানগর শেখ মুজিবুর রহমান ডিগ্রি কলেজ
খেলাধুলা : দক্ষ ক্রিকেটার, বয়স: ১৮
শহীদ হওয়ার ঘটনা : ১৮ জুলাই ২০২৪, ঢাকার বাড্ডা এলাকায় আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মাথায় আঘাত পায় হাছান ২০ জুলাই ২০২৪, ঢাকা মেডিকেল কলেজে মারা যান তিনি

পরিবারের সদস্যরা
বাবা : কবির হোসেন (কৃষক, পায়ে অপারেশন হয়েছে)
মা : হালিমা বেগম
ভাই-বোন : জান্নাতুল ফিরদাউস (২০, বিবাহিত)
: লিমা আক্তার (১৮, শিক্ষার্থী)
: তাসফিয়া আক্তার (১৪, শিক্ষার্থী)

প্রস্তাবনা
১. শহীদ পিতাকে যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে। (মুদি দোকান)
২. ছোট বোনদের লেখা-পড়ার খরচ যোগানে সহযোগিতা করা যেতে পারে

‘আজাদ সরকার অনেক জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন’

শহীদ আজাদ সরকার

ক্রমিক : ৪৬৮

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০২৭

শহীদ পরিচিতি

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ পৌরসভার টোরাগড় গ্রামের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন আজাদ সরকার। তিনি তার জীবনের শেষ বয়সে এসে শহিদের মর্যাদা লাভ করতে পেরেছেন। এই গ্রামের মরহুম আবু মিয়া সরকার ও মরহুম শাহিনা রানী এর সন্তান ছিলেন আজাদ সরকার। শিশুকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা খুব কাছ থেকে যেমন দেখেছেন, ২০২৪ এ এসেও সেই বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতায় তার স্মৃতি রেখে যেতে পেরেছেন। নিজ গ্রামে তিনি সামাজিক কাজ করে বেড়াতেন। নিজের পকেটের টাকা ব্যয় করে মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করে গিয়েছেন জীবনভর।

গতানুগতিক ধারায় অল্প শিক্ষিত ছিলেন। শাহাদত বরণ করার পূর্বে বয়োবৃদ্ধ শহীদ আজাদ ৭ সদস্যের পরিবারের সাথে নিজ বাড়িতে একত্রে বসবাস করতেন। তাঁর বড় ছেলে রাজিব সরকার একজন কন্ট্রাক্টর। মেজ ছেলে মোস্তফা আহমেদ ও সেজ ছেলে আহমেদ কবির হিমেল দিনমজুর হিসেবে কাজ করেন। সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান আহমেদ কবির সামির এখনও ছাত্র। মোটামোটি সচ্ছলতার সাথেই দিনাতিপাত করেন শহীদ পরিবার।

'মিঠুকাজী ও তুষারকাজী নামে ২ জন চাপাতি দিয়ে আজাদ সরকারকে একেরপর কোপ দিতে থাকে'

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

পিশাচ দেখেছেন?
দেখেননি?
দেখেছেন, বোধহয় লক্ষ করেননি।
একজন জলজ্যান্ত মানুষকে কতগুলো মানুষরূপী দানব পিটিয়ে মেরে ফেলছে।
পৈশাচিক উল্লাসে মাতছে। দেখেননি?

মানুষের থেকে বড় কোন পরিচয় মানুষের থাকতে পারে না। একজন মানুষের নিজস্ব দর্শন থাকতে পারে। তা ভুল কি সঠিক সেটা আলাদা কথা। একজন ভয়ংকর খুনিও আইনের আশ্রয় পায়। নিম্ন আদালতের রায়ে সন্তুষ্ট না হলে উচ্চ আদালতে আপিলের সুযোগ পায়। অসুস্থ হলে সরকার তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অথচ সামান্য মতের অমিল হলে, ভিন্নমতাবলম্বী হলে, অভিযুক্ত মানুষটিকে সুযোগ পেলেই এই পিশাচগুলি পিটিয়ে মেরে ফেলে।

২০২৪ এর ছাত্র জনতার এই অভ্যুত্থানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরা বাংলাদেশে চলেছে নির্মম হত্যাকান্ড। নির্বিচারে মানুষ কে আহত নিহত করা সত্ত্বেও সর্বস্তরের মানুষ নিজ নিজ জায়গা থেকে এই আন্দোলন কে জিইয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। তার একটি দৃষ্টান্ত নজির দেখিয়ে গেছেন আজাদ সরকার। নিজে বৃদ্ধ মানুষ হয়েও গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি পানি দিতে গেলে নির্মম ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হন। তারই প্রতিবেশী মিঠুকাজী ও তুষারকাজী নামে ২ জন চাপাতি দিয়ে আজাদ সরকারকে অনবরত কোপ দিতে থাকে। এক পর্যায়ে এলাকার মানুষ তাকে কুমিল্লা মেডিক্যালে নিয়ে গেলে পরের দিন ০৫ আগস্ট আজাদ সরকার মৃত্যু বরণ করেন। শহীদ আজাদ সাহেব কল্পনাও করতে পারেনি যে তার সন্তানতুল্য ছেলেরা তাকে এভাবে কুপিয়ে হত্যা করবে! এভাবেই নিজ প্রতিবেশীদের হাতে অসহায় ভাবে জখম হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন!

'আজাদ সরকার নিজের পকেটের টাকা খরচ করে মানুষের উপকার করতেন'

শোকাহত এলাকাবাসী

সবার প্রিয় আজাদ সরকার নিজ প্রতিবেশীদের হাতে এভাবে নির্মম, নিপীড়ন, নির্যাতিত জখম হয়ে শাহাদাত বরণ করবেন কেও যেন বিশ্বাস করতে পারেনা। সন্তানতূল্য ছিল হত্যাকারীরা, একসাথে চলাফেরা ও উঠা বসা করা সত্ত্বেও শুধু মাত্র স্বৈরশাসক এর গোলামীর জের ধরে তাঁকে শেষ বয়সে এসেও এমন করুণ ভাবে হত্যা করা হবে তা এলাকা বাসীর কল্পনাতেও ছিল না। সবসময় মানুষের পাশে থাকতে সাহায্য করতেন। তাঁকে হারিয়ে এলাকাবাসী ভীষন ভাবে শোকাহত।

প্রতিবেশী শেখ ফরিদ মজুমদার বলেন 'আজাদ সরকার অনেক জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুযোগ পেলে সামাজিক ভাবে বিভিন্ন কাজেকর্মে সহযোগিতা করতেন। এলাকার সবাই তাকে সন্মান করত। আজাদ সরকার নিজের পকেটের টাকা খরচ করে মানুষের উপকার করতেন। কখনও কারও সাথে ঝগড়া বিবাদে জড়াতেন না। গ্রামবাসীর যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে এক বাক্যে বলবে- 'সর্বোপরি তিনি একজন ভালো মানুষ ছিলেন'

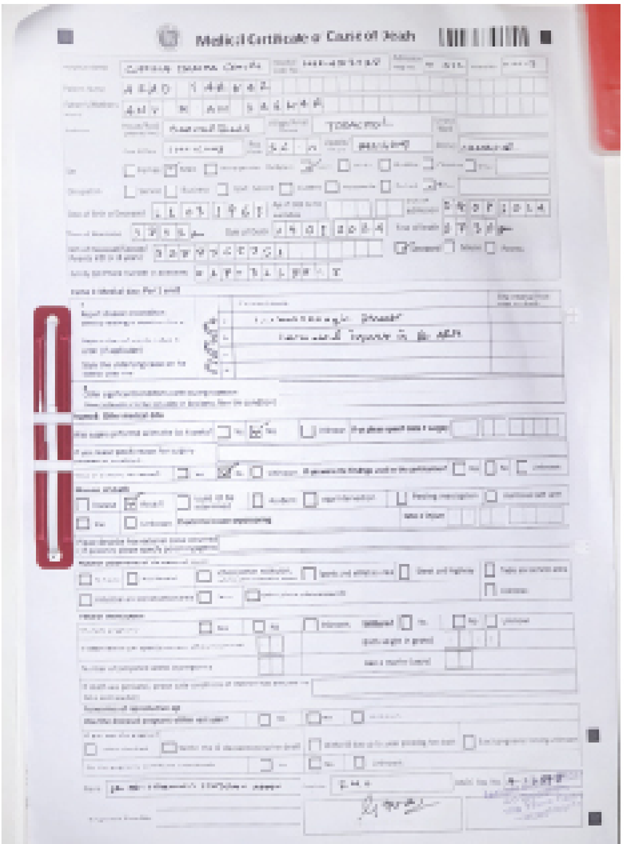
Medical Certificate of Cause of Death

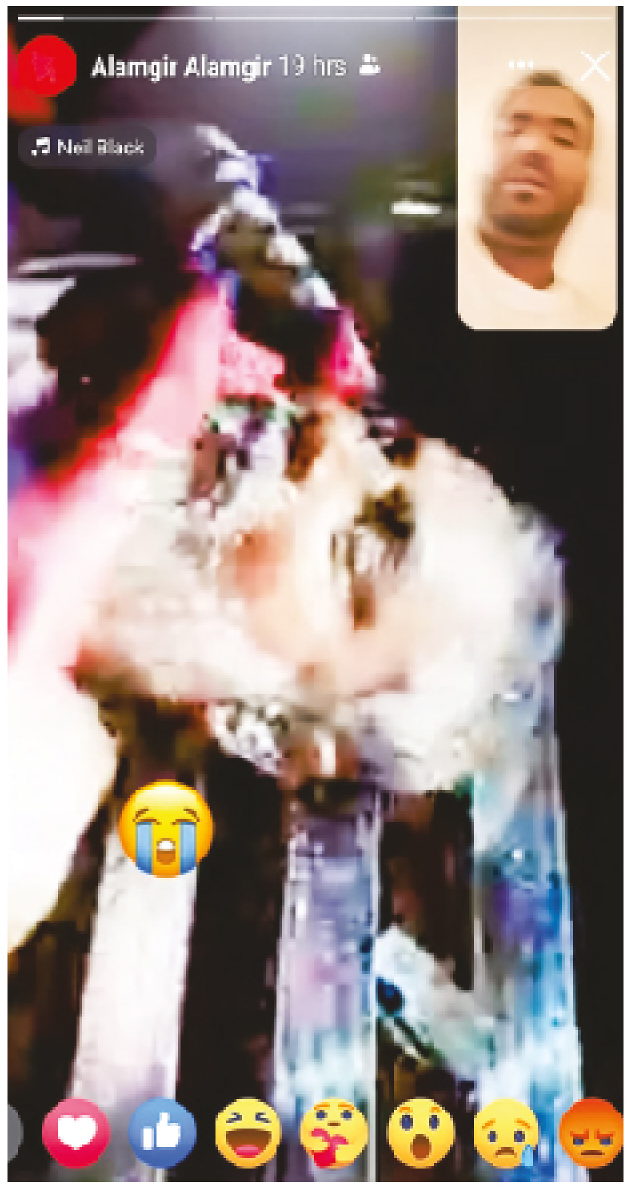

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: আজাদ সরকার
পেশা	: অবসর
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১১ মার্চ ১৯৬৫ , ৫৯ বছর
আহত হওয়ার তারিখ	: ০৪ আগস্ট ২০২৪, রবিবার, আনুমানিক দুপুর ১.৩০ টা
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার, সন্ধ্যা ০৭.০০ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ
দাফন করা হয়	: চাঁদপুর
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 23°15'15.3"N 90°51'53.9ÒE
স্থায়ী ঠিকানা	: সরকার বাড়ী, টোরাগড়, হাজীগঞ্জ পৌরসভা, চাঁদপুর
পিতা	: মৃত আনু মিয়া সরকার
মাতা	: শাহিনা রানী
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে ভিটাজমি আর একটি টিনের বাড়ি আছে
সন্তানাদির বিবরণ	: ০৪ ছেলে
	: ১. রাজিব সরকার, বয়স: ৩৪ , পেশা: কন্ট্রাক্টর, সম্পর্ক: ছেলে
	: ২. মোস্তফা আহমেদ, বয়স: ৩৪ , পেশা: দিনমজুর, সম্পর্ক: ছেলে
	: ৩. আহমেদ কবির রিমেল, বয়স: ২৪ , পেশা: দিনমজুর, সম্পর্ক: ছেলে
	: ৪. আহমেদ কবির সামির, বয়স: ১৮ , পেশা: ছাত্র, সম্পর্ক: ছেলে
প্রস্তাবনা	: ১. শহীদ সন্তানদের কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে
	: ২. শহীদ স্ত্রীকে মাসিক বা এককালীন সাহায্য করা যেতে পারে
	: ৩. শহীদের ছোট ছেলের লেখা পড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে

শহীদ মোঃ ইমন গাজী

ক্রমিক: ৪৬৯

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০২৮

শহীদ পরিচিতি

১৯৮৫ সালের ৪ মে চাঁদপুর জেলার সদর উপজেলার বাখরপুর গ্রামের গাজী বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন মো: ইমন গাজী। ফিরোজা বেগম ও হাজিল গাজীর প্রথম সন্তান তিনি। সংসার জুড়ে টানাপড়েন থাকায় খুব বেশিদূর লেখাপড়া করা হয়নি তাঁর। পরিবারের হাল ধরতে রাজধানী শহরে আসেন। একটি দোকান ভাড়া নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে হোটেল ব্যবসা শুরু করেন। পরিবারে ধীরেধীরে হাসি ফুটতে শুরু করে। কিছুদিন পর শান্তি বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সংসার পাতেন যাত্রাবাড়ী শহরের একটি ভাড়া বাসায়। একে একে তাঁদের ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয় ইফাদ হোসেন গাজী (৯), ইশা আক্তার (১২)ও ইকরা আক্তার (৪) নামে তিন সন্তান।

যেভাবে নিজেকে জাতির মুক্তির তরে সঁপে দিলেন

ঘটনার দিন ৫ আগস্ট ২০২৪ সকাল ৯.৩০ এর দিকে মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী বোনের বাসা থেকে বের হন ইমন। উদ্দেশ্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে যোগদান। কিছুক্ষণ পর ভেন্যুতে এসে উপস্থিত হন। লক্ষ্য করেন চারিদিকে খুনি হাসিনার পতনের দাবিতে গোটা যাত্রাবাড়ী তখন উত্তাল। স্লোগানে মুখরিত চারপাশ। ততক্ষণে মিছিল শুরু হয়েছে। মিছিলে নিজেকে যুক্ত করে স্বৈরাচার পতনের স্লোগান দিতে থাকেন তিনি। ক্রমান্বয়ে মিছিল সামনের দিকে অগ্রসর হয়। মিছিল রুখে দিতে শত্রুপক্ষ নরপিশাচ হাসিনার লেলিয়ে দেয়া ঘাতক পুলিশ বাহিনী ও রক্তখেকো আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী গণহারে গুলি চালায়। এলোপাথাড়ি সেই গুলিতে শত শত ছাত্র-জনতা সেদিন শাহাদাত বরণ করেন। একপর্যায়ে মিছিল যাত্রাবাড়ী থানার সামনে পৌঁছায়। মুহূর্তে গুলির মাত্রা বেড়ে যায়। যেন থানার ভিতর-বাহির থেকে

গুলি বৃষ্টি চালায় স্বৈরাচারের দোসররা। হঠাৎ একটি গুলি আচমকা ইমন গাজীর শরীরে এসে আঘাত হানে। গুলিবিদ্ধ হয়ে মুহূর্তে জ্ঞান হারান তিনি। পুলিশের রোষানলে পড়ে ছত্র ভঙ্গ হয় ছাত্র-জনতা। আহত অবস্থায় ঘটনাস্থলে পড়ে থাকেন কয়েক ঘণ্টা। দীর্ঘক্ষণ পর পথচারীরা জখম নিথর দেহকে ধরাধরি করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকেরা জানায় তিনি বেশ কিছুক্ষণ পূর্বে মহান আল্লাহর দরবারে পাড়ি জমিয়েছেন। শহীদের লাশ অজ্ঞাত ভাবে ফেলে রাখা হয়। হোটেল ব্যবসায়ি থাকায় অনেকেই তাঁকে চিনতো। একপর্যায়ে কয়েকজন তাঁকে চিনতে পারে। এমতাবস্থায় পরিবারকে খবর দেয়া হয়। ততক্ষণে সকাল, দুপুর, বিকাল গড়িয়ে গোধূলি লগ্ন। খবর পেয়ে ছুটে আসেন শহিদ স্ত্রী ও তাঁর সন্তানেরা। প্রিয় পাঠক, একটু চোখ বন্ধ করে উপলব্ধি করে দেখবেন কেমন ছিল সেই মর্মান্তিক মুহূর্তটি! কিভাবে শোকের মাতমে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়েছিল সেদিন। বিধবার আহাজারি, এতিম সন্তানদের আর্তনাদ, সন্তান হারা পিতা-মাতার তীব্র বুক ফাটা চিৎকারে চারপাশ যেন মৃত্যুপুরী হয়ে উঠেছিল সেদিন।

৫ আগস্ট ২০২৪, সামান্য হোটেল ব্যবসায়ি থেকে নিজের দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করে ইতিহাসের মহাবীর উপাধি লাভ করেছেন শহীদ ইমন হোসেন গাজী। বাবা-মা, স্ত্রী, ও অবুঝ সন্তানদেরকে রেখে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে একটুও বিলম্ব করেননি তিনি। প্রিয় জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে হলেও স্বৈরাচার পতনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন ইমন। রচনা করেছেন ইতিহাস। শাহাদতের শুধা পান করে চির নিদ্রায় শায়িত হয়েছেন তারই স্বাধীন করা প্রিয় বাংলাদেশে। যেন কবির ভাষায়- 'এই দেশের জন্য যদি করতে হয় আমার জীবন দান, তবু দেবনা দেবনা লুটাতে ধুলায় আমার দেশের সম্মান।'

স্বাধীনতার অমিয় আন্দোলন ও তার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে জনগণ নানান অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমের নির্মম ভুক্তভোগী। এদেশের মুক্তিকামী জনতা সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে এহেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার রুখে দাঁড়িয়েছে। বিগত ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতি, লুন্ঠন, রাহাজানি, ধর্ষণ, অন্যায়-অবিচার, জুলুম- নিপীড়ন, নির্যাতন, গ্রেফতার, গুম, খুন, অর্থ পাচার, বাক স্বাধীনতা হরণ, আইনের অপব্যবহার, করে জনমনে আতঙ্ক, ভয়-ভীতি তৈরি করেছিল। যে কারণে ছোট বড় সকল পর্যায়ের মানুষ বিরক্ত হয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে স্থায়ী হওয়ার চিন্তা করেছিল। স্বাধীন দেশে থাকলেও জনজীবন যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

একপর্যায়ে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গত ১ জুলাই ২০২৪ আন্দোলন শুরু করে দেশের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয়ে ওঠে। নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, র‍্যাব সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। ১৬ জুলাই রংপুরে আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা করে ঘাতক পুলিশ বাহিনী। তারপর থেকে আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে রূপ নেয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে পরিণত হয়।

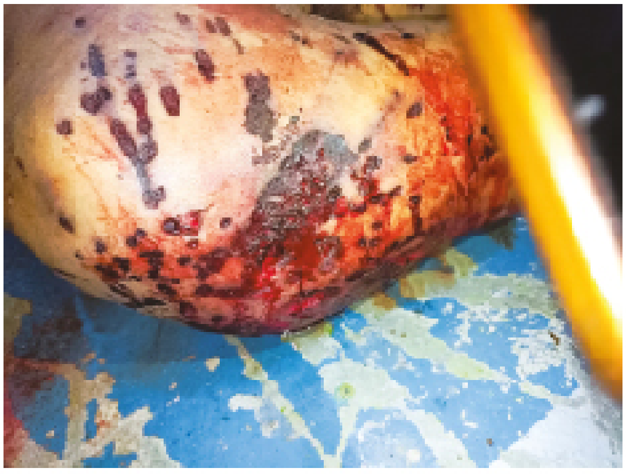

এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ধীরেধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হয়। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে নেমে আসেন। ক্ষুব্ধ জনতার বিপ্লবী তোপের মুখে পড়ে স্বৈরাচার সরকার প্রধান খুনি শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট ২০২৪ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

কেমন আছে শহীদ পরিবার

শহীদ ইমন হোসেন গাজী পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তার মৃত্যুতে পরিবারে সকল আয়ের পথ বন্ধ হয়েছে। শহীদের পৈতৃক বসতি বা আবাদি জমি নেই। সহোদরদের অবস্থাও তেমন সুবিধার নয়। এক ভাই রিক্সা চালিয়ে তার সংসারের হাল ধরেছেন। অপর ভাই স্বল্প পরিসরে ব্যবসা করেন। পর্যায়ক্রমে সন্তানদের কাছেই তাঁদের বসবাস। যে কারণে শহীদ পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ানোর তাঁদেরও সাধ্য নেই। ইমনের স্ত্রী কিভাবে ছোট ছোট সন্তানদেরকে নিয়ে বাকি জীবন পাড়ি দেবেন জানেননা। এতিম ছেলেমেয়ে গুলোর ভবিষ্যত এই মুহূর্তে অন্ধকারে ছেয়ে গেছে।

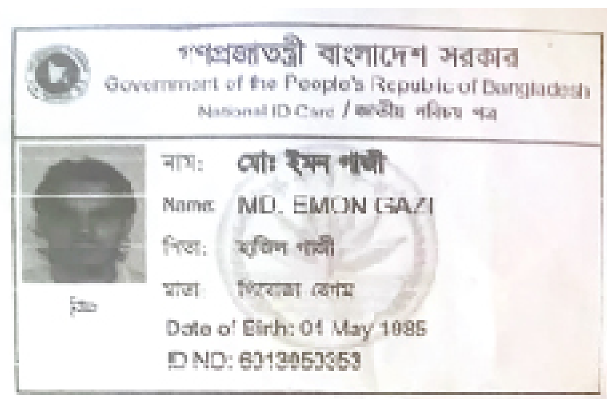

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ ইমন গাজী
Name: MD. EMON GAZI
পিতা: মুজিদ গাজী
মাতা: পিরোজা বেগম
Date of Birth: 01 May 1985
ID NO: 6013060353

কেমন ছিলেন শহীদ ইমন গাজী

শহীদ সম্পর্কে প্রতিবেশী আব্বাস বলেন- 'ইমন খুব ভালো মানুষ ছিলেন। তাঁর আচার আচরণে যে কেউ মুগ্ধ হতো। তাঁর রেখে যাওয়া এতিম শিশুগুলোর জন্য আমার মন কাঁদছে। কিভাবে এই সন্তানেরা মানুষ হবে? পরিবারের পাশে এসে কে দাঁড়াবে? কেন ইমনকে হত্যা করা হলো। আমি এর বিচার চাই।

এক নজরে শহীদ ইমন গাজী

নাম	: মো: ইমন গাজী
পেশা	: হোটেল ব্যবসায়ী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ৪ মে ১৯৮৫ , ৩৯ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪ , সোমবার , আনুমানিক সকাল ১০ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: যাত্রাবাড়ী থানা
দাফন করা হয়	: চন্দ্রা চৌরাস্তা , চাঁদপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: : বাকুরপুর , থানা/উপজেলা: চান্দ্রা , জেলা: চাঁদপুর
পিতা	: হাজিল গাজী
মাতা	: ফিরোজা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: কোনো সম্পদ নেই
সন্তানের বিবরণ	: ছোট ছোট দুইটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে রয়েছে

প্রস্তাবনা

১. শহীদের সন্তানদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে
২. শহীদ স্ত্রীকে স্থায়ী বাসস্থান করে দেয়া যেতে পারে
৩. শহীদ পরিবারে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে

‘আমি তাঁকে নিয়মিত মসজিদে নামাজ পড়তে দেখেছি’

শহীদ আবদুল কাদির

ক্রমিক: ৪৭০

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০২৯

শহীদ পরিচিতি

১৯৮৩ সালের ৪ মে চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জের মানিকরাজ গ্রামে পিতা নূর মোহাম্মদ ও মাতা ফাতেমা বেগমের কোল আলোকিত করে জন্ম নেন শহীদ আবদুল কাদির। অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়ে খুব বেশি পড়াশোনা করতে পারেননি তিনি। পরিবারের হাল ধরতে বাধ্য হয়ে ঢাকায় চলে আসেন কাদির। কাজ শুরু করেন একটি রড সিমেন্টের দোকানে। ধীরেধীরে উপার্জন বৃদ্ধি পায়। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর রাহিমা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের কোলজুড়ে জন্ম নেয় একটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে সন্তান। স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নিয়ে রাজধানীর উত্তরা এলাকায় সংসার পেতেছিলেন শহীদ আবদুল কাদির।

‘রাস্তা থেকে লাশ তুলে স্তূপ করা হয় থানার সামনে’

যেভাবে শহীদ হলেন

৫ আগস্ট ২০২৪ পদত্যাগ করে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই খবর মুহূর্তে দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সারা দেশ বিজয় মিছিলে ছেয়ে যায়। তারই ধারাবাহিকতায় উত্তরায় একটি বিজয় মিছিলে যোগ দেন আবদুল কাদির। মিছিল শেষে বাড়ি ফেরার পথে উত্তরা পশ্চিম থানার সামনে খুনি হাসিনার রেখে যাওয়া ঘাতক পুলিশ বাহিনি নির্বিচারে গুলি চালায়। হঠাৎ একটি গুলি আবদুল কাদিরের মাথায় আঘাত হানে। মাথার খুলি ফেটে মগজ বেরিয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান শহীদ আবদুল কাদির। রাস্তা থেকে লাশ তুলে স্তূপ করা হয় থানার সামনে। এদিকে স্বামীকে খুঁজে না পেয়ে হয়রান হন রহিমা খাতুন। দীর্ঘক্ষণ পর শহীদের বন্ধু মোস্তফা লাশ খুঁজে পান। এভাবে নিজের পরম প্রিয় বন্ধুর লাশ দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তিনি। এরপর কাদিরের লাশকে গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। পৈতৃক গ্রামে জানাজা শেষে চির নিদ্রায় শায়িত হন শহীদ আবদুল কাদির।

'বাধ্য হয়ে ঢাকা ছেড়েছেন'

কেমন আছে শহীদ পরিবার

শহিদ আবদুল কাদির ঢাকার উত্তরাতে একটি রড সিমেন্টের দোকানে কাজ করে নিজের পরিবার চালাতেন। স্বল্প উপার্জনে ছয় জনের পরিবার অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতেন। খুনি হাসিনার পুলিশ বাহিনীর বুলেটের আঘাতে রাস্তায় নেমেছে শহীদ পরিবারটি। ছোট ছোট অসহায় তিনটি বাচ্চা নিয়ে বিপদে পড়েছেন কাদির স্ত্রী রাহিমা বেগম। তাদের লেখাপড়া, ভরণ পোষন সবকিছু নিয়ে বেশ বিপাকে তিনি। বাধ্য হয়ে ঢাকা ছেড়েছেন। বর্তমানে গ্রামের বাড়িতে তিন সন্তানকে নিয়ে অনাহার-অনাচারে জীবন পার করছেন সদ্য বিধবা হওয়া শহীদ স্ত্রী রাহিমা খাতুন।

'আমি খুনিদের ফাসি চাই'

প্রতিবেশীর অভিমত

শহীদ আবদুল কাদির সম্পর্কে তার প্রতিবেশি মুহসিন অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে চোখ ভিজিয়ে ফেলেন। তিনি বলেন- "আবদুল কাদির আর আমি অনেক ভালো বন্ধু ছিলাম। সে অনেক ভালো মানুষ ছিলো। সবার সাথে ভালো আচরণ করত। গ্রামের প্রায় সবার সাথেই ভালো সম্পর্ক ছিলো কাদিরের। এলাকাবাসী তাঁকে কখনও ভুলতে পারবে না। আমি তাঁকে নিয়মিত মসজিদে নামাজ পড়তে দেখেছি। আমার বন্ধু হত্যার বিচার চাই। অসহায় পরিবারটির পাশে এখন কে দাঁড়াবে! কে ছোট ছোট সন্তানগুলোর দায়িত্ব নেবে। আমি খুনিদের ফাসি চাই।"

'উই ওয়ান্ট জাস্টিস
লড়াই, লড়াই, লড়াই চাই
লড়াই করে বাঁচতে চাই'

২৪ এর আন্দোলন

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। ১৯৪৭, ১৯৫২, ১৯৭১, ২০১৫, ২০১৮, ২০২৪ সবখানেই শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব ছিল। তবে ২০২৪ এর আন্দোলনের শহীদ ও গাজী শিক্ষার্থীদের প্রথমবারের মত যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৫ সালে। তৎকালীন স্বৈরশাসক খুনি হাসিনা সরকারের বিপক্ষে ভ্যাটবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল তাঁরা। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনেও সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল তাঁরা। সে সময় স্লোগান ছিল 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস।' তখন থেকেই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা গড়ে উঠেছিল বর্তমান জেনারেশনের। ন্যায় নীতিতে হয়ে উঠেছিল অবিচল। অন্যায় রুখে দিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল তাঁরা। সে সময় আরও কিছু স্লোগানে মুখরিত হয়েছিল গোটা বাংলাদেশ।

'লড়াই, লড়াই, লড়াই চাই,
লড়াই করে বাঁচতে চাই।
অন্যায়ের কালো হাত
ভেঙ্গে দাও, গুড়িয়ে দাও।'

সর্বশেষ ২০২৪ এর কোটা সংস্কার আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এই শিক্ষার্থীরা। ২ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে আন্দোলনের দামামা বেজে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন ধীরেধীরে ত্বরান্বিত হয়। আন্দোলনের শুরু থেকেই ঘাতক পুলিশ বাহিনী ও স্বৈরাচারী সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালাতে থাকে।

২ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ, মানববন্ধন, মহাসড়ক অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষনা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সংগঠন। কর্মসূচী ভেস্তে দিতে টিয়ার শেল, রাবার বুলেট, ছড়রা গুলি, গুম, খুন, নির্যাতন, মামলা করে ছাত্র-জনতাকে হয়রানি করে ফ্যাসিস্ট হাসিনার পালিত গুন্ডা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

দেশীয় অস্ত্র ও রাইফেল নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে আওয়ামীর দাগী সন্ত্রাসীরা। দীর্ঘদিন আন্দোলন চলার ফলে ভীতি সঞ্চারিত হয়ে ৫ আগস্ট ২০২৪ কারফিউ ঘোষণা করে তৎকালীন খুনি শাসক শেখ হাসিনা। সেই কারফিউ ভেঙে রাজধানীর অলিগলিতে অবস্থান নেয় আপামর ছাত্র-জনতা। এরপর বেলা দুইটায় গণমাধ্যমে খবর আসে, পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন শেখ হাসিনা। ঢাকার রাজপথসহ সারাদেশে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতা একে অপরকে ধরে বিজয় উল্লাস করতে থাকেন।

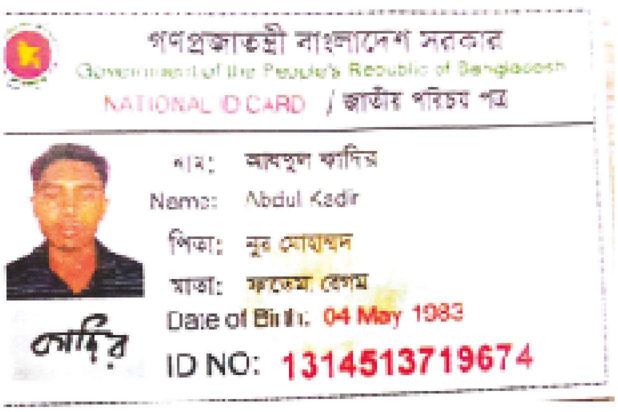

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: আবদুল কাদির
Name: Abdul Kadir
পিতা: নুর মোহাম্মদ
মাতা: ফাতেমা বেগম
Date of Birth: 04 May 1983
ID NO: 1314513719674

এক নজরে শহীদ আবদুল কাদের

নাম	: আবদুল কাদির
পেশা	: দোকানের কর্মচারী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ৪ মে ১৯৮৩, ৪১ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার, আনুমানিক বিকেল ০৪.০০ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: উত্তরা পশ্চিম থানা
দাফন করা হয়	: মানিকরাজ,ফরিদগঞ্জ , চাঁদপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মানিকরাজ , থানা/উপজেলা: ফরিদগঞ্জ, জেলা: চাঁদপুর
পিতা	: নুর মোহাম্মদ
মাতা	: ফাতেমা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: কোনো সম্পদ নেই
সন্তানদের বিবরণ	: ছোট একটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে রয়েছে

প্রস্তাবনা

১. শহীদ সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ দেয়া যেতে পারে

২. শহীদ পরিবারে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে

“আমার ভাগ্নে একজন নিরীহ মানুষ ছিল”

শহীদ মো: আবুল হোসেন মিজি

ক্রমিক: ৪৭১

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৩০

শহীদ পরিচিতি

নদী বিধৌত জেলা চাঁদপুরের সদর উপজেলার অন্তর্গত দক্ষিণ সবুজ শ্যামল বলিয়া গ্রামে ০১ জানুয়ারি ১৯৯২ সালে দেলোয়ার হোসেন মিজি ও সাহিদা বেগমের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন শহীদ আবুল হোসেন মিজি। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠার আগেই চিরতরে তিনি তাঁর বাবাকে হারান। তারপর থেকে অসহায় সংসারে মায়ের কাছে বড় হতে থাকেন তিনি। শহীদ জননী একমাত্র ছেলের বেড়ে উঠায় ব্যাঘাত হবার আশংকায় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়েতে বসেনি।

শহীদ মিজি পরিবারের একমাত্র ছেলে। তবে তাঁর দুইজন বোন আছে। তাঁরা বিবাহিতা। বড় হয়ে প্রাইভেট কার গাড়ির চালক হিসেবে পেশা জীবন শুরু করেন আবুল হোসেন। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর শহীদ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিছুদিন পর ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয় ফুটফুটে এক পুত্র সন্তান। তাঁর নাম রাখা হয় আব্দুর রহমান। শহীদ সন্তান বর্তমানে চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যায়ন করছে। শহীদ হওয়ার পূর্বে আবুল হোসেন মিজি রাজধানী শহরের প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে বাস ড্রাইভার হিসেবে চাকরি করতেন। যে কারণে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে পৈতৃক ভিটা ছেড়ে রাজধানীতে এসেছিলেন তিনি।

বর্বরতার বলি হন শহীদ আবুল হোসেন মিজি

যেভাবে শহীদ হন তিনি

২০২৪ সালের জুলাই মাস ছিল বাংলাদেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত বেদনার মাস। বিশেষ করে ঢাকা বাসীর জন্য এই মাসের প্রতিটা সেকেন্ড ছিল আতঙ্কের। রাস্তার ফুটপাত থেকে শুরু করে বাসার ছাঁদ, বেলকনি এমনকি ব্যক্তিগত রুমেও মানুষ নিরাপদ ছিলনা। যেদিকেই মানুষ সেদিকেই স্বৈরাচারী হাসিনার হায়েনার দল গুলি ছুড়ে মানুষ হত্যা করেছিল। তেমনই এক বর্বরতার বলি হন আবুল হোসেন মিজি।

পেশায় বাস ড্রাইভার ছিলেন তিনি। পেশাগত দায়িত্ব পালন করার জন্য সাইনবোর্ড এলাকায় গেলে আন্দোলনকারীদের উপর ছোড়া গুলিতে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন। পথচারীরা তাঁকে প্রো-একটিভ মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে রেফার করা হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ওখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

অ্যাম্বুলেন্সের হুইসেলে আতঙ্কিত গ্রামবাসী

২০ জুলাই ২০২৪, পাখির কলতানে প্রভাত ফেরীর আগমন ঘটে। অন্ধকার কেটে গিয়ে দিনের আলো উদিত হয়। বলিয়াগ্রামেরমসজিদ থেকে সুমধুর কন্ঠে মুয়াজ্জিনের হৃদয়ের আজান ভেসে আসে। হঠাৎ সে সময় অ্যাম্বুলেন্সের তীব্র শব্দ গ্রামের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অ্যাম্বুলেন্সটিতে দুইজন ছাত্র ছিল। তাঁরা শহীদ আবুল হোসেন মিজির পকেটে থাকা আইডি কার্ডের ঠিকানার সূত্র ধরে গ্রামে লাশ নিয়ে আসে। অপর দিকে তার মা ও স্ত্রী ঢাকার অলিতে গলিতে খোঁজাখুঁজি করছিলেন তাকে।

অ্যাম্বুলেন্সের সাথে থাকা ছাত্ররা আইডি কার্ডটি প্রথমে একজন অল্পবয়সী মুসল্লীকে দেখালে তারা চিনতে পারেনি কারণ শহীদ আবুল হোসেন অনেক আগেই গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে যায়। পরে আরেকজন মুরুব্বির মাধ্যমে শহীদকে চিনতে পারে এলাকাবাসী। গ্রামে থাকা মিজির আপন মামাকে খবর দেয়া হয়। মামা ছুটে এসে ভাগ্নের লাশ দেখে ভেঙে পড়েন। তিনি শহীদের স্ত্রী ও মাঁকে মোবাইলে ঘটনার বর্ণনা করে বিষয়টি তুলে ধরেন। অতঃপর শহীদ পরিবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তাদের মাথায় যেন আসমান ভেঙে পড়ে। ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে চাঁদপুর গিয়ে ক্ষতবিক্ষত লাশ দেখতে পায় শহীদের পরিবার। ঘাতক হাসিনার পৈশাচিক নির্যাতনে এভাবেই বিদায় নেয় পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি শহীদ আবুল হোসেন মিজি।

দৈন্যদশা পরিবারে

শহীদ আবুল হোসেনকে হারিয়ে তার পরিবার দৈন্যদশায় পতিত হয়েছে। বর্তমানে এই পরিবারের উপার্জনের কোন পথ খোলা নেই। সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে শহীদ পরিবারটি।

পরিবারের অভিমত

শহীদের বড় মামা বলেন- 'আমার ভাগ্নে অত্যন্ত নিরীহ একজন মানুষ ছিল। সে তাঁর পরিবারের একমাত্র অবলম্বন ছিল। কেন তাকে গুলি করে মারা হয়েছে আমি জানিনা! এই অসহায় পরিবারের দায়িত্ব এখন কে নেবে?"

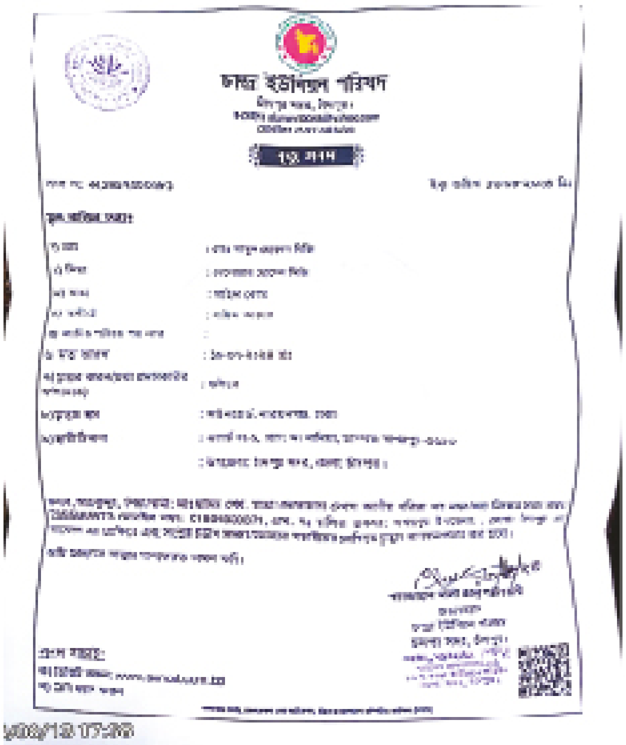
চান্দ্রা ইউনিয়ন পরিষদ

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: আবুল হোসেন মিজি
পেশা	: বাস ড্রাইভার
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০১ জানুয়ারি ১৯৯২, ৩২ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, আনুমানিক বিকাল ৫ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: সাইনবোর্ড যাত্রাবাড়ী
দাফন করা হয়	: দ. বালিয়া, চান্দ্রা, সদর, চাঁদপুর
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 23°09'39.0"N 90°39'47.4"E
স্থায়ী ঠিকানা	: দ. বালিয়া, চান্দ্রা, সদর, চাঁদপুর
পিতা	: দোলোয়ার হোসাইন মিজি
মাতা	: সাহিদা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: কোনো সম্পদ নেই
ভাইবোনের ও সন্তানের বিবরণ	: ভাই নেই। বড় দুই বোন বিবাহিত। একটা ছেলে আছে

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান
২. সন্তানের ভবিষ্যতের যাবতীয় খরচ নিশ্চিত করা
৩. বাসস্থানের ব্যবস্থা করা

শহীদ মো: নিশান খান

ক্রমিক: ৪৭২

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৩১

শহীদ পরিচিতি

রাজধানী ঢাকার অন্যতম প্রবেশমুখ সাভার। কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রথম থেকেই সাভার এলাকায় নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা অস্ত্র হাতে হামলা করতে থাকে। ৫ আগস্ট চূড়ান্ত পরিণতিতে গড়ায় কোটা সংস্কার আন্দোলন। এর আগে ৩১ জুলাই মার্চ ফর জাস্টিস কর্মসূচির পর বৃহস্পতিবারের জন্য নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এই দিনের কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোস'। বুধবার সন্ধ্যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহ-সমন্বয়ক রিফাত রশিদের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

যেভাবে শহীদ হয়

গত ৫ আগষ্ট আমরা যে ঐতিহাসিক সফলতার স্বাদ অর্জন করেছি, যে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছি স্বৈরাচার পতনের মাধ্যমে তার পিছনের দিনগুলো অনেক ত্যাগ আর সাহসিকতার। অনেক গল্প এমন যে, সব মায়া ফেলে দেশের মানুষ ছাত্রদের সাথে একমত পোষণ করে রাজপথে নেমে আসে। এরই সাক্ষী হয়ে থাকবে প্রিয় শহীদ নিশান খান ভাই। নিকট ভবিষ্যতে যার আকাঙ্ক্ষা ছিল বাবা হওয়ার, সেই মানুষটি তার স্ত্রীর গর্ভে ৬ মাসের বাচ্চার মায়া ত্যাগ করে রাস্তায় নেমে আসে পরপর ৩ দিন। শহীদ নিশান খাঁন আমরা যেদিন স্বাধীনতা লাভ করলাম অর্থাৎ ৫ আগস্টে ও রাজপথে লং মার্চে অংশগ্রহণ করেন। ৫ আগস্ট বিকেলে সাভার থানা রোডে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে মিছিলে অংশগ্রহণ করে বুকের বাম দিকে গুলিবিদ্ধ হন নিশান খান। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে তার লাশ চাঁদপুর সদরের মনোহরখাদি গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

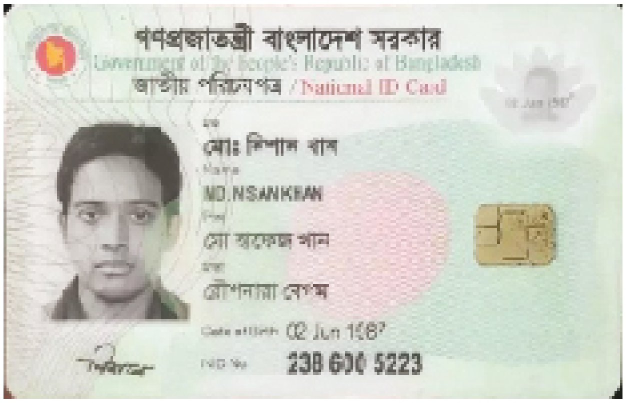

শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য

মায়ের আর্তনাদ, "নিশান আমাকে ফোন দেয়না কতদিন। নিশান আমার খোঁজ নেয়না কেন? আমার একটা ছেলে ওরে তোমরা ফিরিয়ে দাও। আমি আর সইতে পারছিনা।

"চাচা বিল্লাল খান বলেন, "ঝগড়া বিরোধ করতনা। কেউ কোন অভিযোগ দিত না। তার মৃত্যু শুনে সবাই হতবিহ্বল। আমার ভাইয়ের এক ছেলে শুধু সংসার চালাতো যে এখন কে চালাবে এই পরিবার। নামাজ দোয়া পড়তো নিয়মিত। নানা মাওলানা ছিলেন। সবার কাছেই গ্রহনযোগ্য ছিল নিশান।"

এক নজরে শহীদ মো: নিশান খান

নাম	: মো: নিশান খান
পেশা	: ক্যামিকাল কর্মচারী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২ জুন ১৯৮৭, ৩৭ বছর
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার, আনুমানিক বিকাল ৫ : ৩০ টা
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: সাভার
দাফন করা হয়	: চাঁদপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: মনোহরকান্দী, চাঁদপুর
পিতা	: মো: হাফেজ খান
মাতা	: রৌশনারা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে টিনের বাড়ি
সন্তানাদি ও ভাইবোনের বিবরণ	: ভাই নাই। ৪ বোনের মধ্যে দুই বোন অবিবাহিত। ছোট বোন পড়াশোনা করে

সহযোগিতা প্রস্তাবনা

১. স্ত্রী মাস্টার্স পাশ। সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে

২. ছোট বোনের পড়াশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করা যায়

৩. ঈদ উৎসবে খোঁজ খবর নেওয়া যায়

শহীদ মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন

ক্রমিক: ৪৭৩

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৩২

শহীদ পরিচিতি

মাতা-পিতার কোল আলোকিত করে ২০০৫ সালে ২ অক্টোবর রাজাবাড়ির উত্তর রঘুনাথপুর এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন সুন্দর ফুটফুটে এক নবজাতক। বাবা ভালোবেসে নাম রাখেন মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন। তার বাবা জলীম রাজা ও মা শাহানাজ বেগম অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তাদের ইচ্ছা ছিল বড় সন্তানকে হাফেজ বানানোর। এজন্য শৈশবে সাজ্জাদকে এলাকার একটি হেফজখানায় ভর্তি করেন। সাজ্জাদ এলাকার ঐ হেফজখানা থেকে হেফজ শেষ করেন। এরপর উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য তিনি পরবর্তীতে জামিয়া কুরানিয়া এমদাদুল উলুম মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। এরই মধ্যে আর্থিক সংকটে পড়ে তার পরিবার। তখন নিজে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পরিবারের হাল ধরার উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকায় পাড়ি জমান। এখানে এসে সরকারি তুলারাম কলেজে ভর্তি হন। পাশাপাশি নানা ধরনের কাজ শিখতেন ভাগ্য উন্নয়নের জন্য।

“জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো”

যেভাবে শহীদ হলেন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলছিল জুলাই'২৪ জুড়ে। ছাত্ররা মূলত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, মানববন্ধন, প্রতিবাদ সভা এবং সেমিনারের মাধ্যমে তাদের দাবি তুলে ধরে। কিন্তু সরকারী দলের বিতর্কিত সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের আক্রমনের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলনটি সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। নিরাপত্তা বাহিনী ছাত্রদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ায় সর্বত্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কারণ স্বৈরাচার সরকার ছাত্রদের ন্যায্য দাবী না মেনে চালাচ্ছিলো অত্যাচারের স্টীমরোলার। সারাদেশ জুড়ে গুলি, রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল ছোড়া হচ্ছিলো ছাত্রজনতাকে লক্ষ্য করে। খালি হয়ে যাচ্ছিলো হাজারো মায়ের বুক। পিতাহারা হয়ে পড়ছিলো হাজারো শিশু একইসাথে স্বামী হারা হচ্ছিলো হাজারো রমণী। ছাত্রদের মধ্যে মো: সাজ্জাদ হোসাইন ছিলেন অন্যতম। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯ জুলাই শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' বা সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচি ঘিরে রাজধানী ঢাকায় পুলিশ, বিজিবি, আনসার সদস্য, র‍্যাবসহ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সন্ত্রাসীদের আক্রমনে ব্যাপক সংঘর্ষ, হামলা, ভাঙচুর, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। দেশের বিভিন্ন জেলাতেও ব্যাপক বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও সহিংসতা তৈরী হয়। কয়েকদিনে যুবলীগ, পুলিশ ও বিজিবির নৃশংস গুলিতে ১১৯ জন শাহাদাতবরণ করেন। এরপরপরই ছাত্র আন্দোলন রূপ নেয় গণআন্দোলনে। রাস্তায় ছাত্রদের পাশাপাশি নেমে আসে নানান শ্রেণির, নানান পেশার মানুষ। যাদের একটাই দাবী ছিল স্বৈরাচার হটানো। ১৯ জুলাই সাজ্জাদ খালার বাসা থেকে দুপুরের খাবার খেয়ে মিরপুর ১০ এ চলে যান আন্দোলনে অংশ নিতে। পথিমধ্যে আসরের ওয়াক্ত হলে পাশে কোনো একটা সুইমিংপুলে নামায আদায় করেন। এরপর সাথীদের সাথে পুনরায় মিছিলে অংশ নেন। মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। প্রথমে পায়ে আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সাজ্জাদ। এরপর পুলিশের এলোপাথাড়ি বুটের আর লাথির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হতে থাকে সাজ্জাদের দেহ। এক পর্যায়ে পুলিশ তার আহত দেহে গুলি চালালে দেহ পিঞ্জর ছেড়ে বেরিয়ে যায় প্রাণ শক্তি। এই ইহকালের মায়া ত্যাগ করে পরকালে পাড়ি জমান সাজ্জাদ।

কবির ভাষায় -

বীরের এ রক্ত স্রোত মাতার এ অশ্রুধারা
এর যতো মূল্য সেকি ধরার ধুলোয় হবে হারা?
না, এ সকল শহীদের জীবন বৃথা যায়নি! এরই পথ ধরে
৫ আগস্ট অত্যাচারী স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটে

কেমন ছিলেন সাজ্জাদ

কথায় আছে, "A man does not live in years but in deeds" এটিই যথার্থ সাজ্জাদের বেলায়।

শহীদ মো: সাজ্জাদ হোসাইন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং সদালাপী মানুষ ছিলেন। ছোটবড় সকলের সাথে মিলেমিশে চলতেন। তিনি পিতামাতার বাধ্যগত সন্তান ছিলেন। সকল সময় তার পিতামাতাকে নিয়ে ভাবতেন। তিনি তার ছোট ভাইটিকে অনেক স্নেহ করতেন। তার সাথে থাকা এক সাথি ভাই বলেন- সাজ্জাদ গ্রাম থেকে ঢাকা আসে কাজ শিখে পরিবারের হাল ধরার জন্য। কিন্তু ভাগ্য তার সহায় হলো না। খুনি হাসিনার বর্বর পুলিশ কেড়ে নিলো তার প্রাণ। শহীদ সাজ্জাদ দেশের মানুষের মুক্তির জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিলেন নিজের প্রান।

সাজ্জাদের মৃত্যু শুধু তার পরিবারকেই নয়, আমাদের সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আজও যখন তার স্মৃতি আমাদেরকে স্পর্শ করে, তখন মনে হয় তিনি যেন একজন সাহসী যোদ্ধা, যার হৃদয়ে ছিল নির্বাধ দয়া। সাজ্জাদ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তার আদর্শ ও সংগ্রাম চিরকাল আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে।

কেমন আছে তার পরিবার

শহীদ সাজ্জাদের পরিবারে আছে বাবা, মা এবং একটা ছোট ভাই। বাবা সেনিটারি মিস্ত্রীর কাজ করেন। এতে করে তাদের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো অবস্থা। এজন্য পরিবারের আর্থিক সংকট কাটাতে এবং নিজের পড়াশোনা চালাতে ঢাকায় আসেন সাজ্জাদ। কিন্তু নরপিশাচ পুলিশ বাহিনী নির্মম ভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলে তাকে। নিমিষেই শেষ হয়ে যায় একটি পরিবারের স্বপ্ন। যুবক ছেলেকে হারিয়ে শোকাহত বাবা-মা। ছোট ভাইকে এখন জুতো, চশমা, চকলেট কিনে দেবার মতো কেউ রইলো না। তাঁর মৃত্যু তার পরিবারের জন্য এক ঘোরতর অমানিশা। এখন তারা চিন্তিত, কিভাবে চলবেন এবং কিভাবে সংসারের খরচ চালাবেন। সাজ্জাদের অভাব তাদের জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। এই দুরবস্থার মধ্যে, তারা আশা করে সমাজ সহায়তা করবে, যাতে তাদের জীবনে কিছুটা আলো ফিরিয়ে আনা যায়। দ্রুত একটা আর্থিক সহায়তা না পেলে অনাহারে থাকতে হবে সাজ্জাদের পরিবারকে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদ

চাঁদপুরের কোরআনের পাখি সাব্বির অকালেই ঝরে গেল

স্টাফ রিপোর্টার

ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে অকালেই ঝরে গেল কোরআনের পাখি চাঁদপুরের মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসাইন সাব্বির। ছাত্র জনতার আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয় লাভের মাত্র অল্প কদিন আগেই ঢাকা মিরপুর ১০ নম্বরে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় সাব্বির। গত ১৯ জুলাই বিকেলে মাত্র ১৮ বছর বয়সে এই কোরআনে হাফেজের অকালে ঝরে যাওয়ায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

[illegible] সাব্বিরের শেষ স্মৃতিটুকু তার দুঃখিনী মায়ের কাছে নেই। ধর্মীয় আবেগের কারণে তার রক্তমাখা পাঞ্জাবি, পায়জামা ও টুপি তার কবরের পাশেই মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়।

হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক [illegible] মাদ্রাসায় [illegible] মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসাইন সাব্বির। হাফেজ হওয়ার পর একই মাদ্রাসায় সে কিতাব বিভাগে [illegible] পড়াশোনা করেন। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে তার পড়াশোনা এগিয়ে নিতে পারেননি। [illegible] মিরপুর-১ [illegible] ফ্যাসিবাদী সরকারের দমন পীড়ন [illegible] ২-এর পাতায় দেখুন

একনজরে শহীদ মো: সাজ্জাদ হোসাইন (সাব্বির)

নাম	: মো: সাজ্জাদ হোসাইন (সাব্বির)
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২ অক্টোবর ২০০৫ , ১৯ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, আনুমানিক বিকেল ০৫ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: মিরপুর ১০
দাফন করা হয়	: রঘুনাথপুর, সদর, চাঁদপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রাজাবাড়ি, উত্তর রঘুনাথপুর , থানা/উপজেলা: সদর, জেলা: চাঁদপুর
পিতা	: মো: জসিম রাজা
মাতা	: শাহানাজ বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে বাড়ি আছে
ভাই-বোনের বিবরণ	: ছোট ভাই আছে
ভাই	: সাফায়েত রাজা (বয়স ৮ ,শ্রেণি ২য়)

শহীদ পরিবারকে সাহায্যের প্রস্তাবনা:

১ : বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে

২ : ছোট ভাইয়ের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেয়া যেতে পারে

শহীদ আব্দুর রহমান

ক্রমিক: ৪৭৪
আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৩৩

“এক অমর ত্যাগের কাহিনী”

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আব্দুর রহমান, ডাকনাম পারভেজ, ছিলেন একজন শিক্ষিত ও সদাচারী তরুণ, যিনি তাঁর চরিত্র ও কর্মের মাধ্যমে সমাজে এক বিরল স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। ৫ আগস্ট ২০২৪ তাঁর মৃত্যুতে একটি গভীর শোকের পাশাপাশি আমাদের সমাজের মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধের একটি প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। এই প্রতিবেদন শহীদ আব্দুর রহমানের জীবন, কাজকর্ম, পরিবার ও মৃত্যু পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তাঁর ত্যাগের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করবে।

শহীদ আব্দুর রহমান নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজের বি.বি.এস তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তাঁর শিক্ষা জীবনের সাফল্য শুধু পড়াশোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি খেলাধুলা এবং প্রাইভেট কার চালাতে পারদর্শী ছিলেন। ক্রীড়ার প্রতিভা তাকে একাধিক পুরস্কার এনে দিয়েছে। শহীদের শান্ত স্বভাব ও ধর্মীয় দায়িত্ববোধ তাঁকে সাধারণ মানুষের কাছে আলাদা করে তুলেছিল।

শহীদের দূরদর্শিতা

শহীদ আব্দুর রহমান ছোটবেলা থেকেই একটি আদর্শ জীবনযাপন করেছেন। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। তাবলিগের কাজে অংশ নিয়ে তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রচার করতেন। মসজিদে নিয়মিত যাতায়াত এবং সমাজের লোকদের ধর্মীয় দীক্ষাও দিতেন আব্দুর রহমান। ফুটবল খেলা এবং আরবি শেখার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। মাসনূন দোয়া পড়তে অন্যদের উৎসাহিত করা তাঁর অভ্যাস ছিল, যা তাঁর সৎ চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা

৫ আগস্ট একটি হৃদয়বিদারক দিন হিসেবে শহীদ পরিবারের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ওইদিন, শহীদ আব্দুর রহমানের জীবন শেষ হয় একটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনায়। সেদিন আব্দুর রহমান আপুর বাসায় ছিলেন। সকাল ১০:৩০ টায় তিনি বাসা থেকে বের হন। দুপুরের পর থেকে ফোন বন্ধ থাকায় পরিবারের সদস্যরা পাগল হয়ে যায়। তাঁকে খুঁজতে যাত্রাবাড়ী চষে বেড়ায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সন্ধ্যায় তাঁর লাশ পাওয়া যায়। জনৈক বন্ধু লাশ গণকবর দেয়ার সময় আইডি কার্ড দেখে চিহ্নিত করে। শহীদ পরিবারে খবর দেয়া হয়। ঘটনাস্থলে তাঁর পরিবার পৌছায়। ঘটনার স্থান ছিল শনির আখড়া, যাত্রাবাড়ী। আব্দুর রহমানের শরীরের পেট ভেদ করে গুলি বের হয়ে যায়। গুলির আঘাত দেখে বুঝা যায় অত্যাধুনিক চাইনিজ রাইফেলের অস্তিত্ব নির্দেশ করে। এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি শহীদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের জন্য একটি বড় ক্ষতি ও শোক নিয়ে এসেছে।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা

শহীদ আব্দুর রহমানের পরিবার বর্তমানে চরম আর্থিক সংকটে রয়েছে। তাঁর পিতা আব্দুল মালেক গাজী সৌদি আরব প্রবাসী, এবং তাঁর আয় অত্যন্ত সীমিত। দেশে জমি-জায়গাও কম, যা তাদের আরও কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলেছে। শহীদের বড় ভাই আব্দুল্লাহ বকলবাড়ি মাদ্রাসার ছাত্র, বড় বোন পান্না আক্তার বিবাহিতা। ছোট বোন জান্নাত আক্তার নূরানী মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে, শহীদ পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাপন ও শিক্ষার জন্য জরুরী সহায়তার অভাব রয়েছে। তাঁদের ভবিষ্যৎ স্বচ্ছলতা এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা অত্যন্ত জরুরী।

শহীদের সম্পর্কে আত্মীয় ও সহপাঠীদের বক্তব্য

শহীদের চাচাত ভাই নাঈমুদ্দীন জানান, 'আমার ভাই আব্দুর রহমান ছিল শান্ত ও সৎ স্বভাবের। ছোটবেলা থেকেই অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে সে কখনও চুপ থাকত না। তাবলিগের কাজে অংশগ্রহণ এবং মসজিদে নিয়মিত যাওয়া তার নিত্যদিনের অভ্যাস ছিল। তাঁর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন এই গুণাবলীর জন্য গভীরভাবে সম্মান করত। শহীদের চলে যাওয়া আমাদের জন্য এক গভীর শোকের।"

শহীদ আব্দুর রহমানের ত্যাগ এবং প্রেরণা

শহীদ আব্দুর রহমানের জীবন আমাদের শেখায়- একজন মানুষ কিভাবে তাঁর নৈতিকতা, শান্তি ও ধর্মীয় দায়িত্ববোধের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাঁর জীবন, কর্ম এবং ত্যাগ সমাজে এক নতুন উদাহরণ হিসেবে থেকে যাবে। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, একজন মানুষের ত্যাগ ও কর্তব্যবোধ কিভাবে বৃহত্তর কল্যাণে অবদান রাখতে পারে। শহীদের জীবন ও ত্যাগ আমাদের জন্য একটি মহান প্রেরণা এবং আমাদের সমাজের মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধকে নতুন করে ভাবতে শেখায়।

উপসংহার

শহীদ আব্দুর রহমানের জীবন ও মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা একটি শক্তিশালী বার্তা পাই। মানবতার জন্য ত্যাগ ও দায়িত্ববোধ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পরিবার ও সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। শহীদের আত্মার শান্তি কামনায় এবং তাঁর পরিবারের সমর্থনে আমাদের একসাথে এগিয়ে আসা উচিত, যাতে তারা এই কঠিন সময়ে কিছুটা স্বস্তি ও সমর্থন পেতে পারে।

আন্দোলনে শহীদদের তালিকা
আব্দুর রহমান
1
আব্দুর রহমান গাজী
শিক্ষার্থী
সরকারি তোলারাম কলেজ
৫ আগস্ট, ২০২৪

এক নজরে শহীদ আব্দুর রহমান

পূর্ণ নাম	: আব্দুর রহমান (ডাকনাম: পারভেজ)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ; বি.বি.এস তৃতীয় বর্ষ
বয়স	: ২৩-১০-২০০১ (২৩)
জীবনযাপন	: শান্ত স্বভাব, ধর্মীয় দায়িত্ববোধসম্পন্ন, খেলাধুলা ও ড্রাইভিংয়ে পারদর্শী
কর্মকাণ্ড	: তাবলিগে অংশগ্রহণ, মসজিদে নিয়মিত যাওয়া, ফুটবল খেলা, আরবি শিখার প্রতি আগ্রহ
মৃত্যুর দিন	: ৫ আগস্ট ২০২৪
মৃত্যুর কারণ	: পুলিশি গুলিতে শহীদ
ঘটনার স্থান	: শনির আখড়া, যাত্রাবাড়ী
পিতা	: আব্দুল মালেক গাজী (সৌদি প্রবাসী)
ভাই	: আব্দুল্লাহ (নাহমির জামাত, বকশবাড়ি মাদ্রাসা)
বোন	: পান্না আক্তার (বিবাহিত গৃহিণী),
বোন	: জান্নাত আক্তার (নূরানী মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী)
বিশেষ গুণাবলী	: অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী, ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়, মাসনূন দোয়া পড়তে আগ্রহী
পরিবারের বর্তমান পরিস্থিতি	: চরম আর্থিক সংকট, প্রবাসী পিতার সীমিত আয়, পরিবারকে মৌলিক সহায়তার প্রয়োজন
প্রস্তাবনা-১	: শহীদ পরিবারের স্থায়ী বাসস্থান প্রয়োজন
প্রস্তাবনা-২	: শহীদের ভাই-বোনদের লেখা-পড়ার খরচ যোগানে সহযোগিতা করা যেতে পারে

শহীদ সিয়াম সরদার

ক্রমিক : ৪৭৫

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৩৪

শহীদ পরিচিতি

বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী এক তরুণ চাঁদপুরের দ. হামানকর্দি গ্রামের সিয়াম সরদার। ডাকনাম জিহাদ। তিনি ছিলেন এক সাদামাটা পরিবারের ছেলে। ২০০৭ সালের ৫ আগস্ট জন্ম নেয়া সিয়াম ছোটবেলা থেকেই আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে বড় হয়েছেন। শিক্ষাজীবন খুব বেশি দীর্ঘ হয়নি তাঁর। মাত্র ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে পরিবারের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হন। অভাবের সংসারে একটু সহায়তা করার জন্য ২১ দিন আগে মিরপুর ১০ নম্বর এলাকায় অবস্থিত কাবাবানী রেস্টুরেন্টে হোটেল কর্মচারী হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা এবং স্বপ্ন থেমে যায় ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই রাতে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটি মিছিলে অংশ নেওয়ার সময় পুলিশের গুলিতে তার নির্মম মৃত্যু ঘটে।

একজন শহীদ হিসেবে পরিচিতি

সিয়াম সরদার সেইসব তরুণদের একজন, যারা বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান সুস্পষ্ট করেছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, যা ২০২৪ সালে ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবিতে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। সিয়ামের মতো হাজারো তরুণকে রাজপথে টেনে এনেছিল। এই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল সমান সুযোগ। ন্যায্য শিক্ষা এবং বৈষম্য দূরীকরণ। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, বিশেষ করে ছাত্রসমাজ, একত্রিত হয়ে নিজেদের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার হন। সিয়াম সেই আন্দোলনের একনিষ্ঠ অংশীদার ছিলেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

১৮ জুলাই ২০২৪ সালের সেই কালো রাতের কথা আজও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ভুলতে পারেনি। মিরপুর ১০ নম্বর এলাকায় কারবানী রেস্টুরেন্টে কাজ করার পর সিয়াম মিছিলে যোগ দেন। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন তখন দেশব্যাপী আলোড়ন তুলেছে, এবং ছাত্ররা নিজেদের অধিকার ও মর্যাদার জন্য প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যায়। সেই মিছিলেই ঘটে যায় এক ভয়াবহ ঘটনা। সিয়ামকে লক্ষ্য করে পুলিশের গুলি ছোঁড়া হয়। বাম চোখে গুলিটি বিদ্ধ হয়ে মাথা ভেদ করে বেরিয়ে যায়। শহীদের আত্মত্যাগ সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা শিক্ষার্থীদের মনে সাহস এবং শক্তি জোগায়, কিন্তু একইসঙ্গে সমাজের অবিচার ও বৈষম্যের করুণ পরিণতিও সামনে নিয়ে আসে।

পরিবার ও আত্মীয়দের কথা

সিয়াম সরদারের পরিবার একটি নিম্নবিত্ত কৃষক পরিবার। তাঁর বাবা সোহাগ সরদার একজন কৃষক, যিনি অন্যের জমিতে দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। মা, জেসমিন বেগম, একজন গৃহিণী। তাদের এই সংসারে সিয়াম ছিল সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। বড় দুই বোন জান্নাত আক্তার (২৩) ও হাসি আক্তার (১৮) গৃহিণী হিসেবে সংসার চালাচ্ছেন।

সিয়ামের মা বলেন, "আমার ছেলে ছিল আমাদের একমাত্র ভরসা। সে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে চেষ্টা করছিল। আমরা খুব কষ্টে আছি, আর তার এই মৃত্যু আমাদের সব স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে।"

সিয়ামের বাল্যবন্ধু আনাস সরদার বলেন, "আমরা ২য় শ্রেণি পর্যন্ত একসঙ্গে পড়াশোনা করেছিলাম। পরে সিয়াম পরিবারের জন্য কাজ করতে গিয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। সে ছিল খুবই ভালো মনের মানুষ। তার মধ্যে কোনো অহংকার ছিল না। নামাজ পড়তো নিয়মিত এবং মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতো। আমি তাকে খুব মিস করি।"

তার বন্ধু ও প্রতিবেশীদের মতে, সিয়াম সবসময় মানুষের জন্য কিছু করতে চাইতো এবং তার এই ত্যাগের কারণে সবার মনে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা

সিয়ামের পরিবার একটি নিম্নবিত্ত কৃষক পরিবার। তার বাবা সোহাগ সরদার জমির অভাবে অন্যের জমিতে দিনমজুরি করে পরিবারের খরচ চালান। পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস কৃষিকাজ। সিয়াম পরিবারের জন্য আয় করার দায়িত্ব নিয়ে হোটেলে কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু তার এই স্বপ্ন খুব বেশি দিন স্থায়ী হলো না। তার মৃত্যুতে পরিবারটি আর্থিকভাবে আরও বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সিয়ামের বাবা এবং বোনেরা এখন অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন।

শহীদ থেকে প্রেরণা

সিয়াম সরদারের আত্মত্যাগ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শিক্ষার্থীদের জন্য এক অনন্য প্রেরণার উৎস। তাঁর সাহসিকতা, মানবিকতা, এবং নিজেকে উৎসর্গ করার মানসিকতা ভবিষ্যতের তরুণদের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সিয়ামের মতো শহীদদের আত্মত্যাগ গোটা সমাজকে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা দেয়। তরুণ সমাজের প্রতি তাঁর বার্তা ছিল- নিজেদের অধিকার আদায়ে পিছিয়ে না আসা এবং ন্যায্যতা ও সমতার জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া। সিয়ামের জীবন ও আত্মত্যাগ থেকে শিক্ষা নিয়ে তরুণরা আজও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

শহীদ পরিবারের প্রয়োজনীয় সহায়তা

সিয়ামের পরিবার বর্তমানে কঠিন অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তাদের আয় এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি স্থায়ী আয়ের উৎসের প্রয়োজন। সিয়ামের বাবা দিনমজুর হিসেবে কাজ করলেও, তা দিয়ে পরিবারের খরচ চালানো সম্ভব নয়। পরিবারের বাকি সদস্যদের পড়াশোনা চালানোর জন্য এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকারি সহায়তা ও সমাজের সহমর্মিতা প্রয়োজন। সিয়ামের পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা, সরকারি অনুদান, এবং প্রয়োজনে সামাজিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান অত্যন্ত জরুরী।

এক নজরে শহীদ সিয়াম সরদার

পুরো নাম	: সিয়াম সরদার (ডাকনাম: জিহাদ)
জন্ম তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০০৭
জন্মস্থান	: দ. হামানকর্দি, চাঁদপুর
পেশা	: হোটেল কর্মচারী (কারবানী রেস্টুরেন্ট, মিরপুর ১০)
শিক্ষা	: ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত
মৃত্যুর তারিখ	: ১৮ জুলাই ২০২৪
মৃত্যুর কারণ	: পুলিশের গুলিতে নিহত
পরিবারের আর্থিক অবস্থা	: নিম্নবিত্ত, কৃষিকাজ ও দিনমজুরি নির্ভর
ভাইবোন	: ২ জন বোন (জান্নাত আক্তার, হাসি আক্তার) বিবাহিতা

“আল্লাহর কাছে চাই- আমার ছেলের রক্তের বিনিময়ে এদেশে শান্তি আসুক”

শহীদ রোহান আহম্মেদ খান

ক্রমিক: ৪৭৬

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৩৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ রোহানের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরের সদর উপজেলার বালিয়া গ্রামে। ২ ভাইয়ের মধ্যে রোহান ছিল ছোট। রাজধানীর কদমতলীতে পরিবারের সঙ্গে থাকতেন রোহান। রোহানের বাবা সুলতান আহমেদ মুদি দোকান ব্যবসায়ী, মা মনিরা বেগম আরবি টিউশান করেন। বড় ভাই রাহাত সায়েদাবাদ আরকে চৌধুরী ডিগ্রি কলেজের অনার্স ৩য় বর্ষের অ্যাকাউন্টিং বিষয়ের শিক্ষার্থী। ২০০৬ সালের ২ মার্চ চাঁদপুরে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ রোহান। তবে বেড়ে উঠেন ঢাকায়। ২০২২ সালে এ কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করেন।

এসএসসি পাশের পর রোহান দনিয়া সরকারি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ২০২৪ সালের এইচএসসি পরিক্ষার্থী ছিলেন শহীদ রোহান আহমেদ খান। ছোটবেলা থেকেই খুব শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। নিয়মিত মসজিদে নামাজ পড়তেন। স্বপ্ন ছিলো একটি সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মানের। যে কারণে বেছে নিয়েছিলেন রোভার স্কাউটকে। বাংলাদেশ রোভার স্কাউট দনিয়া রোভার দলের একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। স্বপ্ন পূরণের পথের অদম্য এক স্বাপ্নিক ছিলেন শহীদ রোহান। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে খুনি হাসিনার জিঘাংসার শিকার হন তিনি।

যেভাবে শহীদ হলেন

চব্বিশে কোটা সংস্কার আন্দোলনের শুরু থেকেই অনেক সক্রিয় ছিলেন শহীদ রোহান। নিয়মিত আন্দোলনে অংশ নিতেন। আন্দোলনকারীদের খাবার পানি দিয়ে সাহায্য করতেন। ১৯ জুলাই ২০২৪ বড় ভাইয়ের সাথে জুমার নামাজ পড়তে রোহান বাসা থেকে বের হন। বাসার পাশেই বাইতুস সালাম জামে মসজিদে নামাজ আদায় করেন দুই ভাই। নামাজ শেষে রাহাত বাসায় চলে আসে। রোহান বাসার নিচেই থেকে যান। সেদিন মায়ের কাছ থেকে ৩০০ টাকা নিয়ে বের হন রোহান। এই টাকা দিয়ে পানির কেস কিনে জুমার নামাজের পর মিছিলে অংশ গ্রহণকারী ছাত্রদেরকে পানি খাওয়াতে শনির আখড়া এলাকায় যান। পানি খাওয়ানোর সময় আন্দোলনরতদের উপর পুলিশ গুলি চালালে একটা বুলেট এসে বিদ্ধ হয় রোহানের বুকে। আশেপাশের ছাত্ররা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। রোহানের ফোনেই মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে কেউ একজন গুলি লাগার কথা জানান। রোহানের গলা থেকে নিচে বুকের মাঝবরাবর গুলি লেগেছিল। খবর পেয়ে তাঁর বড় ভাই রাহাত ও মা মিটফোর্ড হাসপাতালে যায়। সেখানে গিয়ে দেখেন কলাপসিবল গেটের ভেতরে রোহানের নিথর দেহ পড়ে আছে। নিথর প্রাণহীন দেহ দেখে সেখানেই মুর্ছা যান শহীদ জননী। লাশ আনতে চাইলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আইনি জটিলতা ও ময়নাতদন্তের কথা বলে বিলম্ব করেন। পরের দিন ২০ জুলাই লাশ পরিবারের মাঝে হস্তান্তর করা হয়। বিকালে বাসার পাশে বাইতুস সালাম মসজিদের কাছে জানাজা শেষে চাঁদপুরের গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

সন্তান হারানোর বেদনায় পাগলপ্রায় হয়েছেন শহীদ পিতা-মাতা। দনিয়া কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের এইচএসসি পরিক্ষার্থী ছিলেন তিনি। আর পরীক্ষা দেয়া হল না মেধাবী এই শিক্ষার্থীর। রোভার রোহান আহমেদ খানের সেনাবাহিনীতে যোগদানের স্বপ্ন অসম্পন্নই রয়ে গেল।

কেমন আছে রোহানের পরিবার

শহীদ পিতা সুলতান আহমেদ মুদি দোকান ব্যবসায়ী, মা মনিরা বেগম আরবি টিউশান করেন। বড় ভাই রাহাত সায়েদাবাদ আরকে চৌধুরী ডিগ্রি কলেজের অনার্স ৩য় বর্ষের অ্যাকাউন্টিং বিষয়ের শিক্ষার্থী। গ্রামে বসতি ভিটা ছাড়া তাঁর বাবার তেমন কোন

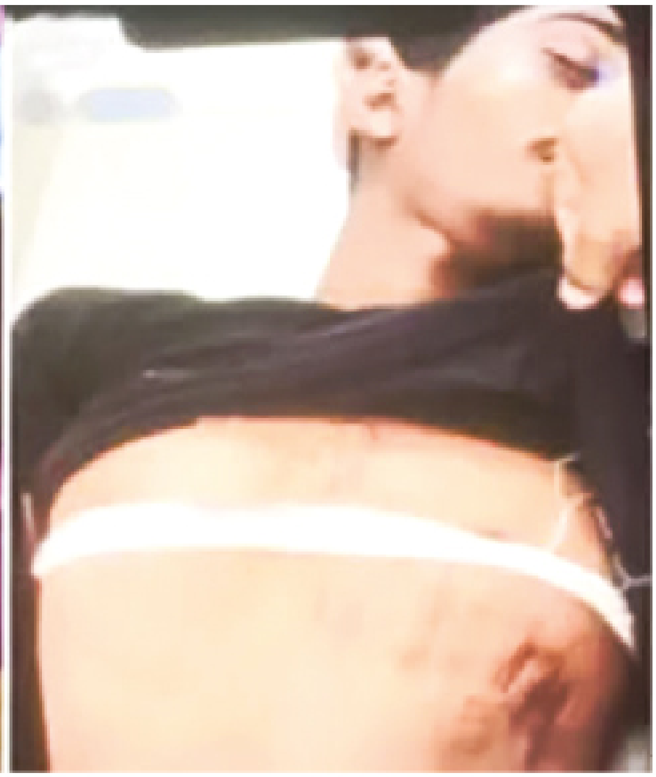

জায়গা জমি নেই। শহীদের পরিবার প্রায় ত্রিশ বছর যাবৎ কদমতলী এলাকায় ভাঁড়া বাসায় বসবাস করে আসছেন। তাঁকে নিয়ে বাবা-মায়ের অনেক বড় স্বপ্ন ছিলো যে তিনি একদিন অনেক বড় অফিসার হবেন, বাবা মার মুখ উজ্জ্বল করবে। কিন্তু সে স্বপ্ন আর পূরণ হলো না।

নিকটাত্মীয়ের জবানে রোহান

রোহান সম্পর্কে তার বড় ভাই রাহাত বলেন- "আমার ছোট ভাই ২০২৪ এর এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল। ৬-৭ টা পরীক্ষা দেয়ার পর ২০২৪ এর জুলাই মাসে ছাত্রদের ডাক দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কারণে পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। আমার ছোট ভাই বৈষম্যবিরোধি ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে পানি ও শুকনো খাবার দিয়ে সাহায্য করত।

শহীদ পিতা বলেন-

"আল্লাহর কাছে চাই- আমার ছেলের রক্তের বিনিময়ে এদেশে শান্তি আসুক"

শহীদ জননী বলেন- আমার রোহান কী সুন্দর, নম্র ও ভদ্র ছেলে ছিল। নামাজ পড়ত, লেখাপড়া করত, আজেবাজে কোনো আড্ডা দিত না। আমার ছেলে প্রায় আমাকে বলত- এইচএসসি পাশ করার পর সেনাবাহিনীর অফিসার হবে। দেশের সেবা করবে। শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন দিয়ে দেশের সেবা করে গেল।

রোহান আর মাহাদীর স্বপ্ন থেমে গেল গুলিতে

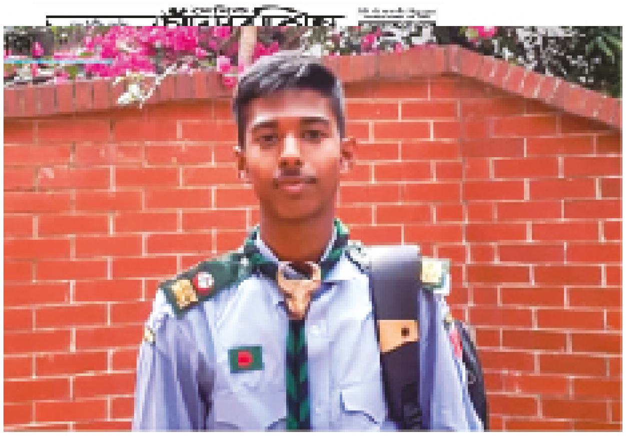

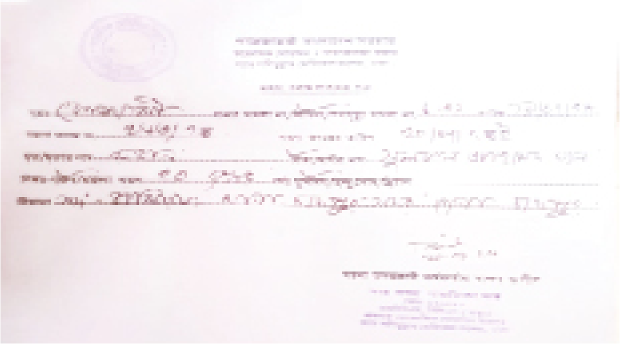

এক নজরে শহীদ রোহান আহমেদ খান

নাম	: রোহান আহমেদ খান
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২ মার্চ ২০০৬ , ১৮ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, আনুমানিক দুপুর ০৩ টা
কিভাবে মারা যায়	: কাজলা, কদমতলি এলাকায় পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়
দাফন করা হয়	: বালিয়া চাঁদপুর (পারিবারিক কবরস্থান)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কমলাপুর, থানা/উপজেলা: সদর, জেলা: চাঁদপুর
পিতা	: সুলতান আহম্মেদ খান
মাতা	: মনিরা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে বাড়ি আছে
ভাইবোনের বিবরণ	: বড় ভাই আছে

প্রস্তাবনা

১. শহীদ ভাইয়ের কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে

২. বাবার ব্যবসাকে বড় করতে মাসিক সহযোগিতা করা যেতে পারে

৩. মায়ের চিকিৎসা ভাতা দেয়া যেতে পারে

وَلَئِن قُتِلۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوۡ مُتُّمۡ لَمَغۡفِرَةٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحۡمَةٌ
خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ

আর তোমাদেরকে যদি আল্লাহর রাস্তায় হত্যা করা হয় অথবা তোমরা মারা যাও, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও দয়া তারা যা জমা করে তা থেকে উত্তম।

-সুরা আল-ইমরান আয়াত: ১৫৭

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

সপ্তম খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী